Cultural history — West Bengal

পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি

Paschim Banger Purakirti

রামরঞ্জন দাস

Ram Ranjan Das

Firma K.L. Mukhopadhyay
ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিমিটেড
কলিকাতা-১২ * * * ১৯৮০
Calcutta-12 1980

প্রকাশক
ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিমিটেড,
২৫৭বি, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

Publisher
Firma K. L. Mukhopadhyay
257B, B. B. Ganguli Street
Calcutta - 700012

প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৮০
1st edition, Calcutta 1980

মুদ্রাকর
শ্রীমতী মহামায়া রায়
সনেট প্রিন্টিং হাউস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

Printer
Smt. Mahamaya Ray
Sanet printing house
19, Goyabagan Street
Calcutta 700006

Govt. approved price
Rs. 20/-

Fifth Five-year Plan—Development of Modern Indian Languages. The popular price of the book has been possible through the subvention received from the Government of West Bengal.

বুবুন, রোজি, রোমি, মিঠু ও তমুকে—

প্রীতি উপহার

Contents

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

বঙ্কিমবাবু অনেক দুঃখে বলেছিলেন "সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। মাওরি জাতির ইতিহাস আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। ইতিহাস বিহীন জাতির দুঃখ অপরিসীম। বাঙালী জাতির ইতিহাস নাই। সত্যসত্যই বাঙালী একদিন ঔপনিবেশিকতায় অগ্রগণ্য ছিল। সিংহল বাঙালী কর্তৃক পরাজিত হয়েছিল। যবদ্বীপ, বালিদ্বীপে বাঙালীর উপনিবেশ ছিল। তাম্রলিপ্তি ভারতীয়দের সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল। ভারতবর্ষের আর কোন জাতি উপনিবেশিকতায় এতটা পারদর্শিতা দেখাননি। বাঙালী রাজা বিশেষ করে দেবপাল ও লক্ষণসেন ভারতবর্ষের তৃতীয়াংশের অধীশ্বর ছিলেন। পাঠানেরা তিনশো বছরের অধিককাল রাজত্ব করেছিলেন, তবুও কোনকালে সমগ্র বাংলার অধিপতি হতে পারেননি। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাদের ক্ষমতা প্রবেশ করতে পারেনি। গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় যে সকল সম্পূর্ণ বা ভগ্ন অট্টালিকা দেখা যায়, তাতে তৎকালীন বাংলার ঐশ্বর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাই। যেদিন হইতে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল সেইদিন হইতে বাংলার ধন আর বাংলায় থাকিল না। যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদসাগরে ভাসি, তখন কি মনে হয় যে, সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্নমন্দির তৈয়ারী হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে বাংলা প্রথম সারিতে। যখন জুমা মসজিদ, সেকন্দর, ফতেপুর সিক্রি বা শাহাজাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া দুঃখ করি তখন কি মনে হয় তাহাতে বাংলার কত ধন ক্ষয় হইয়াছে। নাদির শাহ, তৈমুর দিল্লী লুট করিয়াছে তখন কি মনে হয় তাহার সঙ্গে বাংলার ধনও লুট হইয়াছে। বাংলায় হিন্দুর অনেক কীর্তি আছে, পাঠানের বহু কীর্তির চিহ্ন মেলে, ইংরাজও

অনেক কীর্তি সংস্থাপন করিয়াছে কিন্তু বাংলায় মোগলের কোন কীর্তি নাই, ইহাতে কি মনে হয় না যে মোগলেরা বাংলার শত্রু ছিল।……বাঙালীর ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাংলার বিদেশী বিধর্মী আসার পরপীড়কদিগের জীবন চরিত মাত্র।" তারপর অনেকদিন গেল, অনেক ঐতিহাসিক, অনেক সাহিত্যিক এলেন কিন্তু কেউই সামগ্রিক বাঙালীর ইতিহাস লিখতে সচেষ্ট হলেন না। অতঃপর শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ডক্টর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, সতীশচন্দ্র মিত্র এবং স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় বাঙালীদের ইতিহাসের কথা অনুভব করলেন। সকলেই অনুভব করলেন সত্যিই বাঙালী জাতির ইতিহাস চাই, নইলে বাঙালীর অস্তিত্ব কোথায়? ধারাবাহিকভাবে বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস লিখে চললেন। সীমারেখা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল। ঐতিহাসিকরা যে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন তাঁদের গ্রন্থাবলীই তার পরিচয় বহন করে। বাঙালী ও বাঙালীর ইতিহাস রচিত হলো। পরবর্তীকালে এলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ প্রভাসচন্দ্র সেন, বিনয় ঘোষ আর ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। ডঃ মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হোল "History of Bengal", সামগ্রিকভাবে বাঙালীর ইতিহাস রচনার প্রয়াস এই প্রথম। বাঙালীর ইতিহাস রচনার এমন কৃতিত্ব আর কেউই দাবী করতে পারেন না। যেটুকু বইখানিতে অভাব ছিল তা পূরণ করলেন ডঃ রায় মহাশয় তাঁর "বাঙালীর ইতিহাসে।" এত বিস্তারিত ও সহজ উপায়ে বাঙালীর ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প ও ভাস্কর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যের কথা কেউই ইতিপূর্বে পরিবেশন করেননি। অন্য কেউই বিশদ ও বিস্তৃতভাবে প্রাচীন অতীতকে বর্তমানের মত সজীব করে তোলেননি। তাই আমার মনে হয় বইখানিতে বাঙালী পাঠকের প্রয়োজন অনেকখানি মিটেছে।

দুই বাংলার কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় গ্রন্থকারেরা পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) উপরই বেশী ঝুঁকে পড়েছেন। পশ্চিমবাংলা সেখানে অবহেলিত। সাংস্কৃতিক দিক থেকে তো বটেই, তারই আর এক প্রকাশ শিল্পকলার দিক থেকেও। পশ্চিমবঙ্গবাসী হয়ে সেই অভাবটা আমার কাছে প্রকট হয়ে উঠেছে। শ্রদ্ধেয় অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে কয়েকটি জেলার পুরাকীর্তির উপর গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রতিটি জেলার পুরাকীর্তির বিশদ বিবরণ সম্বলিত এক গ্রন্থমালা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখলেন "Archaeological Encyclopaedia of West-Bengal সামগ্রিকভাবে এই দেশের পুরাকীর্তি বিষয়ক গ্রন্থের অভাব পূরণ করিবে। ...যোগ্যতার সহিত এই কাজটি সম্পন্ন করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবী করিতে পারিবেন।" এ পর্যন্ত তিন চারটি জেলার পুরাকীর্তি বিষযক গ্রন্থের প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে এ বিষয়ে আমার আগ্রহ থাকাটা খুব স্বাভাবিক। সেই কারণে একটি গ্রন্থে সব কটি জেলার পুরাকীর্তি লিপি-বদ্ধ করার প্রচেষ্টা থেকে আমার এই গ্রন্থ "পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি"। বৈচিত্র্যভরা বাংলাদেশের সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করা প্রচুর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন কেননা এই দেশের সংস্কৃতি নিয়ে সুধীবৃন্দের তর্কের অন্ত নেই। দেশবরেণ্য মনীষীদের সস্নেহ প্রশংসা সত্ত্বেও আমি আমার ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে সচেতন। আমার প্রচেষ্টায় কিছু ভুলত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। তবুও মোটামুটিভাবে পশ্চিমবাংলার শিল্পকলার উপর পাঠকের ধারণা কিছুটা স্বচ্ছ হবে—এ দাবী বোধ হয় করতে পারি।

জেলাভিত্তিক শিল্পকলার আলোচনাকালে কিছু কিছু ঐতিহাসিক পটভূমিকার অবতারণা করতে হয়েছে কেননা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র রাজন্যবর্গের বা বিত্তশালী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় শিল্পকলার উদ্ভব। সাধারণ মানুষের দান সেখানে তুচ্ছ। তাদের পক্ষে সম্ভবও নয় এই

ধ্বংসপ্রাপ্ত অধিকাংশ শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখা যদি না সরকার এ বিষয়ে সচেষ্ট হন। অতীত দিনের স্মৃতি আজ লোকচক্ষুর প্রায় অন্তরালে। কিছু বেঁচে আছে পুঁথির পাতায়, আর কিছুর অস্তিত্ব লুকিয়ে আছে তাদের জীর্ণ দেহে। বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়িয়ে, আর পুঁথির মধ্যে যেটুকু দেখছি বা পেয়েছি তাই এই বইটির মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি জেলার পুরাকীর্তির সামগ্রিক আলোচনা সম্ভবপর না হলেও মুখ্য বিষয়গুলির এই গ্রন্থে অবতারণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমার স্থির বিশ্বাস যে এই বইখানি উৎসাহী পাঠকমহলের পুরাকীর্তি বিষয়ক অভাব কিছুটা দূর করতে সক্ষম হবে। তথ্যের অভাবে অনেক জেলার উপর বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হয়নি কিন্তু সেই সমস্ত জেলায় খননকার্য চালালে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আরও বড় ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হবে।

সরকারী অনুদান না পেলে এ গ্রন্থখানির প্রকাশনা অচিরে সম্ভব হতো না। এ ব্যাপারে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ফার্মা কেএলএম প্রাঃ লিমিটেড বইখানির প্রকাশনার ভার নিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতার অভাব নেই। তাছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ডক্টর কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছেও প্রচুর স্নেহলাভ করেছি। স্ত্রীর কাছ থেকে উৎসাহ না পেলে বইখানি তাড়াতাড়ি রচনা করা হয়ে উঠত না; সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। ত্রুটী-বিচ্যুতিগুলি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন ও পরিবর্ধনের অপেক্ষায় রইল।

৭ই শ্রাবণ ১৩৮৪
"অভয়া আশ্রম"
ব্রাহ্মণপাড়া, চন্দননগর
হুগলী

রামরঞ্জন দাস

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পধারা

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সংস্কৃতি বিদ্যমান তার পিছনে রয়েছে সচেতন ও পরিপক্ক বুদ্ধির প্রভাব। কিন্তু যেখানে বুদ্ধি সক্রিয় থেকেও প্রভাবিত নয় অথবা বুদ্ধি যেখানে সংস্কৃতির একমাত্র নিয়ামক নয়, সেই সংস্কৃতির প্রকাশ ধরা পড়ে শিল্পকলায়। অতীতের রাজা বাদশাহের কীর্ত্তিকাহিনী এই শতকের জনজীবনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। সে প্রভাব কোন ঐশ্বর্য্যের বা জনহিতকর কাজের প্রভাব নয়—সে প্রভাব হোল শিল্প ও শিল্পীর মানসলোকের প্রভাব—আন্তরিকতা আর হৃদয়াবেগের প্রভাব, কিছুটা উপলব্ধির প্রভাব। সেদিনের রাজা বাদশাহরা অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপের মাঝে নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, বিশ্রাম এমন কি প্রতাপ ও প্রভাব জাহির করবার জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ ও সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণের দিকে সুতীক্ষ্ণ নজর দিতেন। কিন্তু যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত কীর্ত্তিসমূহ কোথায় হারিয়ে গেল। ক্ষেত্রবিশেষে অক্ষত বা প্রায় লুপ্ত অবস্থায় এইসব প্রাসাদগুলি শুধুমাত্র এখন জড়গৌরবের সাক্ষ্যরূপে দেশের বিভিন্নস্থানে বিরাজ করছে। অধিকন্তু যুগের সাথে সাথে লোকের রুচিও পালটেছে, অতএব সে যুগপরিবর্ত্তন যে রুচি, শিল্পে বা শিল্পী-মানসে আসবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। তাই এই শতকের মানুষ দুর্গ বা প্রাসাদ নির্মাণের কথা ভাবেন না, ভাবেন অত্যন্ত আধুনিক নকশার গগনচুম্বী অট্টালিকার কথা। কিন্তু তবুও ইতিহাস কেটেছেটে বাদ দিতে পারা যায় না, ঐতিহাসিক জিনিষগুলি তাই আজও আমাদের কাছে বিস্ময়ের সামগ্রীরূপে ধরা দেয়, আর তাই অতীতের জিনিষগুলি আঁকড়ে ধরে রাখি সংগ্রহশালায়। মিউজিয়ামের দ্বারে তাই এত ভিড়, তাই বিদেশী পর্য্যটকের এত আনাগোনা। কেননা এই সমস্ত অতীতের নির্মাণ বৈচিত্র্য, পরিকল্পনা, শিল্পমাধুর্য্য আমাদের

মনকে সহজেই জয় করে। এই শিল্পসম্ভার অর্থ, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধি, দীপ্তির এক সামগ্রিক সমন্বয়। কি অপূর্ব শিল্প প্রতিভা, কি অপূর্ব কারুকার্য্য, কি অপূর্ব শিল্প নিদর্শন !

প্রতিদিনের চলমান জীবনের কামনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনার বিচিত্র গতি-প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের প্রকাশ ঘটে এই শিল্পকলায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এইসব বিচিত্র কালজয়ী, কালাতীত রূপকে প্রত্যক্ষ করবার কোন উপাদান আমাদের হাতে নেই। কালপ্রবাহকে অতিক্রম করে যারা আজও বেঁচে আছে, সেই জরাজীর্ণ মন্দিরগাত্র, ব্রতানুষ্ঠানের মাটির গড়া নানামূর্ত্তি, আলপনা, পুতুল আর খেলনা, মনসা বা গাজীর পাটচিত্র, মাটিলেপা বেড়ার বা সরার উপর রঙীন চিত্র ও নকশা, কাঁথার উপর বিচিত্র সূচীকার্য্য, খুঁটি ও খড়ের তৈরী ধনুকাকৃতি দোচালা, চারচালা বা আটচালায়, নানা বাঁশ ও বেতের শিল্পে এবং বিভিন্নপ্রকার গৃহকলায় সেই প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারাই বহমান।

বাংলাদেশের নিজস্ব মন্দির-স্থাপত্যশৈলী মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত :—(১) চালা মন্দির—দোচালা, চারচালা, আটচালা ইত্যাদি, (২) রত্নমন্দির (দেবগৃহ—এক বা একাধিক চূড়া) ও (৩) দালান-মন্দির (সামনে খিলানযুক্ত বারান্দা সমেত সমতল ছাদের দেবালয়)। অতীতদিনে সহজলভ্য উপকরণ যেমন বাঁশ, কাঠ, পোড়া ইট ইত্যাদি যখন যা পাওয়া গেল তাই দিয়ে বাঙ্গালী চিরকালের বাসগৃহ কুঁড়ে ঘরের আদলে সবচেয়ে সরলরূপ দো-চালার আকারে প্রথম মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিল। এই বিশেষ নির্মাণ রীতিটি বাংলার নিজস্ব রীতি এবং তৎকালীন মুঘল স্থপতিদের কাছে যে খুবই সমাদৃত হয়েছিল তার নিদর্শন মুঘল শক্তির প্রাণকেন্দ্রগুলিতে ও রাজস্থানের বিভিন্ন শহরে দেখা যায়।

ভারতীয় স্থাপত্যে নাগর, বেসর ও দ্রাবিড়-শৈলী স্বীকৃত। কিন্তু পুরাপুরিভাবে তার কোনটাই বাংলাদেশে অনুসৃত হয় নি। আবার

উড়িষ্যায় যে নাগর-শৈলীর বৈশিষ্ট্য তা যে বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পকে প্রভাবিত করে নি, এমনও নয়। মেদিনীপুর খুব নিকটবর্ত্তী হওয়ার জন্য উড়িষ্যার প্রভাব অনস্বীকার্য্য। অর্থাৎ সুউচ্চ শিখর-সংলগ্ন জগমোহন ও তার সামনের নাটমণ্ডপ ও ভোগমণ্ডপ, একাধিক উপমন্দির ও প্রাকারবেষ্টিত প্রশস্ত অঙ্গন সেখানে খুব বেশী। কিন্তু উড়িষ্যা থেকে দূরত্ব যতই বেড়েছে, এই বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ততই কমেছে। বাঁকুড়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী হওয়ার জন্য বাংলা রীতির প্রাধান্য বেশী। আরও দূরের জেলা হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ-পরগনা, বর্ধমানে উড়িষ্যা-রীতির প্রতিফলন খুবই কম এবং আরও তফাতে বীরভূম, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদে নেই বললেই চলে।

কোন স্থানের মন্দির বা ইমারত তৈরীর রীতি ও প্রস্তুতি অনেকাংশে নির্ভর করে কি ধরণের উপাদান সেইস্থানে অথবা কাছেপিঠে পাওয়া যায় তার উপর। ভারতের অন্যত্র পাথরের সৌধ যত বড় ও বেশী আকারে দেখা যায়, বাংলাদেশে তা হতে পারে নি। তার প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় যে সেখানে পাথরের নিতান্তই অভাব। পশ্চিম প্রান্তের জেলাগুলিতে কিছু কিছু নিকৃষ্ট ধরণের পাথর পাওয়া গেলেও তা পরিবহনের ব্যয় বাহুল্যের জন্য সংগ্রহ করে সৌধ বা মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। একমাত্র রাজারাজড়া এবং বিত্তশালী ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষের তা কল্পনা-তীত। শ্বেতপাথর তো দূরের কথা, সামান্য বেলেপাথর সংগ্রহ করার জন্য রাজমহল ও চূনারের শরণাপন্ন হতে হয়। গ্রানিট প্রভৃতি কঠিন জাতীয় পাথরের স্থায়িত্ব ও ভারবহন ক্ষমতা যে পোড়ামাটির ইটের অপেক্ষা অনেক বেশী সে কথা না বললেও চলে। সেজন্য বাঙ্গালী কোনদিনই পুরীর জগন্নাথ বা ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দিরের মত সুবিশাল সৌধ গড়ার কথা চিন্তা করে নি। বাংলাদেশে ইটের তৈরী ইমারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় কয়েকটি আজও অবশিষ্ট আছে যেমন সুন্দরবনের জটার দেউল, মেদিনীপুরের হট্টনগর শিবের

মন্দির, বাঁকুড়ার বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির, বর্ধমানের দু'টি দেবালয়, পুরুলিয়ার পারা ও দেউলঘাট বড়মের তিন চারটি মন্দির। প্রাকৃতিক কারণে এবং বস্তু অভাব-জনিত বাঙ্গালী-স্থপতিরা স্বল্পস্থায়ী ভঙ্গুর ইট ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন বলে ইমারত পরিকল্পনায় তাঁদের কঠোরভাবকে সংযত রাখতে হয়েছে।

ভারতীয় শিল্পকলা আর্য্য-অনার্য্যের সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে এসেছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতিকে কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করেছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই মধ্য-এশিয়ার নানা যাযাবর জাতি—যেমন প্রথম শতকে ইউচি-শক-কুষাণ, দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে হুণ—তাদের নিজেদের সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে ভারতবর্ষের বুকে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বহুদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের বুকে তাদের সংস্কৃতির ছাপ দেখা না গেলেও ভিতরে ভিতরে পুরাতন ভারতীয় রীতি ও আদর্শ রূপান্তরিত হচ্ছিল অন্ততঃ শিল্পের এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তার ইতস্ততঃ প্রমাণ পাওয়া যায় এবং অষ্টম শতক থেকে ভাস্কর্য্য, প্রাচীর ও অন্যান্য শিল্পে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার অন্যদিকে এই শতকে ক্লাসিকাল সংস্কৃতির অবসানের ফলে স্থানীয় লোকায়ত শিল্প নিজেকে ব্যক্ত করার অপূর্ব সুযোগ পায়। এই রূপান্তরের আর এক অর্থ ক্লাসিকাল যুগের অবসান ও মধ্যযুগের সূচনা। প্রাচীন বাংলাদেশে কিন্তু আর্য্য সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ স্পর্শ খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের আগে লাগে নি। কেননা তদানীন্তন সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল মধ্যদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয় নি। তবে তার আগে রাঢ় পুণ্ড্র-সুহ্ম ও বঙ্গ প্রভৃতি জনপদ নিজেদের ঐতিহ্য-শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে ভারতবর্ষের একধারে পড়ে ছিল আর্য্যমনের অবজ্ঞা আর অজ্ঞতায়। ভারতবর্ষে প্রথম পাথর কুঁদা আরম্ভ হয় মৌর্য্য আমলে বা তারও কিছু আগে, কিন্তু সেই শিক্ষা বাংলাদেশে পৌঁছাতে আরও কয়েকশত বৎসর লেগেছিল। গুপ্তপর্বের আগে কিছু কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বাংলাদেশের কোন কোন জায়গায় পাওয়া যায়. কিন্তু তার বেশীর ভাগ

পোড়ামাটি, যার ফলে অধিকাংশই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত। সুন্দরবনের কাশীপুরে প্রাপ্ত সূর্য্য মূর্ত্তিটি মার্জিত রসবোধ ও অধ্যাত্ম-চেতনাদীপ্ত। এই মূর্ত্তিটিতে গুপ্তশৈলীর যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, বাংলায় প্রাপ্ত আর অন্য কোনটিতে এত সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না। মুর্শিদাবাদে মালার গ্রামে চক্রপুরুষের একটি মূর্ত্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত আমলের প্রতিমারূপের যে রূপান্তর পরবর্ত্তীকালে দেখা যায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় চব্বিশ পরগনার মনিরহাট গ্রামের একটি শিবমূর্ত্তিতে। এই শতকে আরও যে পনেরো ষোলটি মৃৎফলক পাওয়া যায় সেগুলি স্থূল, গুরুভার গড়ন, ও একটিতে গতিময়তার আভাষ থাকলেও তার আড়ষ্টতা কিছুতেই দৃষ্টি এড়ায় না। গুপ্তশৈলীর অপরূপ সূক্ষ্ম রেখা, নমনীয়তার কোন চিহ্ন নেই। এইগুলিতে পাল আমলের ফলক রচনা বিন্যাসের পূর্বাভাষ যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি গুপ্তশৈলীর মার্জিত রূপের সঙ্গে এদের দূরত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সপ্তম-অষ্টম শতকের মূর্ত্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের প্রায় সমস্তই পূজার্চনার জন্য তৈরী দেবদেবীমূর্ত্তি এবং এদের নির্মাণ ও রচনাবিন্যাস একান্তভাবে প্রতিমালক্ষণশাস্ত্র অনুযায়ী। সভ্যতার প্রারম্ভেই জৈনধর্মের প্রথম ঢেউ বাংলাদেশে এসে পৌঁছালেও খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতক নাগাদ এ ধর্মের প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয়, তার প্রধান কারণ পালরাজবংশ ধর্ম বিষয়ে উদার মতাবলম্বী হলেও তাঁরা বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। তাছাড়া খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেশব্যাপী পুনরুত্থান বাংলাদেশে জৈনধর্মের অবনতি ঘটায়, তবে সেন আমলে জৈনধর্মের চর্চ্চা যে একেবারেই ছিল না এমন নয়।

পাল ও সেন আমলে বাংলার শিল্পকলা যেরূপ রাজাদের বা বিত্তশালী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল তা অন্যান্য শতকে সম্ভব হয় নি। পালরাজবংশ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী কিন্তু তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশেরও সহায়ক ছিলেন। সেন রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এই যুগে প্রতিমা শিল্পের রচনাবিন্যাসে এবং দেহভঙ্গিতে

অতিরিক্ত সংবেদনশীলতার আবেদন, দেউলে ও গঠনে ইন্দ্রিয়পর ইহমুখিতার আকর্ষণ। খ্রীষ্টাব্দ ৭৫০-১২৫০ পর্য্যন্ত সমস্ত শিল্পের মূল প্রেরণা ছিল বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রানুমোদিত। প্রতিমাশাস্ত্রের দিক থেকে এদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, শিল্পের দিক থেকে এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। শিল্পরীতি ও আদর্শ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক। পালপর্বের আগে প্রস্তর-ভাস্কর্য্যের নিদর্শন বাংলাদেশে খুব একটা নেই। যে কয়েকটি নিদর্শন অবশিষ্ট আছে তাতে সন তারিখ উৎকীর্ণ না থাকার জন্য এদের গঠন ও রূপ বিশ্লেষণ ছাড়া কাল নির্ণয়ের অন্য কোন উপায় নেই। সাধারণভাবে বলতে গেলে পাল-সেন পর্বের সমস্ত মূর্ত্তিই সূক্ষ্ম ও অপেক্ষাকৃত মোটা দানার কষ্টিপাথরের তৈরী। ধাতব মূর্ত্তিগুলি পিতল অথবা অষ্টধাতুতে গড়া। সোনা ও রূপার তৈরী দু'একটি মূর্ত্তিও পাওয়া যায়। এই পর্বের মূর্ত্তিকলায় যে ভঙ্গ ও ভঙ্গি এবং মুদ্রার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তার বীজ উপ্ত হয়েছিল গুপ্তপর্বের শিল্পকলায়।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত মুসলমানেরা বন-জঙ্গলে ঘাঁটী না গড়লেও তাদের শিল্পনীতি বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পকে কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। গুহামন্দির ছাড়া প্রাচীনতম ভারতীয় দেবালয়গুলিতে চারিদিকের দেওয়াল কিছু অবধি তুলে, তাদের শীর্ষে লম্বা লম্বা পাথরের পাটা আড়াআড়িভাবে রেখে ছাদ তৈরী হোত—এই রীতিটি গুপ্তযুগের কিছু কিছু মন্দিরে এখনও দেখা যায়। মুসলমানী আমলে খিলান ও গম্বুজের নির্মাণ প্রথায় উৎকর্ষ দেখা যায়। দু'এক বৎসরের মধ্যে হিন্দুশিল্পীরা এ বিদ্যা আয়ত্ব করলেন যে খাড়া দেওয়ালের চারকোণে প্রয়োজনীয় উচ্চতায় লহরার বিন্যাস করে তার উপর বৃত্তাকার গম্বুজের মূল স্থাপন করা চলে। তারপর প্রতি স্তর ইট ধাপে ধাপে একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে গম্বুজের চারিদিকে বৃত্তাকার দেওয়ালকে এক শীর্ষ বিন্দুতে মিলিয়ে দিতে তাদের খুব একটা অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। এছাড়া ঢাকা বারান্দা-

গুলিতে ছাদ ও গর্ভগৃহের ছাদও যে খিলানের উপর স্থাপিত হয়েছে তাও মুসলীম রীতি প্রভাবিত। প্রবেশপথের খিলানগুলির চোখা কৌণিক গড়ন ও ফুলকাটা স্তরবিন্যাস এবং আটকোণা থামগুলির গঠন-প্রকরণে মুসলমানী প্রভাব পড়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে বাংলাদেশের বহু অধুনাতন ইটের মন্দিরের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য টেরাকোটা বা পোড়ামাটির অলংকরণ যে অব্যবহিত পূর্বের মুসলীম রীতি দ্বারা প্রভাবিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতে পোড়ামাটির ব্যবহারের ঐতিহ্য বহুকালের হলেও মধ্যযুগের শেষদিকে এ শিল্পের চর্চা হয়েছে শুধুমাত্র বাংলাদেশে। সেজন্য বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান ভাস্করদের এই অপরূপ শিল্প-সৃষ্টি সমকালীন ভারতবর্ষে তুলনাহীন।

খ্রীষ্টীয় তেরো শতকের প্রথমে অর্থাৎ মুসলীম আর্বিভাবের পরবর্ত্তী দু'শো বছরে বাংলাদেশে সম্ভবতঃ খুব কম মন্দিরই তৈরী হয়েছে। মুসলীম ইমারতের গঠনরীতি থেকে সবচেয়ে উপকৃত হন হিন্দু স্থপতিরা, কেননা হিন্দুযুগে পোড়ামাটির সজ্জা-প্রকরণে তাঁদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকলেও মাঝখানে মুসলীম আমলে তা প্রায় লোপ পেয়েছিল। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে যখন তাঁরা হাত দিলেন তখন জ্যামিতিক ও ফুলপাতা নকশা এক নূতন রূপ নিল। কঠিন ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা থাকার জন্য মুসলীম শিল্পীরা নরনারী এমন কি পশুপাখীর মূর্ত্তি রচনা করতে পারেন নি, দেবদেবীর কথা তো স্বতন্ত্র। কিন্তু হিন্দু ভাস্করদের হাতে পড়ে টেরাকোটার মরা গাঙে বান এলো। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীর স্থান ঘটল এই সব টেরাকোটায়। যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে তবুও যে কয়েকটি আছে তা দেখলে মনে হয় উঁচুমানের দক্ষতা ও কলাকৌশলে সেগুলি তৈরী। বাঙ্গালীর অন্দর মহলের বিবিধ ঘরোয়া ছবিও বাদ পড়েনি। পাশাখেলা, উৎসব, পার্বণ, কন্যাসম্প্রদান, বধূবরণ, সাজসজ্জা ও বাদ্যযন্ত্র অনুশীলনও টেরাকোটা

শিল্পীদের অজস্র চিত্ররূপের সন্ধান দিয়েছে। অপসৃত সমাজ-জীবনের সেগুলি যে মূল্যবান আলেখ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলার চিত্রকলার প্রাচীনতম যে সব নিদর্শন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় তা প্রায় সমস্তই একাদশ ও দ্বাদশ শতকের এবং প্রত্যেকটাই পাণ্ডুলিপিচিত্র অর্থাৎ তালপাতায় বা কাগজে হাতের লেখা পুঁথি অলংকরণোদ্দেশ্যে আঁকা ছবি। ছবিগুলি যদিও ছোট তবুও সূক্ষ্ম, ধীর অথচ তীক্ষ্ণ, ভাবকল্পনার পরিধি বিস্তৃত ও গম্ভীর, রঙের বিন্যাসও প্রশস্ত। চিত্র বিন্যাসের রীতি অনেকটা ভাস্কর্য্যের রীতি অনুসরণ করেছে। ছবিগুলিতে যে সব রঙ ব্যবহার করা হোত তারমধ্যে হরিতালের হলুদ, খড়িমাটির সাদা, গাঢ় নীল, প্রদীপের শীষের কালো, সিঁদুরের লাল ও সবুজ। মূলগত আদর্শের দিক থেকে এই চিত্রশিল্প বাঘ-অজন্তা-ইলোরার গুহার প্রাচীন চিত্রের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই ব্যাপারে সুন্দরবনে পাওয়া ডু'সেট তাম্রপটে উৎকীর্ণ রেখাচিত্র উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে মন্দিরের যে কয়েকটি রূপ ও রীতির কথা আলোচনা হোল তার সঙ্গে বর্হিভারতে বিশেষ করে ব্রহ্মদেশে ও যবদ্বীপের অনেক মন্দিরের একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তাই মনে হয় বাংলাদেশই এইসব বর্হিভারতীয় প্রচেষ্টার মূল অনুপ্রেরণা।

বাংলার মূর্ত্তিকলা ভারতের ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশে অদ্যাবধি যে অসংখ্য মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার অধিকাংশই খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। বাংলাদেশে ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেকার কোন মূর্ত্তি এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। পাথরের মূর্ত্তির অস্তিত্ব ভারতবর্ষের তাম্র-প্রস্তর যুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে। বাংলাদেশে মাটিতে-গড়ামূর্ত্তির প্রাধান্য প্রাচীনকালেও খুব বেশী ছিল। কাঠের কারুকার্য্য খোদিত মূর্ত্তির উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে দেখা

যায়। এ থেকে বাংলাদেশে সেকালে মাটির ও কাঠের মূর্ত্তির প্রচলন খুব বেশী ছিল বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যায় যে বাংলাদেশে মূর্ত্তিকলার অস্তিত্ব থাকলেও পালপূর্বযুগের প্রস্তর নির্মিত মূর্ত্তি অল্পই পাওয়া যায়। প্রাচীন মূর্ত্তিগুলিতে কোন রকম সন বা তারিখ উৎকীর্ণ না থাকলেও মূর্ত্তিগুলির গঠন প্রণালীর বিভিন্ন ভঙ্গির সাহায্যে ওগুলির কাল নির্ণীত হয়েছে। মূর্ত্তি গঠনে যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা থেকে সন তারিখের কিছু কিছু মতভেদ থাকলেও গঠনভঙ্গির বৈশিষ্টাগুলিই মূর্ত্তির কাল নিরূপণে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের ধারাকে যুগ অনুযায়ী মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায় যেমন—হিন্দু, মুসলীম এবং ব্রিটিশ। হিন্দু-যুগের প্রারম্ভে যে সমস্ত ধারাগুলি প্রচলিত ছিল আজ তার অধিকাংশই লোপ পেয়েছে। প্রকৃতি এই দেশে কেবল উর্বশীই সাজে নি, সর্ব-সৃষ্টির ধ্বংসকারিনীর ভূমিকাও গ্রহণ করেছে। অনেকের ধারণা পাথরের মন্দির হলে তা হয়তো প্রকৃতির হাত থেকে রক্ষা পেত, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। ইটের তৈরী সৌধ যে দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকতে পারে তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশের কানপুর জেলায় ভিতগাঁও-এর হিন্দু মন্দিরটি ইটের তৈরী এবং সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর, মধ্যপ্রদেশের খারোদ ও সিরপুরে কয়েকটি ইটের মন্দির আছে এদের প্রতিষ্ঠাকাল খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর। ইটের তৈরী খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দু'টি স্তূপ পাওয়া গেছে সোলাপুরে তের নামক স্থানে এবং অন্ধ্রের চেজারালাতে, কিন্তু বাংলার প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় যদি অনুরূপভাবে এই সব অঞ্চলে ঘটত তা হলে ঐ সমস্ত মন্দির এবং স্তূপগুলির অবস্থার যে বিপর্য্যয় ঘটত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং দোষটা উপকরণের নয়—সম্পূর্ণ প্রকৃতির। ইটের মন্দিরকে টিকিয়ে রাখার জন্য বাংলার শিল্পীরা চেষ্টার ক্রুটী করেন নি, কিন্তু কোন লাভ হয় নি, প্রকৃতি তাঁদের উপর সদয় হয় নি।

বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের প্রকৃত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের যথাযথ সূচনা হয় মুসলীম যুগে।. কেননা এই যুগেই বাংলার মন্দির শিল্পীরা মৌলিকত্বের পরিচয় দিলেন। যদিও মুসলীমের প্রকোপে বহু হিন্দু মন্দিরের অকাল পতন ঘটেছে এবং কোন কোন স্থানে সেই ভিত্তির উপর মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবুও একথা বলতে বাধা নেই যে এতদিন পর্যন্ত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে ধারাগুলি তাঁরা অনুসরণ করে এসেছেন তা ভিন্ন প্রদেশাগত, কিন্তু এবার তাঁরা যে পথে অগ্রসর হলেন তা একান্তভাবেই স্বদেশের। এইকালে মন্দির স্থাপত্যের যে বিশেষ ধারাগুলি বিস্তৃতিলাভ করে তাদের উৎস এবং উৎপত্তিস্থল বাঙ্গালীর সনাতন গৃহ। বহিরাগত স্থাপত্য-প্রভাবের অনুপ্রবেশ যে এর পর ঘটে নি, তা নয়, কিন্তু বাংলার এই নবজাত অথচ বলিষ্ঠ স্থাপত্য ধারার সঙ্গে তাঁদের আপোষ করতে হয়েছে।

আরও অনেক পরে এই দেশে আগত ইউরোপীয়দের নিকট তার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। একদিকে যেমন বিদেশাগত গ্রীক ও গথিক স্থাপত্য ভারতে অনুপ্রবেশ করল তেমনি অপরদিকে বাংলার নিজস্ব গৃহনির্মাণশৈলী বিদেশীদের দ্বারা গৃহীত হয়ে এক স্থাপত্যগত তথা সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

ইউরোপীয় বিশেষ করে ইংরাজদের দ্বারা নির্মিত "ডাক-বাংলোর" উৎস হোল বাংলার সেই সনাতন বাসগৃহ। মন্দির শিল্পের যে অংশটিতে ইউরোপীয় প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী বিস্তৃতি লাভ করেছিল তা হোল অলংকরণ বা ভাস্কর্য্য। মন্দির অলংকরণে চুণ-বালি ও চুণ-সুরকির ব্যবহার আদি বা মধ্যযুগে জানা ছিল না, এমন নয়, কিন্তু ইংরাজদের আগমনের পর থেকেই এই ত্রিবিধ উপকরণের ব্যবহার বিস্তৃতি লাভ করল এবং পোড়ামাটি শিল্পের পতনের পর মন্দির সজ্জার জন্য শিল্পীরা আশ্রয় করলেন এই উপকরণ গুলিকেই। মন্দিরগাত্রে চুণের মসৃণ প্রলেপ দিয়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি

করা যায় তা পোড়ামাটির অলংকরণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। প্রলেপদান ছাড়াও চুণের সাথে সুরকি বা বালি জমিয়ে মনুষ্যমূর্তি, জীবজন্তু, পুষ্পস্তবক, লতাপাতা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়-বস্তুকে মন্দিরের গায়ে উপস্থিত করলেন শিল্পীরা। ইউরোপীয় সৌধ সজ্জার সুপ্রচলিত বিষয়গুলি যেমন ঝুলন্ত পুষ্পমাল্য (ফেষ্টুন), কুণ্ডল (পেনডাণ্ট), ঢাল (মনোগ্রাম) ইত্যাদি সযত্নে সন্নিবিষ্ট হোল।

আর একটি বিষয়ে বাংলার শিল্পীরা এই যুগে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন—সেটি হোল মন্দিরের গায়ে মিথুনের বহুল ব্যবহার। মন্দিরে মিথুনের ব্যবহার ভারতে সুপ্রচলিত ছিল, বিশেষ করে হিন্দুযুগে। পূর্বপাকিস্তানের পাহাড়পুরের মিথুনের দৃশ্য দেখে একথাই মনে হয় যে ঐ সময় পশ্চিম বাংলায়ও মিথুনের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মুসলীমযুগেও মিথুনের ব্যবহার হয়েছে মন্দিরে। কিন্তু সেখানে কৃষ্ণলীলার একটা আধ্যাত্মিক আবরণ থাকায় কাম ও সংযমের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছিল। ব্রিটিশযুগে নির্মিত পোড়ামাটির মন্দিরে মিথুনের যে সব উদাহরণ দেওয়া আছে তা দেখে মনে হয় যে শিল্পীরা ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে পুরুষ ও নারী যেমন প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে ভিতর ও বাহিরের অস্তিত্ব ভুলে যায়, তেমনি প্রাণপুরুষ প্রজ্ঞাত্মার সাথে মিলিত হয়ে জাগতিক সুখদুঃখের বন্ধন মুক্ত হয়, তার আকাংখার পূর্ণ তৃপ্তি ঘটে, তখন সে আর কিছু চায় না, কোন বেদনা তাকে স্পর্শ করে না। মিথুনের ব্যবহার তার মূল কারণ থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে যখন নিরস প্রথাগত অলংকরণে পরিণত হোল তখন এলো বিকৃতি। সমাজের দুর্নীতি যতই বাড়তে থাকে এই বিকার ততই বেড়ে চললো। তাই ব্রিটিশ বাংলার মন্দিরে মিথুন দৃশ্যের নায়ক নায়িকা পুরুষ ও প্রকৃতি নন, তারা সমকালীন সমাজের পুরুষ ও নারী। পটচিত্র বাংলার লোকশিল্পের অন্যতম একটি বিশেষ

আকর্ষণ। আবহমনকাল ধরে পটচিত্রন আমাদের দেশে চলে আসছে। ধাতু ঢালাই বা পাথরে খোদিত চিত্রকলার তুলনায় রঙ-তুলির শিল্প সম্ভারের আয়ু যেহেতু কম এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে বিনাশ-হেতু প্রাচীন চিত্রিত পট দেখার আশা আমাদের ত্যাগ করতে হয়েছে। তবে দশম শতাব্দীর পরে অর্থাৎ পাল এবং পালোত্তর যুগের চিত্র-নমুনা দেশে ও বিদেশে কিছু কিছু সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে। পাল যুগের পূর্বে চিত্র সম্পর্কে আমাদের সাধারণতঃ দু'টি জিনিষের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। প্রথমতঃ পুরাতাত্ত্বিক খনন ও দ্বিতীয়তঃ লিখিত সাহিত্য। পালি সাহিত্য থেকে শুরু করে মালবিকাগ্নিমিত্র, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, মুদ্রারাক্ষস, হর্ষচরিত, উত্তররামচরিত প্রভৃতি সকল প্রাচীন সাহিত্যে চিত্রায়িত পটের উল্লেখ আছে, এমনকি প্রাক্ বৈদিক যুগের শীলমোহর ও অন্যান্য পুরাসামগ্রীতেও পটচিত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত কয়েকটি বৌদ্ধ গ্রন্থে চিত্রপ্রাচুর্য্য উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের চিত্রের ধারা ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন যুগমন্দির দ্বারা বারে বারে প্রভাবিত হয়েছে। লোকপ্রিয় লোককলা পটচিত্রও তার ধারাকে যুগযুগান্ত ধরে অটুট রাখতে পারেনি। নানা রাজ্যের শৈলীর প্রভাব যেমন তার উপর পড়েছে তেমনি অন্যান্য রাজ্যও বঙ্গীয় চিত্রশৈলী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যায় যে বাংলাদেশ প্রত্যন্ত দেশ বলে আর্য্য সংস্কৃতির ঢেউ এখানে এসে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছে। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রতি আর্য্যদের একটা উদাসীনতা ও অবজ্ঞার ভাব সক্রিয় ছিল। উপরন্তু বাংলার আদিম সমাজও আর্য্য সংস্কৃতির উপর খুব শ্রদ্ধান্বিত ছিল না এবং এই সংস্কৃতির স্রোতকে যতটা সম্ভব ঠেকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্য্যায়ে তারাই আর্য্য-সংস্কৃতির সঙ্গে বুঝাপড়া করে একটা সমন্বয় গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে আর এইভাবে একদা বাংলার শিল্পকলার সৃষ্টি হয়েছিল।

মালদহ

বরেন্দ্রভূমির কোথায় সেইস্থান যেখানে রাজশ্রী অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ-বিসর্জন দিয়েছিলেন, কোথায় রাজ্যবর্দ্ধন অন্যায় যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন, কোথায় গৌড়দ্বীপে শশাঙ্ক রাজত্ব করতেন, এবিষয় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে। বরেন্দ্রভূমি নূতন নূতন নাম নিয়ে প্রাচীন ভগ্নাবশেষ, দেবমন্দির, গম্বুজ, শিলালিপি বুকে নিয়ে ইতিহাসের পাতায় আজও বেঁচে আছে জয়ের গৌরব ও পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে। একদা বৌদ্ধধর্মের ঢেউ অন্যান্য প্রদেশের মত এই বরেন্দ্রভূমিকেও প্লাবিত করেছিল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে গৌড়রাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মমন্দির ভেঙ্গে শিবমন্দির গড়ার আদেশ দিয়েছিলেন। তারপর অষ্টম শতাব্দীর ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। বস্তুতঃ তখন গৌড়ে বিভিন্ন নরপতির উত্থান-পতন ঘটেছিল। নবম শতাব্দীর শেষে পালবংশের উত্থানের ইতিহাস। মালদহ জেলার খালিমপুরে গোপালের পুত্র ধর্মপালের যে তাম্রলিপি পাওয়া গেছে তাতে গোপালকেই সার্ব্বভৌম গৌড়াধিপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গোপালের মৃত্যুর পর ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং রাজা শশাঙ্কের পথ অনুসরণ করেন। এমনকি শশাঙ্ক যেখানে কৃতকার্য্য হতে পারেন নি সেইসমস্ত দেশকে নিজের করায়ত্ত করেছিলেন। "তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গী বিকাশে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, কীর, অবন্তি, গান্ধার, প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালকে প্রণতিপরায়ণ চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করাইতে করাইতে হৃষ্টচিত্তে পঞ্চালবৃদ্ধ কর্ত্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া কান্যকুব্জরাজকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন," (Indian Antiquary Vol. IV., page—366).

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেবপালের রাজত্বকাল গৌড়ের একটি গৌরবময় যুগ বলে ঐতিহাসিকেরা অভিমত প্রকাশ করেন।

পালরাজগণের সময়ও এই বরেন্দ্রভূমিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি, তবে এই বংশের শেষের দিকে যখন রাজশক্তি হীনবল হয়ে পড়েছিল তখন অর্থাৎ হাজার চব্বিশ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ প্রথম রাজেন্দ্র চোল বঙ্গদেশ (বঙ্গালদেশ) আক্রমণ করেছিলেন। এই সময়ে পাল সিংহাসনে যিনি আসেন তিনি চোল রাজ্যের নিকট পর্য্যুদস্ত হয়েছিলেন। তাঁর সময়েই ভারতের উত্তর খণ্ডে বারংবার তুর্কী আক্রমণ ঘটেছিল। এইসব আক্রমণের মধ্যে গজনীর মামুদের আক্রমণই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাঁর পৌত্তলিকতা বিদ্বেষের জন্য সমস্ত মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। মহীপাল জনহিতকর কার্য্যে অত্যধিক মনঃসংযোগ করার জন্যই বোধহয় যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। সেনবংশের পতনের পর এই ভূখণ্ডে মুসলমানগণের আগমন শুরু হয়। তাঁরা প্রথমে এসেছিলেন লুটতরাজ চালাতে, পরে বাংলার ঐশ্বর্য্য তাঁদের আকৃষ্ট করলে তাঁরা আধিপত্য ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্ঠায় আগ্রহী হন। প্রথম পর্য্যায়ে অনেক হিন্দুকীর্ত্তি বিনষ্ট হয়েছিল সত্য, কিন্তু তাঁরা যখন বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি উপলব্ধি করলেন তখন তাঁরা শুধু যে পাল-সেন রাজাদের কীর্তিগুলি রক্ষণা-বেক্ষণই করলেন তা নয়, তাঁরা নূতন নূতন কীর্ত্তি স্থাপনে ব্রতী হলেন। নির্মিত হোল আদিনা মসজিদ, সোণা মসজিদ, চামকাটি মসজিদ ইত্যাদি। এঁরা বোধহয় ধর্মীয় প্রচারটা বড় করে দেখেন নি, তাহলে হয়তো হিন্দুকীর্ত্তি শুধু আজ স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও স্বয়ং বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য এই ভূখণ্ডে একাধিকবার এসেছিলেন তার প্রমাণ শ্রীপট্ট আজও বর্তমান। আবির্ভাব ঘটেছিল হলায়ুধ, রূপসনাতন, রঘুনন্দন, রামাই পণ্ডিত প্রভৃতি বিদুষী প্রতিভাধরদের। শিল্পে, সাহিত্যে, ললিতকলায়, ভাস্কর্য্যে মালদহ একদা

ভরপুর হয়ে উঠেছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণিয়া, দিনাজপুর রাজসাহী প্রভৃতি জেলার কিছু কিছু অংশ নিয়ে পুর্নগঠন করা হলেও ১৮৩২ সাল থেকে মালদহকে প্রকৃতভাবে জেলার মর্য্যাদা দেওয়া হয়। স্মরণাতীত কাল থেকে এই জেলার বিভিন্নস্থান থেকে বিভিন্নজাতির আবির্ভাব ঘটেছিল যেমন নাগর, রাজবংশী, কোল, সাঁওতাল, মুণ্ডা ভুঁইহার, কুঞ্জরা ইত্যাদি।

পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ বলতে মোটামুটি মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ বোঝাত এবং এটাই ছিল প্রাচীন গৌড়জনপদ। প্রাচীনকাল থেকে আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গদেশ পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, ব্রজ, তাম্রলিপ্ত, সমতট ও বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। হিন্দুযুগের শেষভাগে বাংলাদেশ—গৌড় ও বঙ্গ প্রধানতঃ এই দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। মুসলমানযুগের শেষভাগে গৌড়দেশ বলতে সমস্ত বঙ্গদেশকেই বোঝাত। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের কোন কোন জৈনগ্রন্থে জানা যায় প্রাচীন লক্ষণাবতী (মালদাস্থিত) গৌড়নগরের অন্তর্গত ছিল।

প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির এক বিচিত্র লীলাভূমি এই উত্তরবঙ্গ। সুদূর রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ থেকে কত বিচিত্র জাতি এসেছে, রাজ্য, নগর, দুর্গ, মন্দির, মসজিদ গঠন করেছে, আবার কালের নিয়মে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আবার এসেছে নূতনদল তারাও উজ্জ্বল সাক্ষর রেখে মিলিয়ে গেছে কালগর্ভে। উত্তরবাংলায় প্রাচীন-কালে যে ভাব-সংঘর্ষ ও ভাব-সংস্কৃতি ও সংহতি ঘটেছিল তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে গৌড়ের মন্দির, মসজিদ, দুর্গ ইত্যাদি। কেন যে মসজিদের গায়ে হিন্দুদেবদেবীগণের নানামূর্ত্তির অলংকরণ তা আজও জানা যায় না। তবে মনে হয়, মন্দিরের উপকরণ মসজিদের কাজে লাগানোর ব্যাপক চেষ্টা হয়েছিল।

মুসলমানের আক্রমণে শুধুমাত্র হিন্দুমন্দির ও হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থই বিনিষ্ট হয় নি, বৌদ্ধধর্মের উপরও প্রবল আঘাত হানা হয়েছিল।

মোগল আমলে শুধু মালদহে নয়, দিনাজপুরের উপর বাদশাহের দৃষ্টিও পড়েছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীতে মীরজুমলা যখন ঢাকা অভিযানে যান তখন এই উত্তরবঙ্গের মধ্যে দিয়েই গিয়েছিলেন এবং পথে যে সমস্ত হিন্দুকীর্ত্তি পড়েছে সমূলে তার বিলোপসাধন ঘটিয়েছিলেন।

পশ্চিমবাংলার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের ধারায় মালদহ জেলা আজও বেঁচে আছে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে ; বেঁচে আছে তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে। উড়িষ্যার শিল্পরীতি সুদূর মালদহ জেলায় পৌঁছায় নি তো বটেই, এমন কি ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রকেও এখানে ঠিকমত মেনে চলা হয় নি। তবুও মালদহ ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের ধারক ও বাহক এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সমগ্র মালদহ জেলায় যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য আজও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বেঁচে আছে তা সম্পূর্ণ মুসলীম প্রভাবিত। এই সমস্ত কারুকার্য্যময় ঐতিহ্য দেখলে দর্শকের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে মালদহ জেলার অন্তর্গত গৌড় একদা বাংলার রাজধানী ছিল। যে গৌড়ে রাজা শশাঙ্ক রাজত্ব করতেন, যে গৌড় পাল ও সেনরাজাদের অপ্রতিহত ক্ষমতায় প্রভাবিত ছিল, সে গৌড়ে আজ সেইযুগের হিন্দু নিদর্শন কিছু মেলে না কেন ? তাহলে কি এই গৌড় বাংলার রাজধানী ছিল না ? যদিও মুসলীম স্থাপত্যের পাশে আনাচে কানাচে দু' একটা দোচালা মন্দির দেখা যায় তবু সেই একটা প্রশ্নই মনে থেকে যায় যে সেই সমস্ত রাজাদের রাজ-প্রাসাদ বা অট্টালিকা কোথায় গেল ? খননকার্য্যের ফলে কিছু কিছু হিন্দুবাড়ীর (অন্ততঃ গঠন শৈলীর দিক থেকে) নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু তা বৃহৎ অট্টালিকা বা রাজপ্রাসাদ বলে মনে হয় না।

মালদহে যত মসজিদ দেখা যায় বাংলাদেশের আর কোথাও এরূপ দেখা যায় না। অন্যান্য জেলায় মসজিদের কাছে অনেক মন্দির অথবা মন্দিরের পাশে অনেক মসজিদের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ একদা হিন্দু-প্রভাবিত বাংলাদেশে বিশেষ করে

পালযুগীয় বাংলাদেশে সর্ব্বত্র হিন্দুমন্দির নির্মিত হয়েছিল। তারপর আসে মুসলীমযুগ এবং তারা হিন্দুবিদ্বেষী হওয়ার জন্য বেশীর ভাগ মন্দিরকেই মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এ নিদর্শন বহু আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মালদহে মসজিদের পাশে একটিও হিন্দুমন্দির স্থান পায় নি। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মালদহে মুসলীম আধিপত্য যতটা প্রবল ছিল অন্য জেলায় ততটা ছিল না। শাহজালালের সময় থেকে শুরু করে মীরজাফর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মালদহ জেলায় এই সমস্ত মসজিদের নির্মাণকাল।

মালদহের পূর্ব্বদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেই দেখা যায় বারো-দুয়ারী বা সোনা মসজিদ। এই মসজিদের নির্মাণকার্য্য আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় আরম্ভ হয়েছিল এবং নাসিরুদ্দিনের সময় এর সমাপ্তি ঘটে। এই মসজিদের নাম বারোদুয়ারী হলেও বস্তুতঃ এটা এগারো দরজাবিশিষ্ট। এই মসজিদের অধিকাংশই পাথরের তৈরী, কিন্তু ছাদের গম্বুজগুলি ইটের, বোধহয় সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোয় এই বিরাট মসজিদটি সোনার মত দেখাতো বলে নাম হয় সোনা-মসজিদ (আলোকচিত্র—১)। অনেকে বলেন যে একসময় এই মসজিদটি আদালত হিসাবে ব্যবহৃত হোত। স্ত্রীলোকদের বসবার পৃথক বন্দোবস্ত ছিল। এই মসজিদের আশেপাশে যে বড় বড় অট্টালিকা ছিল তার ধ্বংসাবশেষ আজও কিছু কিছু দেখা যায়।

দখলদরজা গৌড়ের সিংহদ্বার বা প্রধান প্রবেশ পথ ছিল। সোনা মসজিদ থেকে আধমাইল দূরে দক্ষিণপশ্চিমে বিরাট উচ্চ গড়বন্দি এবং পরিখাবেষ্টিত এই দরজা অবস্থিত। এর নিম্নাংশের কোন কোন অংশ পাথর নির্মিত। হোসেন শাহ যখন গৌড়ের সিংহাসনে আসীন তখন এই দরজার প্রতিষ্ঠা হয়। দরজা বন্ধ করার জন্য কারুকার্য্যবিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড কাষ্ঠদণ্ড ছিল যার নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান। প্রহরী বদলের জন্য লৌহ শৃঙ্খলযুক্ত এক বিরাট

ঘণ্টা ছিল। কেহ কেহ একে দাখিল দরজা বলে থাকেন। চারপাশে চারটি ইটের তৈরী মিনারও ছিল তবে বর্ত্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। পূর্ব্বদ্বারের অদূরেই ফিরোজমিনার (আলোকচিত্র—২)—৮৪ ফুট উঁচু বারো কোণবিশিষ্ট পাঁচটি ধাপে অবস্থিত। উপরে উঠবার জন্য পাথরের যে ঘোরানো সিঁড়ি ব্যবহার করা হোত তার সংখ্যা ছিল ৭৩টি। মিনারটি পূর্ব্বে আরও উঁচু ছিল কিন্তু ভূমিকম্পে উপরিভাগের কিছু অংশ ভেঙে যায়। বর্ত্তমানে মেরামত করা হলেও আগের মত উঁচু করা হয় নি।

উত্তর পশ্চিম দিকে বহুদূর বিস্তৃত লাল ইটের যে প্রাচীর দেখা যায় তা বাইশগাজীর প্রাচীর নামে খ্যাত। এর ভগ্নাবশেষের কিছু অংশ এখনও পশ্চিম প্রান্তে দেখা যায়। বর্ত্তমানে এর উচ্চতা ৪০ ফুট ও চাওড়া ২০ ফুটের মত হবে। তবে পূর্ব্বে ২২ গজ উচ্চতাবিশিষ্ট ছিল বলেই-এর নাম দেওয়া হয়েছিল বাইশগাজী। এই প্রাচীর বারবক শাহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এর উপরিভাগ খোদিত ইটদ্বারা সুশোভিত ছিল।

বড় সোনা মসজিদের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ভাগীরথীর তীরে গৌড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গটি বর্ত্তমান ছিল। কোন এক সময়ে এই দুর্গ উক্ত প্রাচীর দ্বারা চারিদিক বেষ্টিত ছিল এবং মধ্যস্থিত রাজ-প্রাসাদটি তিনভাগে বিভক্ত ছিল। এর প্রধান অংশ দরবার গৃহরূপে ব্যবহৃত হোত, দ্বিতীয় অংশ বাদশাহদের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং তৃতীয় অংশ অন্দরমহল হিসাবে ব্যবহৃত হোত।

শাহজালাল মহম্মদের পদচিহ্ন অঙ্কিত একখানি পাথর আরব দেশ থেকে আনয়ন করে কদমরসুলে স্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন এই পাথরখানি পূর্ব্বে পাণ্ডুয়ায় শাহাজালালুদ্দিনের তাব্রিজের গৃহে ছিল এবং সুলতান হোসেন শাহ গৌড়ে নিয়ে এসেছিলেন।

এই পদচিহ্ন মণিমাণিক্যের কারুকার্য্যখচিত একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে ছিল। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে নসরৎশাহ এই কদমরসুল মসজিদ (আলোকচিত্র—৩) নির্ম্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এই পদচিহ্ন সিরাজদ্দৌল্লা মুর্শিদাবাদে নিয়ে এসেছিলেন, পরে মীরজাফর আবার গৌড়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কদমরসুলের কাছেই দু'টি ছাপ্পরবিশিষ্ট জোড়বাংলা দেখা যায়। অনেকের মতে এটা লক্ষণসেনের আমলে তৈরী এবং হিন্দুবিগ্রহ মন্দিরও নাকি ছিল। এখন এতে আরঙ্গজেবের সেনাপতি দিলীর খাঁ-এর পুত্র ফতে খাঁ-এর কবর আছে। কদমরসুলের কাছেই খাজাঞ্চীখানা। আদায়ী টাকা এখানে মজুত করে রাখা হোত এবং প্রয়োজনানুসারে ব্যয় হোত। বর্ত্তমানে এই স্থানের চিহ্ন নেই বললেই চলে। এরই বিশপঁচিশ গজ দূরে বাঙালাকোট। রঙীন ইট পাথর দিয়ে তৈরী। পূর্ব্বে এতে হোসেন শাহের কবর ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই।

১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে চিকা মসজিদ তৈরী হয়। ইটের তৈরী গম্বুজবিশিষ্ট প্রাচীন মসজিদ। এই মসজিদকে জেলখানা বা আদালত হিসাবে ব্যবহৃত করা হোত বলে অনেকেই মনে করেন। বারান্দার তিন দিকে প্রহরী থাকত। দেওয়াল খুব সুদৃঢ়। "গুমতি"-র মধ্যে দিয়ে কয়েদীদের নিয়ে যাওয়া হোত। রাজপ্রাসাদের প্রবেশপথের পূর্ব্বদিকে দুর্গের পূর্ব্বদরজা বা লুকোচুরি গেট। উপরে নহবৎখানা ও নীচে প্রহরীদের থাকার জন্য কুঠরী ছিল। ৯১৮ হিজিরায় হোসেন শাহের আদেশে এই দরজা নির্ম্মিত হয়েছিল। এই দরজা দিয়ে শুধুমাত্র রাজপরিবারের লোকেরা যাতায়াত করতে পারত এবং সর্ব্বদা প্রহরী নিযুক্ত থাকত। এই দরজার আর এক নাম শাহীদরজা। চামকাটি মসজিদটি ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ইউসুফশাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়েছিল। এই মসজিদের নামকরণ নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। তেইশ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি প্রকোষ্ঠ আছে এবং প্রবেশদ্বারে বারান্দা আছে। প্রত্যেক কোণে আটটি

স্তম্ভ—সামনের দিকে তিনটি, বারান্দার প্রত্যেক কোণে একটি ক'রে দরজা আছে। পশ্চিমদিকে একটি কুলঙ্গি কিন্তু তাতে কোন দরজা নেই।

ইংলিশবাজার থেকে কিছুদূরে তাঁতিপাড়া মসজিদ। বাদশাহী আমলের এই জায়গার নাম ছিল মহাজনটোলা। চতুষ্কোণ কারুকার্য্যখচিত অত্যন্ত সৌখীন ও সুন্দর মসজিদ। বহির্ভাগে খোদিত ইট এবং অভ্যন্তরভাগ বিচিত্র পাথরের স্তম্ভে সুসজ্জিত ছিল। সম্ভবতঃ ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালে আরও একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল—নাম লোটন মসজিদ। নটু বা নটীন নামে কোন এক নর্ত্তকীর নামানুসারে মসজিদের নামকরণ হয়। জানা যায়, এই নর্ত্তকীর নাম মীরাবাঈ। কোন এক বাদশা এই নর্ত্তকীকে এখানে আনয়ন করেন এবং তাকে থাকবার জন্য স্থায়ীভাবে জায়গীর প্রদান করেন। এই মসজিদের ইটগুলি সবুজ, নীল, পীত ও সাদা রঙের। তিন-দিকের বারান্দায় তিনটি ছোট ছোট গম্বুজ আছে। মেজর ফ্রাঙ্কলীন বলেছেন—"I have not myself met with anything superior to it for elegance of style, lightness on construction, a tasteful decoration in any part of upper Hindusthan".

কোতয়ালী দরজা গৌড় নগরের দক্ষিণ দ্বার—এই দরজাকে অনেকে সেলামী দরজা বলে। এর দু'ধারে গড়বন্দি এবং দরজা পাথর দিয়ে এমনভাবে তৈরী ছিল যে শত্রুপক্ষ কোনক্রমেই নগরে প্রবেশ করবার সুযোগ পেত না। ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদ কর্ত্তৃক এটি নির্মিত হয়েছিল। পাশেই সাগরদীঘি। শোনা যায়, এই দীঘি রাজা লক্ষ্মণসেন খনন করিয়েছিলেন। এরই উত্তর প্রান্তে গৌড়ের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী চাঁদ সদাগরের বাড়ী ছিল। ছোট সোনা মসজিদ ইংলিশবাজারের অদূরেই অবস্থিত।

হোসেনশাহ যখন গৌড়ের বাদশা ছিলেন সেই সময় ওয়ালি মহম্মদ কর্তৃক পাথরের এই বিরাট মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের পাথরের উপরের কারুকার্য্য এত সুন্দর যে আজও শিল্প নৈপুণ্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে দর্শকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বোধ-হয় সোনার পাতে গম্বুজগুলি মোড়া ছিল, তাই এর নাম হয় ছোট সোনা মসজিদ। তিন দালানে বিভক্ত এবং সামনের দিকে পাঁচ খিলানযুক্ত দরজা। এর ইটপাথরগুলি কোন হিন্দু দেবালয় থেকে যে সংগৃহীত হয়েছিল তার বহু নিদর্শন বিদ্যমান।

মখদুম শাহ ও নূর কুতুব আলমের জন্য পাণ্ডুয়া এখনও পর্য্যন্ত মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত। পাণ্ডুয়ায় প্রবেশ-কালে প্রথমেই যে দরজা দেখা যায় তার নাম সেলামী দরজা। এই দরজার উপরে আরবী ভাষায় লেখা আছে "ইয়া আল্লহো ও শাহ-জালান"। মনে হয়, শাহজালান কর্তৃক নির্মিত হয়। সেলামী দরজার পরেই বড় দরগা ১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে আলি মোবারক কর্তৃক নির্মিত হয় এবং পীর নূর কুতুব নির্মাণ করেন ছোট দরগা। মীরকাশিম এই দরগার জন্য একটি তামার তৈরী জয়ডঙ্কা উপহার দিয়েছিলেন। এই ছোট দরগার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিরাট এক স্তম্ভের মকরাকৃতি জল নিকাশের পাথর মার্গ পাওয়া যায়। এই পাথর শিল্প যে হিন্দু বা বৌদ্ধ নিদর্শন তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। এই দরগার কিছু উত্তরে ৮০ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি সমচতুষ্কোণ মসজিদ দেখা যায়।

পশ্চিম দিনাজপুর যাওয়ার পথে যে প্রকাণ্ড মসজিদ দেখা যায় তা আদিনা মসজিদ বলে খ্যাত। এতবড় মসজিদ বাংলাদেশে আর কোথাও নেই। এই মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৫০৮ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ৩০০ ফুট। এর পিছন দিকে দু'টি খিড়কী দরজা এবং সামনে একটিমাত্র প্রবেশদ্বার ছিল। কালের প্রবাহে মসজিদটি আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত (আলোকচিত্র —৪)। মসজিদটি এতই প্রকাণ্ড যে দশ বারো হাজার লোক একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারত। একুশটি স্তম্ভের উপর মসজিদটি নির্মিত।

স্ত্রী-লোকদের বসবার জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল। এর প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে একটি পাথরখণ্ডে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি খোদিত ছিল এবং এইভাবে প্রমাণিত হয় যে হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগ্রহ করা মালমশলা দিয়ে এই মসজিদটি তৈরী। মসজিদের নীচে হিন্দু দেবদেবী ও জৈন তীর্থঙ্কর প্রভৃতির বহু মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। অনুমিত হয় যে সেকেন্দার শাহ এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। এতে ৩৭৮টি গম্বুজ ছিল। এর উত্তর পশ্চিমদিকের যে অংশে বাদশাহ বসতেন তাকে বাদশা-কি-তক্ত বলা হয়।

পুরাতন মালদহের প্রাচীনকীর্ত্তি জামি মসজিদ। জুম্মা মসজিদ নামেও সমধিক প্রসিদ্ধ। সম্রাট আকবরের সময়ে ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল। ৭২ ফুট লম্বা ২৭ ফুট চাওড়া দু'টি গম্বুজ, দু'টি-কুঠরি ও একটি দরজাবিশিষ্ট ইট পাথরে তৈরী মসজিদটি অপূর্ব্ব। এ ছাড়াও মালদহে ছোটবড় অসংখ্য মসজিদ, অসংখ্য গড় আছে যার অস্তিত্ব আজও কিছু কিছু পাওয়া যায়। এ হেন মসজিদে ভরা মালদহে যেটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তা হোল মদনমোহন মন্দির। হোসেনশাহের প্রধান অমাত্য শ্রীরূপ ও সনাতন সেবিত মদনমোহন বিগ্রহ। বর্ত্তমানে বিগ্রহটি নবনির্মিত মন্দিরে স্থান পেয়েছে এবং আজও শ্রীচৈতন্য পদধূলি স্পর্শ-ধন্য এই স্থান হিন্দুদের পরম পবিত্র বলে খ্যাত।

পশ্চিম দিনাজপুর

গঙ্গারামপুর থানার চারপাশে দেড় মাইল ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার ইতিহাস উত্থান-পতনের। এই গঙ্গারামপুরের ঠিক পশ্চিমেই পুনর্ভবা নদীর তীর থেকে ঐতিহাসিকরা উদ্ধার করেছেন মুঘল আমলের ইতিহাস যখন তার নাম ছিল দমদমা। কিন্তু তারও আগে এর নাম ছিল দেবীকোট। সুলতানশাহী পত্তনের যুগে বরেন্দ্রভূমের দমদমা ছিল সীমান্তের একটি সামরিক ঘাঁটি। সেনা-দলের জন্য ছাউনির অদূরে এর সামরিক অধ্যক্ষ (উজীর) সুবিশাল ঢালদীঘি খনন করে তার তীরে নিজ আবাস নির্মাণ করেছিলেন। হিন্দুযুগের নিদর্শনমণ্ডিত পাথরে গাঁথা এর সিঁড়ি। পূর্ব্ব-পশ্চিমে অবস্থিত এবং বাণরাজার মহিষী কালারানীর খনিত কালদীঘি। কিন্তু ঐতিহাসিকদের মতে এ'টি খনন হয়েছিল বাণরাজার অনেককাল পরে মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষের নির্দ্দেশে।

কোচজাতির বিভিন্নধারাগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয়, সপ্তমশতকে কোচবিহারের সঙ্গে ভূটানের সংঘর্ষের সময়ে এবং ষোড়শ শতকে মুঘল আক্রমণের সময় কোচজাতির এক অংশ পশ্চিম দিনাজপুরে এসে পড়েছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ের রাজধানী ছিল কোটিবর্ষনগর। কোটিবর্ষের দু'টি মণ্ডল বা মহকুমার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমটি গোললিকামণ্ডল এবং অপরটি হলাবর্ত্তমণ্ডল। মধ্যযুগের দেবীকোট, কোটিবর্ষের সমৃদ্ধনগরী পাল সম্রাটগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই কোটিবর্ষই আজকের দিনাজপুর।

প্রাচীনকালে উত্তরবঙ্গের কোন বিশেষ অঞ্চল কোটিবর্ষ নামে অভিহিত ছিল তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। অতি সুপ্রাচীনকাল থেকে সম্ভবতঃ আর্য্য আগমণেরও পূর্ব্বে, বিভিন্ন রাজশক্তির উত্থান

ও পতনের মধ্য দিয়ে এই সব অঞ্চলের ভৌগলিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। তবে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের ধর্ম্মমত প্রচারের মাধ্যমে, কালিকাপুরাণ ও অসমীয়া যোগিনীতন্ত্রে উল্লেখ আছে যে কোটিবর্ষ-বিষয় সমৃদ্ধ, শস্যপ্রসবিনী ও জলধারা বিধৌত জনপদ। জৈন প্রজ্ঞাপনা গ্রন্থে কোটিবর্ষবিষয়ের উল্লেখ আছে। মহাবীর কোটিবর্ষে পদার্পন করেছিলেন এবং এক সময় এই অঞ্চল জৈনধর্মের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল। মুঘল আমলে এই দিনাজপুরের উপর বাদশাহের দৃষ্টি পড়েছিল। ষোড়শ শতকে যখন মীরজুমলা সসৈন্যে ঢাকার দিকে অগ্রসর হন তখন এই অঞ্চলের উপর দিয়ে তাঁকে যেতে হয় আর তার একটি সামগ্রিক বিবরণ পাওয়া যায় আইন-ই-আকবরীতে। আরও বলা হয়েছে, অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত গৌড়জনপদে সমৃদ্ধ-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দিনাজপুরের রাজবংশ কবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বলা শক্ত কেননা তার পিছনে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। জানা যায়, শুকদেব নামে একজন সামন্ত নৃপতি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুঘল সম্রাট আকবরের সময়ে সুবা বাংলা চব্বিশটি পরগণা বা সরকারে বিভক্ত ছিল এবং কাশী নামক ব্যক্তির উপর সেই সময় ঐ জমিদারী ন্যস্ত ছিল। কালক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে শুকদেব সেই সম্পত্তির অধিকারী হন এবং মুঘল দরবার থেকে রাজা উপাধি গ্রহণ করেন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কলেক্টর নিযুক্ত করলে কার্য্যতঃ দিনাজপুরের স্বাধীন নৃপতির শাসনকার্য্যের অবসান ঘটে।

পশ্চিম দিনাজপুর নানা জাতি ও উপজাতি দ্বারা অধ্যুষিত। কোচ, রাজবংশী, পলিয়া, সাধু-পলিয়া, খেন, সাঁওতাল প্রভৃতি উপজাতি। দিনাজপুরের সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই রাজবংশী এবং তারপর পলিয়া। রাজবংশী-সম্প্রদায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী। মধ্যযুগ থেকে রাজপৃষ্ঠপোষকতার ফলে এই সংস্কৃতি-অনুরাগ যে বৃদ্ধি পেয়েছিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, যার

ফলে সেই চর্চ্চা আজ পর্য্যন্ত খণ্ডিত বরেন্দ্রভূমির যে অংশ আজ পশ্চিমবঙ্গে আছে সে ভূখণ্ডের নাম পশ্চিমদিনাজপুর। এই জেলা প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত বরেন্দ্রীর আজ শীর্ষতম প্রতিভূ। এই বরেন্দ্রভূমেই বরেন্দ্র শিল্পীগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপানির আবির্ভাব ঘটে। বরেন্দ্রভূমি বলতে ছিল দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনা। কিন্তু দেশ বিভাগের সময়ে যে কয়েকটি জেলার উপর বিভাগীয় অস্ত্র নেমে আসে তারমধ্যে দিনাজপুর একটি। জেলার পশ্চিম অংশের এক তৃতীয়াংশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ যে মন্তব্য করেছিলেন তা এইরকম—"The line shall run along the boundary between the following thanas :--Haripur and Raiganj ; Haripur and Kaliaganj, Biral and Kaliaganj, Biral and Kusmandi, Biral and Gangarampur, Dinajpur and Gangarampur, Dinajpur and Kumarganj. Chirirbandar and Kumarganj, Phulbari and Kumarganj, Phulbari and Balurghat. It shall terminate at the point where the boundary between Phulbari and Balurghat meets the north-south line of the Bengal-Assam Rly. in the eastern corner of the thana of Balurghat. The line shall turn down the western edge of the railway lands belonging to the railway and follow that edge until it meets the boundary between the thana of Balurghat aud Panchbibi".

র‍্যাডক্লিফের এই মন্তব্য থেকে মোটামুটিভাবে বর্ত্তমান পশ্চিমদিনাজপুরের একটা ভৌগলিক অবস্থান জানা যায়। বিভক্ত অংশের জেলার পরিমাণ যা দাঁড়াল অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হোল তার পরিমাণ দু'হাজার বাহান্ন বর্গমাইল। সুতরাং বিভাগের পর দেখা

গেল, যে মূলনীতি নিয়ে দেশ বিভাগ সেই জনসংখ্যার দিক থেকে এমন সমস্ত থানা যা পাকিস্থানের অংশে পড়ল যা কিনা হিন্দুপ্রধান। শুধু-মাত্র রেখার সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে এই অসঙ্গত বিভাগ মেনে নিতে হয়েছিল বলে মনে হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের রায় অনুযায়ী বিহারের পূর্ণিয়া জেলা থেকে কিষণগঞ্জ, চোঁপড়া ও ইসলামপুর নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুরের সঙ্গে যুক্ত হোল। বস্তুতঃ পশ্চিমবাংলার বিচ্ছিন্ন অংশ উত্তরবঙ্গও মূলভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হোল। পশ্চিম দিনাজপুরের ইতিহাস কবে থেকে শুরু তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে মহাভারতের যুগে দেখা যায় পাণ্ডবগণ তাঁদের মহাপ্রস্থানের পথে পশ্চিম দিনাজপুরের পথ অতিক্রম করেছিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্র এইস্থানের কোন এক দীঘিতে রেখেছিলেন। বর্ত্তমান এইস্থান পাঁচ-ভাইয়া বলে খ্যাত। অসুরাগড় বলে আরও একটি গ্রামের নাম পাওয়া যায় এবং এইখানে পাণ্ডবগণ তাঁদের স্বর্গযাত্রাপথে এক অসুরকে বধ করেছিলেন। ভীমভার গ্রামে ভীমসেন নিজের পদযুগল প্রক্ষালন করেন। করণদীঘি নামক স্থানে দাতা কর্ণ একসময়ে বসবাস করতেন। কালের বিবর্ত্তনে এই সব কাহিনী ও সত্যতার মতান্তর বা রূপান্তর ঘটেছে তবু আজও যা লোকের মুখেমুখে বেঁচে আছে তা ইতিহাস।

একদা রাজা শশাঙ্ক হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে যুদ্ধে মহানন্দা, টাঙ্গান, পুর্নভবা প্রভৃতি নদীর তীর দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। শশাঙ্কের সময়ই এই জেলায় বৌদ্ধধর্মের জোয়ার আসে। তারপর পালযুগ আসে বাংলায়। গৌড়ভূক্তির অন্তর্গত হিসাবে তখন পশ্চিম দিনাজপুরের পৃথক কোন সত্তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, দীপাধার প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও পর্য্যন্ত চাষের জমি, পুকুর অথবা মাটি খননকালে অকস্মাৎ বেরিয়ে আসে প্রাচীন নিদর্শন—কোন ভগ্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি কিংবা মাটির দীপাধার কিংবা পালযুগীয় মুদ্রা "শ্রীশ্রীধর্মপালস্য" নামাঙ্কিত। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতে পশ্চিম দিনাজপুরের সবিশেষ উল্লেখ না থাকলেও তিনি এই জেলা

ভ্রমণ করে অন্ততঃ কুড়িটি বৌদ্ধবিহার দর্শন করেছিলেন বলে জানা যায়।

পশ্চিম দিনাজপুরের উল্লেখযোগ্য স্থান হোল বংশীহারী। বংশী-হারীর নিকটে নদীর পশ্চিম তীরে বহু পুরাতন কীর্ত্তি ও ধ্বংস-স্তূপের সন্ধান পাওয়া যায়। মালদহ-বালুরঘাট সড়কের পাশে মুসলমান আমলেরও পুরাকীর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত গঙ্গারামপুরের মুসলীম যুগে নাম ছিল দমদমা। মহাভারতের কাহিনী এই স্থানটির সঙ্গে জড়িত। কথিত আছে, মহারাজা বাণ এখানে তাঁর ইষ্টদেবতা শিবের মন্দির নির্মাণ করেন এবং প্রতিদিন পুনর্ভবা থেকে স্নান সেরে শিবমন্দিরে গিয়ে পূজা করেন। বাণরাজা ও তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিকের দল কয়েকটি স্তূপের খননকার্য্যের শেষে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যে বিবরণ পেশ করেন তাতে জানা যায় যে তৎকালীন পশ্চিম দিনাজ-পুরের সমৃদ্ধি ও পরাক্রম উচ্চশিখরে উঠেছিল। কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কতকগুলি বিশালাকার দীঘি খনন করা হয়েছিল। পুরাতত্ত্ববিদরা বর্ত্তমান গঙ্গারামপুর এবং নিকটবর্ত্তী এলাকা থেকে বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এই স্থান বাণরাজের শিবমন্দির, পালরাজাদের কীর্ত্তিসমূহের নিদর্শন, সেনবংশ ও মুসলমান স্থাপত্য-শিল্প সমৃদ্ধ ছিল। রোমান কলোসিয়াসের মত সুবিশাল কারুকার্য্যখচিত পাথরের স্তম্ভওয়ালা রাজপ্রাসাদ, বিস্তীর্ণ জলাশয় ও পুনর্ভবার তীরে ইটের তৈরী বহু কোটাবাড়ীর রাজধানী, নগর ও পাথর মন্দিরের শ্রেণী এই রাজার শৌর্য্য ও পরাক্রমের স্বাক্ষর। (আলোকচিত্র—৫)

ইটাহার পশ্চিম দিনাজপুরের একটি উল্লেখযোগ্য এবং সমৃদ্ধতর জনপদ। ইটাহারের আশেপাশে অনেকগুলি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। ইটাহারের পাশেই সুঁই নদী এবং এই নদীর তীরবর্ত্তী স্থানগুলির প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের

নিদর্শন। এই সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে অমৃতখণ্ড, রুদ্রখণ্ড, ব্রহ্মাখণ্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, করদাহে শ্রীকৃষ্ণ ও বাণ-রাজার মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের এত সৈন্য নিহত হয়েছিল যে সমস্ত শবের দাহ করা সম্ভব হয় নি। তাই শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক নিহিত সৈন্যের একটিমাত্র আঙুল সংগ্রহ করে একত্রে দাহ করার ফলে এই স্থানটির নাম হয় করদাহ এবং প্রাচীনকাল থেকেই ঐ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আসছে।

উষাহরণ সড়ক সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত তা হোল সম্পূর্ণ পৌরাণিক। বাণকন্যা উষা যখন উষাবনে অবস্থান করছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ উষাকে হরণ করবার চেষ্টা করছিলেন বলে এইস্থান উষাহরণ নামে বিদিত। আবার পালযুগের নিদর্শন হিসাবে রয়েছে মহীপাল দীঘি। এই দীঘির দৈর্ঘ্য আটত্রিশ শ' ফুট এবং প্রস্থ এগারো শ' ফুট। এই দীঘির পারে কতকগুলি হিন্দু-দেবমন্দির ও মুসলমানদের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। মহীপুরে মহীপাল এক প্রমোদভবন নির্মাণ করেন কিন্তু তা আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়াও একতালা, বাহিরহাতা প্রভৃতি স্থানও প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্য নানাভাবে উল্লেখযোগ্য।

দিনাজপুর জেলার সাবেক বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফুলবাড়ী থানা এলাকায় পশ্চিমোত্তরভাগে দামোদর গ্রাম। এখানে পাঁচটি তাম্রপটে লেখা লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে পঞ্চম শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে গুপ্তরাজগণের অধিকার সূচনা করেছে এবং রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা, ভূমিক্রয় ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে আলোকপাত হয়েছে। ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দের যে লিপিটি দামোদরপুরে পাওয়া যায় তা ঐতিহাসিক ডঃ বিনয় চন্দ্র সেনের মতে নিঃসন্দেহে দামোদর গুপ্তের রাজত্বকালের। অনুমান হয়, গুপ্তরাজ দামোদরগুপ্তের নামানুসারে এই গ্রামটির নাম দামোদরপুর হয়েছে। এই লিপির ভাষা সংস্কৃত। গুপ্তযুগে

রাষ্ট্রভাষারূপে সংস্কৃতের প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়েছে। প্রথম লিপিটি গুপ্তাব্দের অর্থাৎ ৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের। সে সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির সীমা বিস্তৃত হয়েছিল। প্রথমলিপির পাঁচবছর পরে দ্বিতীয় লিপিটি লেখা হয়েছিল ১২৯ গুপ্তাব্দে এবং তৃতীয়টি ১৬৩ গুপ্তাব্দে মহারাজাধিরাজ বুধগুপ্তের আমলে। চতুর্থ লিপিটি বুধগুপ্ত রাজত্বকালের পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির পর। পঞ্চম তাম্রপট্টলিপিটি ২২৪ গুপ্তাব্দের সম্ভবতঃ দামোদরগুপ্তের রাজত্বকালের।

পশ্চিম দিনাজপুরের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান বাণগড়। বাণরাজার কীর্ত্তিকলাপ একদা বিস্ময়ের বস্তু ছিল কিন্তু আজ তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত কয়েকটি নারী মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ক্ষুদ্রাকৃতি পোড়ামাটির ফলকে গুপ্তপূর্ব মথুরার শিল্পশৈলীর লক্ষণ পরিস্ফুট। তবে নারীমূর্ত্তিগুলিতে সমসাময়িক ও ভাবী-কালের ইঙ্গিতও সমান প্রত্যক্ষ। সে ইঙ্গিত তাদের গঠনে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মসৃণতায় এবং সৌকুমার্য্যে। এদের মধ্যে যেন গুপ্ত আমলের রুচি ও রূপাদর্শের আভাষ পাওয়া যায়। বাণগড় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পীরশাহ বোখারী নির্মিত একটি মসজিদ ছিল বলে জানা যায়।

বাণগড় প্রভৃতির ন্যায় অশেষ ঐতিহাসিক তথ্য-সম্বলিত প্রসিদ্ধ-স্থানগুলির তুলনায় এই ক্ষুদ্র দেবগ্রামের প্রাচীনকীর্ত্তি ও গৌরব অতি নগণ্য হলেও এর প্রাচীন কাহিনী ও বিবরণ একেবারে যে নেই তা নয়। রাজা গণেশের সময় এবং তারপরেও কিছুকাল যাবৎ এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি যে সবিশেষ উন্নত ও অশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল তা এক শিব-মন্দিরের শিলালিপি থেকে জানা যায়। এই গণেশনারায়ণের বাহুবলে হিন্দুগণ কর্তৃক সে সময়ে সমগ্র গৌড়রাজ্য ইলিয়াসশাহীবংশীয় সুলতানের কবল থেকে অধিকৃত হয়। এর কয়েকবছর পরেই উক্ত শিলালিপিটি উৎকীর্ণ হয়। এই গ্রামে অনেকগুলি শিবমন্দির আছে কিন্তু কেবল-মাত্র একখানি গৌরীপট্ট ছাড়া কোন শিবলিঙ্গ তথায় বর্তমানে বিদ্যমান নেই ; এবং এরমধ্যে চারটি শিবমন্দির ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় কোন-

রূপে বছরের পর বছর নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। তাদের গঠন প্রকৃতির দিক থেকে এমন কোন বৈচিত্র্য নেই যা উল্লেখ করার মত। এই মন্দিরগুলির পাশে অতীব রমণীয় ও কারুকার্য্যমণ্ডিত মন্দিরবাসিণীর মন্দির অর্দ্ধভগ্ন ও মৃত্তিকায় অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় আজও দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরটির বর্হিদেশ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে চারটি কারুকার্য্যময় স্তম্ভের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এই গ্রামের কুমারপাড়ার পূর্ব ও দক্ষিণপাশে ছ'টিস্থানে কালো পাথরের নির্মিত বাসুদেব মূর্ত্তির ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে বটে কিন্তু এই অঞ্চলের কোথাও বিষ্ণুমন্দিরের কোন নিদর্শন আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। কালী ও শিবমন্দিরের প্রাচুর্য্য দেখে মনে হয় এই গ্রামে প্রাচীনকালে শাক্ত ও শৈবগণের আধিপত্য ছিল।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা থেকে যেসব মূর্ত্তি পাওয়া গেছে তারমধ্যে বিষ্ণু ও সূর্য্যমূর্ত্তিই বেশী। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ছাড়াও চর্তুবিংশতি ব্যূহ-মূর্ত্তি, বিভব বা অবতার মূর্ত্তিরও কিছু কিছু দর্শন মেলে। অনেকের মতে গুপ্তযুগে চর্তুব্যূহ-মূর্ত্তি চর্তুবিংশতি বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরিণত হয়েছে। কেশবনারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষিকেশ, পদ্মনাভ দামোদর, বাসুদেব, সকর্ষণ প্রত্যম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম অষ্ঠোধ্বজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, উপেন্দ্র, জনার্দ্দন হরি ও কৃষ্ণ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকার বিন্যাস দ্বারা পৃথক পৃথক মূর্ত্তির সৃষ্টি হয়েছে। দিনাজপুরের সুরোহর গ্রাম থেকে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং দ্বাদশ শতাব্দীর একটি বিশিষ্ট-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। আগ্রাহুগুণ থেকে আশুতোষ মিউজিয়ামে একটি গরুড়বাহন আসীন বিষ্ণুমূর্ত্তি আনা হয়েছে। গরুড়ের ছ'টি হাতে বিষ্ণুর পদদ্বয় স্থাপিত।

ইটাহার থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর ধ্যানমুদ্রা, তলদেশে গরুড় চিহ্নিত এক দুর্লভ বিষ্ণু মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য অতি প্রাচীন দ্বিভুজ মূর্ত্তি এই জেলার সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। এই গ্রামে মকর-বাহিনী গঙ্গামূর্ত্তি পাওয়া যায়।

এসনাইল গ্রামে পাওয়া পদ্মাসীন লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। নারায়ণের বাম উরুতে লক্ষ্মী-আসীনা, উমা-মহেশ্বর মূর্ত্তি তুলনীয়। হরিরামপুরে একটি ষোড়শভুজবিশিষ্ট নটরাজমূর্ত্তি পাওয়া যায়। এছাড়া নবম শতাব্দীর বেলে পাথরের একটি লিঙ্গ উদ্ধার করা হয়েছে।

পূর্ববাসইল গ্রামে ছাঁটাকা দেবীর একটি পুরাতন মন্দির আছে। মন্দিরটি ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ২১ ফুট এবং ২৩ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এই মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। প্রবেশপথ একটি এবং পাথরের তৈরী দরজার খিলানে অতীত ভাস্কর্য্যের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। বারান্দায় পাথরের তৈরী দেবমূর্ত্তি—একটি চতুর্ভুজ ও অপরটি দ্বিভুজ বিষ্ণুর ডানদিকে লক্ষ্মী ও বামে সরস্বতী, পাশে গৌরীপট্টহীন শিবলিঙ্গ।

বালুরঘাট থানার পতিরাম গ্রামে বিদ্যেশ্বরী কালীমন্দির বহুকালের প্রাচীন। বর্ত্তমানে সংস্কার করা হয়েছে। জনশ্রুতি, ভবানী পাঠক ('দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস) এই মন্দিরে নিত্যপূজা দিতে আসতেন। মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নেই তবে সাধারণের বিশ্বাস দেবী ভূগর্ভে নিহিত আছেন। রাজপরিবার কর্তৃক মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বুড়াকালীর মন্দিরটি বালুরঘাটের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির। রাণী ভবানী কর্ত্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আজ পর্য্যন্ত বুড়াকালীর নিয়মিত পূজা হয়ে আসছে। এই পূজা-উৎসবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সাঁওতাল প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের লোক যোগদান করে। বালুরঘাট কলেজ মিউজিয়ামে দু'টি শিশু কোলে শায়িতা মাতৃমূর্ত্তি, পদতলে চারিকা পদসংবাহন করছে। পার্শ্বমূর্ত্তি শিব, কর্তিকেয়, গণেশ ও নবগ্রহ। মহেন্দ্রগ্রাম থেকে একাদশ শতাব্দীর একটি ষড়ভুজ সূর্য্যমূর্তি পাওয়া যায়। তার সামনের দু'হাতে পদ্ম, পিছনের হাতে পদ্মবীজমালা কমণ্ডলু ইত্যাদি। একটি দ্বাদশ আদিত্যের প্রথম ধাতৃসূর্য্য, ব্রহ্মার মিশ্রমূর্ত্তি, একটি আসীন সূর্য্যমূর্ত্তি বৈবহাটা থেকে একাদশ শতাব্দীতে পাওয়া যায়। পাশে দণ্ডী, পিঙ্গল, শ্রীমূর্ত্তি ও অষ্টগ্রহ এবং পাদপীঠে "সমস্ত রোগানাংহর্ত্তা" এই লিপি আছে।

খোদাই পোড়ামাটির ফলকে বাহক মূর্ত্তি নন্দী (ষাঁড়), বৃক্ষলতা, পুষ্প, জীবজন্তু, নরনারী, ছেলেমেয়েদের খেলনাদি বিচিত্র শিল্পসৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছে এই পশ্চিম দিনাজপুরে। এ ছাড়া হিন্দু ও মুঘল আমলে পশ্চিম দিনাজপুরের পুরাকীর্তিসমূহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য পুনর্ভবাতীরে নারায়ণপুর গ্রামে দুঃসাহসী সেনানায়ক বক্তিয়ার খিলজীর কবর, রায়গঞ্জ থানার কমলাবাড়ী গ্রামে রাজা গণেশের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ও নবাব হোসেনশাহ কর্তৃক খনিত ফকিরদীঘি। মালিগাঁওয়ে পালরাজাদের অন্যতম কীর্ত্তি মহীপাল দীঘি দর্শকদের আকর্ষণীয় বস্তু। পাথরঘাটা দীঘির সন্নিকটে প্রাচীন এক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে কতকগুলি চতুর্ভুর্জ দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্ত্তিটির নাকভাঙা পাল আমলের কীর্ত্তির পরিচয়।

গোবিন্দপুর গ্রামে খুব উঁচু কয়েকটি টিলারের উপর হোসেনশাহের সমাধি ও কসবা মহশো গ্রামে প্রাচীন মসজিদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরাতন ছোট ইটের খিলান; চারটি প্রবেশদ্বারের মধ্যে দু'টি অক্ষত রয়েছে। মসজিদটি পূর্বদ্বারী এবং সামনের দেওয়ালে প্রায় সর্বত্রই পদ্ম খোদিত আছে এবং ভিতরের দেওয়ালেও অনুরূপ ছোটবড় পদ্ম দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া মসজিদের গায়ে নানারূপ লতাপাতার কারুকার্য্য রয়েছে। মসজিদের ভিতর চারটি স্তম্ভ এবং চারকোণে চারটি ছোট গম্বুজ ও মধ্যভাগে আরও ছয়টি বড় গম্বুজ আছে।

কথিত আছে, বাণশূরের মৃত্যুর পর কোটিবর্ষবিষয়ে শৈবমত প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সেখানে বিষ্ণুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণব-ধর্ম এবং বিষ্ণুমত এত প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে এখনও পর্য্যন্ত প্রাচীন কীর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষ খননকালে বহু মুর্ত্তি পাওয়া যায়। পাল আমলের কীর্ত্তি গড়, দুর্গ, প্রাকার ও স্তূপ খননকালে বিষ্ণুমূর্ত্তি ও বৈষ্ণবধর্মের বহু প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে তবে এইসব মূর্ত্তির খুব সামান্যই সংরক্ষণ সম্ভব হয়েছে।

জলপাইগুড়ি

যখন সুদূর অতীতে রাঢ় বঙ্গের গাংগেয় উপত্যকা থেকে আর্য্যগোষ্ঠী নূতন নূতন উপনিবেশ স্থাপনের জন্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, ঠিক সেই সময় থেকেই জলপাইগুড়ির ইতিহাস আরম্ভ। বরেন্দ্রভূমিতে এসে আর্য্যগণ করতোয়া নদীর অববাহিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। নবম শতকে হিন্দু সভ্যতার পীঠভূমি হিসাবে করতোয়ার উল্লেখ আছে। বৈদেশিক আক্রমণ ও বৌদ্ধধর্মের জোয়ারে যখন রাঢ় অঞ্চল বিঘ্নিত তখন করতোয়া নদীর উভয় তীরে হিন্দু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। যবন, চোল প্রভৃতি জাতির বারংবার আক্রমণে সেই সভ্যতাও সেখানে বেশীদিন টিকে থাকতে পারে নি। আর্য্যগণ যখন এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে তখনও এই সমস্ত অঞ্চলে অষ্ট্রীক, দ্রাবিড় প্রভৃতির বসবাস ছিল। যদিও সংখ্যায় তারা হীন হয়ে পড়েছিল, আর তারই সাক্ষ্য হিসাবে বেঁচে রইল মেচ, গারো, টোডো, বোড়ো প্রভৃতি জাতি এবং দুই জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত কৃষ্টি এবং লোকসংস্কৃতি।

আধুনিক জলপাইগুড়ির ইতিহাস-গত নাম বৈকুণ্ঠপুর। ষোড়শ শতাব্দীতে কোচবিহার রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ বৈকুণ্ঠপুরের পশ্চিম সীমানা আরও বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কখন যে বৈকুণ্ঠপুরের পশ্চিম সীমানা সংকুচিত হয়ে মহানন্দা নদীর পূর্বতীরে এসে পৌঁছেছিল তা বলা যায় না। কোচরাজবংশের একটি শাখা, রায়কত উপাধি নিয়ে বংশানুক্রমে কোচবিহারের প্রত্যন্ত প্রদেশ শাসন করত এবং কোচ রাজার অভিষেকের সময় ছত্রধারণ করত। বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য বৃটিশ অধিকারকাল পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল যদিও কিছুকালের জন্য বৈকুণ্ঠপুর মোগলদের কাছে নামেমাত্র বশ্যতা স্বীকার করেছিল।

উত্তরে হিমালয়, পূর্বে তিস্তা ও পশ্চিমে মহানন্দা নদীর বেষ্টনীর নিবিড় অরণ্যের মধ্যে বৈকুণ্ঠপুরের রাজধানী ছিল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর

পর দিল্লীর শাসক এমনকি সুবা বাংলার শাসক মুর্শিদকুলি খাঁয়ের উত্তরবঙ্গ জয় করার কোন আগ্রহ ছিল না। তার ফলে এ অঞ্চল বেশ নিরাপদে থেকে গিয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকে রায়কত ধর্মদেব প্রথমে জলপাইগুড়ি অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন করেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী আলিপুরদুয়ার, বক্সা এবং ময়নাগুড়ি মহকুমার সঙ্গে যোগ হোল রংপুর জেলার অধীন জলপাইগুড়ি মহকুমা এবং এইভাবে তিস্তার পূর্ব ও পশ্চিম পার নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত। পুরাতন বৈকুণ্ঠপুর, তেঁতুলিয়া, বোদা সংযুক্ত করে জলপাইগুড়ি জেলা গঠন করা হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাটগ্রাম বোদা পচাগড়, তেঁতুলিয়া ও দেবীগঞ্জ রংপুরে পূর্বদিনাজপুরে চলে যায়। অর্থাৎ প্রায় ৬৭২ বর্গমাইল জমি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে জলপাইগুড়ি জেলার উপর ইতিহাসের প্রবল একটা ঝড় আছড়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতকে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর জায়গীর মোগলদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তদানীন্তন বৈকুণ্ঠপুরের জায়গীরদার ভুজঙ্গদেবের মৃত্যুর পর ঢাকার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ অতির্কতভাবে বৈকুণ্ঠপুর আক্রমণ করেন। ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে বৈকুণ্ঠপুরের তুমুল যুদ্ধে ভুটানরাজ ও কোচরাজ যোগদান করেন। মোগলসৈন্যের কাছে বৈকুণ্ঠপুরের সৈন্যরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং মোগলরা পরাজিত সৈন্যদের মুণ্ডছেদন করেন। ফলে এইস্থান মোগলকাটা নামে আজও খ্যাত।

জলপাইগুড়ি রাজবংশের ইতিহাস কুচবিহারের পরে অর্থাৎ আরম্ভ-কাল মধ্যযুগ থেকে। কোচবিহারের রাজবংশ যখন তাদের রাজত্বের সূত্রপাত করেন, তখন বিশ্বসিংহ তাঁর ভাই শিষ্যসিংহকে বৈকুণ্ঠপুরের দুর্গ রক্ষা করার ভার দেন। সেইখান থেকেই জলপাইগুড়ির ইতিহাস আরম্ভ। তারপর অষ্টাদশ শতক থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ির শাসনব্যবস্থায় উত্থান পতন ঘটেছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীরা যখন বৈকুণ্ঠপুরের উপর লোলুপ দৃষ্টি হেনেছিল

তখন সেই অঞ্চলের মুলতঃ শক্তি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, যাঁরা সেই সময় ডাকাত বলে অভিহিত হোতেন। জঙ্গলে এঁদের ঘাঁটী ছিল। অতর্কিত আক্রমণ করাই ছিল এঁদের যুদ্ধধর্ম। এই যুদ্ধ কৌশলী জেনে নিতে ইংরাজদের বড় একটা বেশী সময় লাগে নি।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জন ষ্টুর্য়াটের নেতৃত্বে বরকন্দাজ পাঠিয়ে দিল এই সমস্ত সন্ন্যাসীদের দমন করবার জন্য। সন্ন্যাসীরা অনেকেই পালিয়ে গেল নেপাল ও ভুটানের দিকে আবার কিছু ধরাও পড়ল ইংরাজদের হাতে। সন্ন্যাসী দখলের পর ইংরাজ রাজশক্তি বৈকুণ্ঠপুর সম্পর্কে বেশীদিন উদাসীন থাকতে পারে নি। এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য তাদের মনোযোগ দিতে হয়েছিল এবং পরবর্ত্তী বিশ বছরের মধ্যে এই অঞ্চলের যে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল তা মূলতঃ কৃষ্টি উন্নয়ন। ধৃত সন্ন্যাসীদের কি করা হয়েছিল তার কোন উল্লেখ না থাকলেও, অনেকে অনুমান করেন যে তাদের আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে এনে কেটে ফেলা হয়েছিল এবং সেইস্থান আজও সন্ন্যাসীকাটা বলে উল্লেখযোগ্য। বৈকুণ্ঠপুরের প্রথম রায়কত শিবুদেব এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই দুর্গ খননের সময়ে মাটির নীচে একজন ধ্যানস্থ সন্ন্যাসীকে দেখতে পাওয়া যায়।

আধুনিক জলপাইগুড়ির ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও জলপাইগুড়ির লোকসংখ্যা খুব কম ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত জলপাই-গুড়ির শাসনব্যবস্থায় বারবার রদবদল হয় এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করার পর রাজস্ব আদায়ের জন্য দেবীসিংহকে নিযুক্ত করে। তাঁর অত্যাচারে ও উৎপীড়নে বাংলার জমিদার ও প্রজাগোষ্ঠী যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন এই অঞ্চলে কয়েকবার ছোট ছোট প্রজা-বিদ্রোহের খবর পাওয়া যায় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তা প্রবল আকার ধারণ করে।

জলপাইগুড়ির প্রধান নদীগুলির মধ্যে তিস্তা, তোরষা এবং

মালঙ্গীর নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আছে রায়ডাক ও সংকোশ। বেশীর ভাগ নদীই পার্ব্বত্য।

জলপাইগুড়ি জেলার গ্রাম্য গান ও লোকসংগীতের মধ্যে তিস্তাবুড়ীর উল্লেখ আছে। বছরে একবার করে তিস্তাবুড়ীর পূজা হয় সমারোহের সঙ্গে। এই পূজা না দিলে বা কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটলে তিস্তাবুড়ী প্রতিশোধ নিয়ে থাকে এরূপ ধারণা প্রচলিত আছে। উল্লেখযোগ্য মেলা হোল শিবরাত্রির সময়ে অনুষ্ঠিত জল্পেশ্বরের মেলা।

জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে প্রাচীন কীর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষ যথেষ্ট আছে। এক সমীক্ষার ফলে জানা গেছে যে এগুলি সাধারণতঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যে নির্মিত। এই সমস্ত কীর্ত্তি ও ধ্বংসাবশেষের মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার পুরাতন ইতিহাসের পরিচয় মেলে কিন্তু সঠিক ইতিহাসের উদ্ধার সাধন সম্ভব কিনা অর্থাৎ তা কতখানি নির্ভরযোগ্য তা গবেষণার বিষয়বস্তু।

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি শহরের দক্ষিণ-পূর্বে জল্পেশ্বরের মন্দির। পরিখা দ্বারা বেষ্টিত মূল মন্দিরের উপর বৃহদাকৃতি গম্বুজ ছাড়াও আরও চারটি গম্বুজ চতুষ্কোণে অবস্থিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে ঢাকা শিবলিঙ্গ তবে সাধারণ শিবলিঙ্গের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর আকৃতি অনেকটা হাতের মুঠোর উপরিভাগের মত মাথাটা সমানভাবে ঢেউ তোলা—কোন স্থাপত্যের অংশবিশেষ বলে মনে হতে পারে। মন্দিরটি ১২৭ ফুট উঁচু। মন্দিরটি গম্বুজাকৃতি তার ফলে মসজিদ বলে মনে হয়। স্থাপত্য নিদর্শনে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র। দিল্লীর মুসলমান স্থপতিদের আনিয়ে কোচবিহারের মহারাজা এই মন্দিরটির নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করান। মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণে বাসুদেব মন্দির। কষ্টিপাথরে এই বিষ্ণুমূর্ত্তিতে দ্বাদশ ও একাদশ শতকের পাল ভাস্কর্য্য-শৈলীর চরিত্রলক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। শিবমন্দিরে এই বিষ্ণুমূর্ত্তি স্বভাবতঃই নানারকম প্রশ্নের সৃষ্টি করে। শোনা যায়, মূর্ত্তিটি মন্দির সংলগ্ন দীঘি থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। মন্দিরকে ডানদিকে রেখে

একটু এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে চালা ঘরের মধ্যে রাখা দুটি বিশালকায় মূর্ত্তি। একটি বেলে পাথরের তৈরী অশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত দণ্ডায়মান গণেশ মূর্ত্তি, আর অন্যটি কালোপাথরের সম্পূর্ণ ভগ্নমূর্ত্তি। পদ্মাসনে আসীন মূর্ত্তিটির শুধু একটি পায়ের আভাষমাত্র পাওয়া যায়। তবে পায়ের উপর কাপড়ের ভাঁজ দেখলে পালশৈলীর কথা মনে পড়ে। কিংবদন্তী আছে যে যোগিনীশাস্ত্রে উল্লিখিত জল্পেশ রাজার নামানুসারে এই মন্দিরের নামকরণ করা হয় জল্পেশ্বরের মন্দির (আলোকচিত্র-৬)।

ময়নাগুড়ি থেকে প্রায় সাত মাইল পূর্বে জলঢাকা নদীর অদূরে পূর্বন্দহর মন্দির। বিশাল টিবির উপর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমস্ত এলাকাতেই ভাঙাচোরা ইটের ছড়াছড়ি দেখা যায়। কাটা পাথরে তৈরী মন্দির, উপরিভাগ কয়েকবছর আগে ইট দিয়ে গাঁথা হয়েছে। আশেপাশে পড়ে আছে অসংখ্য কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরখণ্ড। কিছু কিছু পাথরের অলংকরণ দেখলে রেখ দেউলের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে গর্ভগৃহের দেওয়ালে কোন অলংকরণ নেই। পশ্চিমে মন্দিরের প্রবেশদ্বার। দুই বিশালকায় দ্বারপালের একটি এখনও ভগ্নদশায় দণ্ডায়মান, অন্যটির পদযুগলের চিহ্ন নেই। গর্ভগৃহের বহি-দেশে তিনটি বিরাট কুলঙ্গি দেখে মনে হয় এক সময় এখানে মূর্ত্তি শোভা পেত। তাছাড়াও বহিগাত্রে এখনও কিছু কিছু ক্ষুদ্র লুপ্ত সৌন্দর্য্য মূর্ত্তি বিদ্যমান ; যেমন নৃত্যরত গণেশ, নানা ভঙ্গিমায় নারীমূর্ত্তি, ভূমিস্পর্শ-মুদ্রায় আসীন এক পুরুষ (বুদ্ধ বলে মনে হয়)। কালের নির্দয় আঘাতে অধিকাংশ মূর্ত্তিই হৃতসৌন্দর্য্য কিন্তু অবশিষ্টের শিল্পশোভা আমাদের অভিভূত করে। পদ্মদীঘিতে প্রাপ্ত বিষ্ণুপট্টটির উল্লেখ করে বলা যায় যে একাদশ ও দ্বাদশ শতকে এই মন্দির ব্যবহৃত হয়েছে। বিষ্ণুপট্টটির একদিকে অন্যান্য অলংকরণসহ ভূমিস্পর্শমুদ্রায় চতুর্হস্ত বিষ্ণু ও অপর-দিকে এই দেবতারই দশাবতারের প্রতিরূপ পদ্মাকৃতিতে অঙ্কিত। শিল্পসৌন্দর্য্যে বিষ্ণুপট্টটি অতিশয় দীন।

ময়নাগুড়ি হয়ে জল্পেশ যেতে পড়ে মাধবডাঙ্গার বটেশ্বর মন্দির।

মন্দির না বলে ধ্বংসস্তূপ বলাই ভাল। কারণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড ও ভগ্ন অলিন্দের দেওয়াল ভিন্ন মন্দিরের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

সোদরখই-এর মন্দিরমালা জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্নসমৃদ্ধির সাক্ষী। ময়নাগুড়ি থানার সোদরখই-এর মন্দির তার অন্তর্গত। ছোট মন্দির তাই লোকে বলে সোদর খই। গর্ভগৃহের তিনটি দেওয়াল এখনো অভগ্ন। আকারে এবং পরিকল্পনায় এই মন্দির পূর্বন্দহরের প্রতিরূপ। এইস্থানে অতি প্রাচীনকালের একটি শিবমন্দিরও দেখা যায়।

গড়মেন্দাবাড়ীর চিলাপাতার এক গভীর অরণ্যাদৃত অঞ্চলে অবস্থিত এক ধ্বংসাবশেষ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পশ্চিমবাংলার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে যে আংশিক খননকার্য্য চালিয়েছিলেন তাতে এক আশ্চর্য্য দুর্গের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। চারিদিকে পরিখাবেষ্টিত সুদৃঢ় ইটের প্রাচীর। চারিদিকে চারটি প্রবেশদ্বার। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের প্রাচীরে উন্মুক্ত দুটি খিলান। নানা আকারের পাথর ও ইটের ব্যবহার হয়েছে তাতে মনে হয় যে বিভিন্নযুগে এই পরিখা তৈরী হয়েছিল। মেন্দাবাড়ীর এই দুর্গ নলরাজার নামে পরিচিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ তাদের আংশিক খননকার্য্যের ভিত্তিতে একে গুপ্ত-পর্বের স্থাপত্য নিদর্শন বলে উল্লেখ করেন। পূর্ব প্রাকারের বাইরে একটি বেলে পাথরে তৈরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও বিদ্যমান। জলপাইগুড়ি জেলার প্রত্নকীর্ত্তির একটি সুষ্ঠ আলেখ্য ভিতরগড়ের নাম উল্লেখ অনি-বার্য্য হলেও এর বেশীরভাগ অংশ বর্ত্তমানে বাংলাদেশে। নক্সা অনেকটা নলরাজার গড়ের মত।

শিকারপুরের কাছে দেবীগড়েও একটি প্রাচীন মন্দির দেখা যায়। সাধারণ লোকের ধারণা মন্দিরটি দেবী চৌধুরাণীর। মন্দিরের মধ্যে যে মূর্ত্তিগুলি আছে তার গঠনভঙ্গিও বিচিত্র। একজন সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি, একটি দেবীমূর্ত্তি, একজন ইংরাজ সেপাই-এর মূর্ত্তি, একটি বাঘ ও একটি কুকুরের মূর্ত্তি। দেবী, সন্ন্যাসী ও ইংরাজ সেপাই সম্পর্কে মোটামুটি

ধারণা করা গেলেও বাঘ ও কুকুরের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরাজ সেপাই বন্দুকধারী।

মেন্দাবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ জলপাইগুড়ি জেলার প্রাচীন নিদর্শন। মেন্দাবাড়ী সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য এখনও পাওয়া সম্ভব হয় নি। তবে মনে হয়, কামরূপ রাজত্বের সময়ে নির্মিত। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মূর্ত্তিগুলির সঠিক কাল নির্ণয় করা অসম্ভব কিন্তু গঠনশৈলীর ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে গবেষণা করে মোটামুটি কোন যুগের তা বলা যেতে পারে। বেলাকোবা অঞ্চলে কষ্টিপাথরের তৈরী এক গণেশমূর্ত্তি পাওয়া যায়। মূর্ত্তিটি ছোট কিন্তু অপূর্ব শিল্পগুণমণ্ডিত। আভঙ্গ-দণ্ডায়মান চতুর্হস্ত গণেশ, ছোট চালিতে উড়ন্ত গন্ধর্ব আর পাদপীঠে ক্ষুদ্র মূষিক—পালযুগের কীর্ত্তি বলেই মনে হয়।

জয়পুর চা-বাগানের কালীমন্দিরে যে মনসা মূর্ত্তি বিরাজ করছে—তা ললিতাসনে উপবিষ্ঠা; দেবীর ডান পা পূর্ণকুম্ভের উপর স্থাপিত। বাম হাত ছুঁয়ে আছে ক্রোড়াসীন এক শিশু সর্পকে। মাথায় ছত্রাকার ফণা মেলে রয়েছে এক বিশালকায় সপ্তমুখী সর্প। চালচিত্রে দেবীর ডান-দিকে অদ্ভূত ভঙ্গিতে উপবিষ্ট ব্রহ্মা এবং বামে বিষ্ণু। একটু নীচে দুইদিকে দুই সহচরী। দেহভঙ্গির অনাবশ্যক কাঠিন্য ও ইহগত স্থূল-তার লক্ষণ। পালযুগের শেষপর্বের তক্ষণশিল্প বলে অনুমান করা যায়।

সোদর-খই মন্দিরের অনতিদূরে পেটকাটি দেবীর মন্দির। অভ্যন্তরে উপবিষ্টা চণ্ডীমূর্ত্তি।

চাউলহাটী থেকে সংগৃহীত বিষ্ণুমূর্ত্তিটি অতিরিক্ত কারুকার্যামণ্ডিত এবং পালযুগের শেষ পর্বের বলে মনে হয়।

জলপাইগুড়ি থেকে আট মাইলদূরে জাহিরি এলাকায় দুটি মূর্ত্তি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রথমটি কষ্টিপাথরের সূর্য্যমূর্ত্তি এবং অপরটি কষ্টিপাথরের এক পুরুষমূর্ত্তিটির একদিকে দণ্ডি অন্যদিকে পিঙ্গল। চালচিত্রে সূর্য্যদেবের দু'পাশে শ্রী ও সংজ্ঞা এবং নীচে উষা ও

প্রত্যূষা। পায়ের উপরে সারথি অরুণ ও পাদপীঠে সাতটি অশ্ব। পাল-রাজত্বের অবক্ষয়ের যুগে রচিত। ভাস্কর্য্য বিচারে দ্বিতীয় শিল্পটি অসাধারণ। চালচিত্রবিহীন এই নরমূর্ত্তির মস্তক অর্দ্ধমণ্ডিত। শিল্প সৌন্দর্য্যে প্রাণবন্ত ; এই মূর্ত্তি যেন শাপগ্রস্ত এক বিস্মৃত নরপতি। পাদ-পীঠে দুই ক্ষুদ্রাকৃতি কিংকরী চামরহস্তে দণ্ডায়মানা। শিল্পমণ্ডিত এই পদ্মপাণি মূর্ত্তিটি পালপর্বের শিল্পোৎকর্ষের যুগে রচিত বলে মনে করা হয়।

জাহিরি গ্রামেই আরও কিছু ধাতু নির্মিত মূর্ত্তি পাওয়া যায়। পদ্মাসনে আসীনা উমা মহেশ্বরের মূর্ত্তিটি সর্ববৃহৎ। দেবাদিদেবের বাম জানুর উপর উপবিষ্টা পাব্বর্তী এবং ডান পা পদ্মকোরকের উপর স্থাপিত। পাদপীঠে ক্ষুদ্রাকৃতি বৃষ ও সিংহ। তারপরেই উল্লেখযোগ্য দুটি বিষ্ণুমূর্ত্তি। পদমূলে ক্ষুদ্রাকৃতি গরুড়, জোড়হাতে উপবিষ্ট। অপেক্ষাকৃত বড় মূর্ত্তিটির আসনে তিনটি অক্ষর উৎকীর্ণ। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে চারিহাতবিশিষ্ট গণেশ মূর্ত্তিটিই অপেক্ষাকৃত অক্ষত। কূর্মাকৃতি আসনে রাজভঙ্গিতে আসীন গণপতি, পদতলে ক্ষুদ্রবাহন। মাথার পিছনে দেবলক্ষণ মহিমবলয়। একটি মূর্ত্তি অগ্নিদেবের বলে মনে হয়। শ্বশ্রুমণ্ডিত এই দেবমূর্ত্তি এক গোলাকৃতি বস্তুকে দু'হাতে নিজের কোলে ধারণ করে আছেন। একমাত্র দণ্ডায়মান দেবমূর্ত্তিটি সূর্য্যদেবের। দু'হাতে দুটি প্রস্ফুটিত পদ্ম ও পাদমূলে দুটি ক্ষয়প্রাপ্ত অশ্বমুখ লক্ষ্য করা যায়। চালচিত্রে দুই সহচর দণ্ডি ও পিঙ্গল। চিহ্নবিহীন শেষ পুরুষ মূর্ত্তিটির পরিচয় তর্ক সাপেক্ষ। তবে দেহভঙ্গিমায় ও গঠন শৈলীর বিচারে পদ্মহাতে অবলোকিতেশ্বর লোকনাথের আসীন মূর্ত্তি বলে মনে হয়। কোন রকম বৌদ্ধ লক্ষণ এই মূর্ত্তিতে অনুপস্থিত। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে নারীমূর্ত্তি মাত্র তিনটি। একটিতে দ্বিভুজে পদ্মাসনা দেবী ক্রোড়স্থ ; হাতে একটি পদ্মকলি ধারণ করে আছেন। তাঁর আসনের একদিকে পক্ষীজাতীয় বাহন ও অন্যদিকে বিরাট বোদা জাতির পশ্চিম শাখা।

জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পানিকোচজাতির দেখা পাওয়া যায়। যদিও পানিকোচ নামের সঙ্গে কোচজাতির সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা স্বভাবতঃই মনে আসে—তথাপি গারো জাতির সঙ্গে এদের মিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এদের মূল দেবতা হলেন ঋষি। এছাড়া সূর্য্য, চন্দ্র এবং তারকামণ্ডলীকে দেবতাজ্ঞান করে এবং নদী, বন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এরা পূজা নিবেদন করে।

জলপাইগুড়ি জেলার বেশীরভাগ জায়গা এক সময় প্রাচীন কামতাপুর বা কোচবিহার জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর ডুয়ার্স অঞ্চলটি ছিল ভুটানের মধ্যে। ভুটানী ভাষায় ডুয়ার্স বা দুয়ার অর্থে পর্বতের পাদদেশের সমতল জায়গা। ব্রিটিশ অধিকারের আগে ভুটিয়ারা ডুয়ার্স অঞ্চলকে কোচবিহার রাজ্য থেকে দখল করে নেয়। আর ভুটিয়াদের হাত থেকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা ডুয়ার্স এলাকা কেড়ে নেয়। ইংরাজরা ডুয়ার্স এলাকাকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ডুয়ার্স এই দু'ভাগে ভাগ করে। পূর্ব্ব ডুয়ার্স আসামের গোয়ালপাড়া জেলার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পশ্চিম ডুয়ার্সকে করা হয় স্বতন্ত্র জেলা। এই স্বতন্ত্র জেলাই জলপাইগুড়ি।

কোচবিহার

হিমালয়ের অঙ্কাশ্রিত যতগুলি নগরপ্রধান অঞ্চল উত্তরবঙ্গে আছে নিঃসন্দেহে কোচবিহার তারমধ্যে নয়নাভিরাম। উত্তরে হিমালয়ের শুভ্রকিরীট, দক্ষিণে দুর্দ্ধর্ষ নদী সঙ্কোষ, রায়ডাক, তোরষার জলবিধৌত সমতলভূমি এবং বনাঞ্চল, তারই মাঝে অমূল্য সম্পদ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আজকের কোচবিহার। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে কোচবিহার একটি জেলারূপে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কোচবিহার শহরের পূর্বনাম গুড়িয়াহাটি এবং এই রাজ্যের রাজধানী। তবে বিভিন্ন সময়ে কোচবিহারের বিভিন্ন অঞ্চল রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়েছিল। যেমন—চিকনা, হিঙ্গুলাবাস, ভ্রমরাকুণ্ড, আঠারোকোঠা, বসন্তপুর, ধলিয়াবাড়ি, ডেটাগুড়ি, তোর্ষার পাড়, কোচবিহার ইত্যাদি।

কোচবিহার কথাটার উৎপত্তি সম্ভবতঃ সংস্কৃত শব্দ বিহার থেকে। বিহার অর্থাৎ প্রমোদ্দ্যোন—কোচজাতির প্রমোদ্দোান। বিহার প্রদেশের মত নামকরণে এই ঐতিহাসিক সত্যতা থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু আমরা জানি যে কোচবিহারের প্রাচীন নাম কামরূপ। পুরাণ ও তন্ত্রে প্রাচীন কামরূপ চারটি পীঠ নিয়ে গঠিত—কামপীঠ, রত্নপীঠ, সুবর্ণপীঠ এবং সৌমারপীঠ। কোচবিহার ছিল এই শেষোক্ত পীঠের অন্তর্গত। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে বাদশাহ-নামা, তারিখ-ই-আমাম, আলমগীর-নামা প্রভৃতি ফার্সী গ্রন্থে কোচদেশের পশ্চিম-ভাগকে কোচবিহার বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্বকোষ মতে কোচবিহারের আদিনাম বিহার, পরে কোচরাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময় থেকে মুঘলশাসিত বিহার প্রদেশের সঙ্গে নামবিভ্রান্তি হওয়ার জন্য পৃথকভাবে এই রাজ্যের নাম দেওয়া হয় কোচবিহার। কথিত আছে, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে মধ্য-এশিয়া থেকে একদল যাযাবর জাতি এদেশে আগমন করে। হিমালয়ের উত্তুঙ্গশিখর পার হয়ে তারা ক্রমশঃ তরাই-অঞ্চলে বসতিস্থাপন করে। নেপাল ভারত সীমান্ত নদী

মেচীর পশ্চিম অংশ নিয়ে তারা বসবাস শুরু করে বলে তাদের "মেচ" নামে অভিহিত করা হয়। এই মেচজাতির এক অংশ তিস্তা পার হয়ে অপেক্ষাকৃত সমতলভাগে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের কোচ বলে অভিহিত করা হয়। তাদের নাম থেকেই এই কোচবিহারের শুরু। এছাড়াও এই রাজ্যের নামের পিছনে যে সব কিংবদন্তী আছে তার মধ্যে ক্রোড় (ভগবতীর ক্রোড় বা কোল) থেকে কোচ, সঙ্কোচ (ভয়) থেকে কোচ, সঙ্কোচ (নদী) থেকে কোচ, কুবচ (মন্দ কথা) থেকে কোচ, কোচক এবং কমোচ থেকে কোচ উল্লেখযোগ্য। অবশেষে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহার সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে কোচবিহার আখ্যা দেন। কোচরাজবংশের অনেককেই যেমন বিশ্বসিংহ, নরনারায়ণ, প্রাণনারায়ণকে কামতেশ্বর উপাধি নিতে দেখা যায়। এ থেকে মনে হয়, সেই সময় কোচরাজ্য কামতা বলে পরিচিত ছিল। খ্রীষ্টীয় এয়োদশ শতকে বারো ভুঁইয়ার মধ্যে হাজো নামে একজন কোচবংশীয় এ অঞ্চলে প্রভুত্ব করতেন তাই কামরূপের একাংশের নাম হয় কোচ হাজো। এই সময় কোচরাজ্য পশ্চিমে করতোয়া থেকে পূর্ব্বে গৌহাটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বোদাজাতির প্রতিভূ কামরূপ নৃপতি ভাস্করবর্মণ সপ্তম শতাব্দীতে নিঃসন্দেহে তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম বিখ্যাত নরপতি। হর্ষের সমসাময়িক এই নৃপতি সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, সুরমা উপত্যকার কিয়দংশ এবং বাংলার উত্তরাঞ্চল নিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ভাস্করবর্মণের কৃতিত্বের পরিচিতির অবকাশ রাখে না। ভাস্করের মৃত্যুর পর থেকে এবং কোচরাজ নরনারায়ণের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের অধ্যায় অত্যন্ত অস্পষ্ট। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজ্যকালে কামতাপুরের হিন্দুরাজ্যের অধঃপতনের অব্যবহিত পরে উত্তরবঙ্গে একটি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। কালিকা পুরাণে কোচদেশের উল্লেখ আছে। এয়োদশ শতকের প্রথমদিকে বঙ্গবিজয়ী বখ্‌তিয়ার খিলজী তিব্বত অভিযানের সময় কোচদেশে এসেছিলেন, ইতিহাসে

তার উল্লেখ আছে। গৌড়ের নবাব হোসেনশাহ কোচবিহার আক্রমণ করেন। কামতাপুর ধ্বংসের পঁচিশ বছরের মধ্যে কোচবংশীয় বিশ্বসিংহ এই নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের মৃত্যু হয়েছিল এবং তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র মল্লদেব বা নরনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেছিলেন। নরনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সেনাপতি শুক্লধ্বজ বা চিলারায় কোচরাজ্য বহুদূর বিস্তৃত করেছিলেন। সর্ব্বপ্রথম কোচরাজের সঙ্গে আহমরাজ মুঙ্গের বিবাদ আরম্ভ হয়। নারায়ণপুরের যুদ্ধে কোচসেনা পরাজিত হয়ে ফিরে এলে চিলারায় নিজে আহমরাজ্য আক্রমণ করেন এবং অধীনতা স্বীকার করাতে বাধ্য করেন। এরপর কাছাড় ও মণিপুর বিজিত হয়েছিল এবং তারা বিংশতি সহস্র রজতমুদ্রা বার্ষিক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। নরনারায়ণ সোলেমান কররানীর রাজত্বকালে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু কালাপাহাড় চিলারায়কে পরাজিত করে তেজপুর পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করেছিলেন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সোলেমান কররানী কোচরাজধানী আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু উড়িষ্যার বিদ্রোহের কথা শোনামাত্র তিনি এই অভিযান পরিত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হন। ঐ সময় কামাখ্যা ও হাজোর প্রাচীন মন্দিরসমূহ বিনিষ্ট হয়। সুলতান হোসেনশাহ কি কারণে কামতাপুর আক্রমণ করেছিলেন ইতিহাসে তার কোন উল্লেখ নেই। তবে তিনি নীলাম্বরের রাজধানী গোঁসানীমারীর উপর যে প্রবল আক্রমণ চালিয়ে রাজ্য বিপর্য্যস্ত করে দেন তার নজীর অনেক আছে। বস্তুতঃ, হোসেনশাহের আক্রমণের ফলেই কামতাপুর রাজ্য ভেঙে পড়ে এবং উত্তরবঙ্গের এক বিস্তৃত অংশ আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অসমীয়া রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। হোসেনশাহের আক্রমণে কোচবিহারের বহু হিন্দুকীর্ত্তি বিনষ্ট হয়। পালবংশের সময়ে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর ভূখণ্ড কিরাত ও বোদাকৌমের শাখা প্রশাখার দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। এদের মধ্যে প্রধান ছিল

কোচকৌম। এরা প্রধানতঃ কোচ নামে অভিহিত হোত। এই রাষ্ট্রের রঙ্গমঞ্চে যখন এরকম পরিবর্ত্তন ঘটছিল তখন বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটল। "পোহালে শর্বরী বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে"। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করল। কোচবিহাররাজ প্রেরিত বোদা, পাইগ্রাম ও পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ জলপাইগুড়ি চাক্‌লাএয়ের রাজস্ব কোম্পানীর হাতে জমা পড়ল এবং এই সময় থেকে মোগল শাসনের অবসান ঘটে কোম্পানী রাজস্ব কায়েম হোল। মোটামুটিভাবে কোচরাজবংশের একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে।

মহারাজা বিশ্বসিংহ
" নরনারায়ণ
" লক্ষ্মীনারায়ণ
" বীরনারায়ণ
" প্রাণনারায়ণ
" মদনারায়ণ
" বাসুদেব নারায়ণ
" মহীন্দ্র নারায়ণ
" রূপনারায়ণ
" উপেন্দ্র নারায়ণ
" দেবনারায়ণ
" ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ
" রাজেন্দ্র নারায়ণ
" ধরেন্দ্র নারায়ণ
" ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ (২)

নরনারায়ণের আমলে ভুটান ও তিব্বতের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক বিরাজ করছিল কিন্তু কোন কারণে তা বিষাক্ত হয়ে উঠে এবং

রাজ্যলিপ্সায় ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভুটানের রাজা কুশুদেবু তিব্বতের রাজা রিম্বুচীকে নজরবন্দী করে রাজ্য হস্তগত করেন। কিন্তু রাজ্যজয়ের লালসা তাঁর এইখানেই পরিতৃপ্ত হয় নি। লালসায় হাত বাড়ালেন কোচবিহারের দিকে এবং কোচবিহার ও ভুটানের যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ল। এই যুদ্ধে যারা বিচলিত হয়ে পড়লেন সবচেয়ে বেশী তারা হোল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন তাদের ব্যবসার ছাউনি বাংলাদেশের সর্ব্বত্র বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য শহর-নগর-বন্দরে বিছিয়ে দিয়েছে। ব্যবসার মাধ্যমে পাশ্ববর্ত্তী ছোট ছোট রাজ্যগুলির খবর সংগ্রহে ব্যস্ত থাকত। রংপুরে তাদের একচেটিয়া কারবার। তিব্বতের কাছ থেকে ভেড়ার লোম আনতে তাদের ভুটান ও কোচবিহারের মধ্যে সড়ক ব্যবহার করতে হোত। সুতরাং এই যুদ্ধে ভুটান পরাক্রমশালী হয়ে উঠলে এবং দক্ষিণদিকে ক্ষমতা প্রসারিত করতে থাকলে ইংরাজ ঘাঁটিগুলি যে বিপন্ন হয়ে পড়বে তাতে ইংরাজদের মনে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইল না। উপরন্তু, তিব্বতের সঙ্গে তাদের ব্যবসাও বন্ধ হয়ে যাবে। ভীষণ সঙ্কটে পড়ল ইংরাজরা। কিন্তু পরদেশে রাজ্যবিস্তার করতে হতাশায় পড়লে চলবে না ভেবে তারা সুযোগের অপেক্ষায় রইল। সুযোগও এসে হাজির হোল যথাসময়ে। কোচবিহারে তখন অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা, কুশুদেবুর শক্তিশালী সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করতে অক্ষম, অতএব, ইংরাজদের সাহায্য ভিক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ইংরাজের সাহায্যে কোচবিহার ভুটানরাজ কুশুদেবুকে পরাস্ত করলো। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে আর এক নূতন কোচবিহারের অধ্যায় শুরু হোল এবং ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করদরাজ্য বলে কোচবিহার পরিগণিত হোল।

খেনজাতির আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ে কোচবিহারের কোনরকম পুরাতত্ত্বের সন্ধান মেলে নি। এই জাতি সম্ভবতঃ চারশো বছর আগে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং পরপর তিনজন নরপতি কামরূপের শাসনকর্ত্তা হয়েছিলেন। তাঁদের রাজ্য ছিল কামতাপুর বর্ত্তমানে যা গোঁসানীমারি

বলে খ্যাত। এই নরপতিগণ নিজেদের রাজ্যে নিরাপত্তা রাখার জন্য অথবা বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন যার অস্তিত্ব কোচবিহারের উত্তর-দক্ষিণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। মনে হয়, এই জাতির তৃতীয় নরপতি নীলাম্বর কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। তাঁর তৈরী গোরাঘাটের দুর্গ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়েছিল এবং রাজা নীলাম্বরকে সিংহাসন চ্যুত করে এই দুর্গকে মুসলমানেরা নিজেদের ঘাঁটি তৈরী করেছিল।

কোচবিহারের খেনজাতি ছাড়া আর যে সমস্ত জাতির অস্তিত্বের কথা জানা যায় তাদের মধ্যে মোরঙ্গী উল্লেখযোগ্য। তারা অনেক সময় নিজেদের ছত্রী বলেও অভিহিত করে। মোরঙ্গীদের প্রাচীনতম আবাস কোথায় ছিল জানা যায় না, তবে অনেকে বলেন যে তারা পূর্ণিয়া থেকে এসেছিল। খেনেদের মত এদের সংখ্যাও স্বল্প। কোচবিহারে রাজবংশীদের সংখ্যাই উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে রাজবংশীদের আদিবংশধর মেচজাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজবংশী হিন্দুর মধ্যে দু'টি ধর্মমতের সন্ধান মেলে—শঙ্করপন্থী এবং দামোদরপন্থী। শঙ্করপন্থী সাধারণতঃ শৈব এবং দামোদরপন্থীদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হিসাবে ধরা হলে প্রথমোক্তরা ক্ষত্রিয় এবং দ্বিতীয়রা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। সমগ্র উত্তরবঙ্গেই শিব নানাভাবে সকল জাতির পূজ্য। নেপালী সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাকাল, লিঙ্গরাজ প্রভৃতির পূজার্চ্চনা দেখা যায়। মেচ, গারো, খেন ও মোরঙ্গীদের মধ্যেও শিবার্চ্চনা বিধি প্রচলিত আছে কেননা তাদের ধারণায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখ-দুঃখের ভাগী শিব কোন কোন সময়ে শিব নিজেই নায়ক হয়ে কোচবিহারের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরেছে। কোচবিহারের শিবতন্ত্রের প্রচলন কবে তার কোন প্রামাণ্য ইতিহাস নেই। প্রাক্ আর্য্যযুগের দ্রাবিড় ধর্ম্মমত সম্পর্কেও কোচবিহারের উপর কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।

একদা কোচবিহার কামরূপের অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্য তার সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়েছে কোচবিহারের উপর আর তার অনিবার্য্য প্রভাবের ফলে কোচবিহারের আদিজীবন স্থাপনার মধ্যে শৈবমতের প্রাবাল্য ছিল এবং এখনও তা সমভাবে বহমান। শিব-দুর্গাকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের দৈনন্দিন জীবন ও লোকসংস্কৃতির যে সন্ধান মেলে তার বৈচিত্র্য এত বেশী যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। আসামের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে কোচবিহারের আদিম অধিবাসীদের সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য ছাড়াও বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল তা কোচবিহারের একাধিক ইতিহাস ও রাজবংশবলী থেকে পাওয়া যায়। লোকসংস্কৃতির অধিকাংশই দেব-বন্দনার মধ্যে সীমিত। মধ্যযুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত কোচবিহারের রাজবংশ এক অখণ্ড ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে। এই জেলা সুপ্রাচীনকালের কামরূপ অন্তর্গত এবং তার-ফলে প্রাগজ্যোতিষ সংস্কৃতির প্রভাব; তারপরে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি এবং তার কৃষ্টি-সম্পদের সংমিশ্রণের ধারা আজও সগৌরবে অম্লান। পশ্চিমবাংলার এই নূতন সংস্কৃতির একটি ধারাকে কোচবিহার এমনভাবে রক্ষা করে চলেছে যা কোন অঞ্চলেই নেই। অসংখ্য পুরাকীর্ত্তি, মঠ, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ কোচবিহারের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কোচবিহারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্ম প্রচারক এসেছেন এবং এদের সকলকে নিয়েই এর সংস্কৃতি। প্রথমে নাথধর্মের গোরক্ষনাথ, ষোড়শ শতকে শিখগুরু নানক, বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য (গৌড়ীয়) এবং শঙ্করদেব (অসমীয়া), পরবর্ত্তীকালে খ্রীষ্ট, জৈন ও ব্রহ্মধর্ম অল্পবিস্তর অনুপ্রবেশ করে।

কোচবিহারের বর্ত্তমান সুরম্য রাজপ্রাসাদ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ নির্মাণ করেন। ইমারতের চূড়ায় ধাতুনির্মিত গম্বুজ আছে এবং ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতিতে প্রভাবিত। মূল রাজপ্রাসাদ ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দেই বিলুপ্ত হয়েছে। কামেশ্বরী দেবী নির্মিত ডাঙ্গর আয়ী মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ দুর্গা হলেও অন্যান্য দেবদেবী একত্রে পূজিত হন। কালী

ও দুর্গা ও রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি অষ্টধাতুনির্মিত এবং শিব ও নারায়ণ মূর্ত্তি পাথরের। বড়দেবী মন্দিরে উনিশ শতকের ইউরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তার কারণ মণ্ডপে করিন্থিয়ান থামের ব্যবহার এবং ছাদের কর্নিসে পেডিমেন্টজাতীয় তিনকোণা অলংকরণ। কোচবিহারের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মন্দির কামতেশ্বরী (আলোকচিত্র-৭)। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রাণনারায়ণ এর নির্মাণকর্তা। তবে মনে হয়, আদি কামতেশ্বরী মন্দির খেনযুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল এবং হোসেনশাহের আক্রমণে তা বিধ্বস্ত হয়, এমনকি, প্রাণনারায়ণের রাজত্বকালে এই মন্দিরটি মুসলমান আক্রমণের কবল থেকে উদ্ধার পায় নি। এই মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে শিবলিঙ্গ ও পালযুগের এক সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখা যায়। বিষ্ণুমূর্ত্তিটিকে অনেকে নারায়ণমূর্ত্তি বলে মনে করেন। বিগ্রহটি গরুড় বাহন ও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। তাঁর বাম ও ডানদিকে যথাক্রমে শ্রী ও শঙ্খ পুরুষ এবং সরস্বতী ও চক্রপুরুষ আছেন। কামতেশ্বরীদেবীর মূল মন্দির চারচালারীতির; বাঁকানো কর্নিসের উপরে গোলাকার গম্বুজ স্থাপন করে গঠিত এবং কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, এই ইমারতে মুঘল স্থাপত্য ও বাংলার চালারীতির মিলন দেখা যায়। মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগে কিছু কিছু অলংকরণের চেষ্টা করা হয়েছে বটে, তবে তা নিতান্তই নগণ্য।

মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল কোচবিহারের স্বর্ণযুগ। ইনি ছাড়া কোচবিহারের আর কোন রাজা এত অধিক সংখ্যক মন্দির নির্মাণ করতে সক্ষম হন নি। তাঁর রাজত্বকালে যে সমস্ত মন্দির নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে হিরণ্যগর্ভ, আনন্দময়ী, নৃসিংহঠাকুর, সিদ্ধেশ্বরী, বাণেশ্বর, ক্রোটেশ্বর শিবমন্দির, বামাকালী, ঘূর্ণেশ্বরী মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর পরবর্ত্তী রাজারা, এমনকি নাজির বা দেওয়ানরা কিছু কিছু মন্দির নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু মন্দির নির্মাণ রীতিতে নূতনত্বের অভাব, অলংকরণের

অনুপস্থিতির জন্য আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কোচবিহারের আর একটি বিখ্যাত শিবমন্দির বাণেশ্বর (আলোকচিত্র-৮)। মন্দির দেখে খুব প্রাচীন বলে মনে না হলেও স্থানীয় জনসাধারণের মতে প্রাচীন এবং কিংবদন্তী অনুযায়ী, রাজা বাণ বা বাণাশূর, রাজা জল্লেশ্বর, নীলাম্বর, নরনারায়ণ এবং প্রাণনারায়ণ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু সঠিক কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেছিল তা বলার উপাদান আমাদের হাতে নেই। মনে হয়, পৌরাণিক যুগের রাজা বাণ বা বাণাশূরের নামেই এর নামকরণ। এই মন্দিরটি উচ্চতায় ১১ মিটার; পশ্চিমমুখী গম্বুজাকৃতি এবং বাঁকানো কর্নিস। প্রধান দরজার উপরের খিলান বহুমুখী এবং ছুঁচালো। খিলানের উপরের লহরা, তার উপরে বেঁকি, উপরে পরপর গম্বুজ, পদ্ম, পলকাটা আমলক. কলস ও ত্রিশূল স্থাপিত। বাণেশ্বর মন্দিরের মত একই উচ্চতাবিশিষ্ট গম্বুজাকৃতি আর এক মন্দির আমাদের নজরে আসে, তা হোল সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির। আটকোণা ও গম্বুজশোভিত এহেন মন্দির কোচবিহারে আর নেই বললেই চলে। গম্বুজের উপর প্রথাগতভাবে পদ্ম, আলমক, কলস, ও ত্রিশূল দেখা যায়। বীরভূমের কিছু কিছু মন্দির এর অনুকরণে নির্মিত এবং মুসলিম ও ব্রিটিশ স্থাপত্য সমন্বয়ে এই মন্দিরটি অপরূপ এবং এর প্রতিষ্ঠাকাল অষ্টম শতকের শেষে অথবা উনিশ শতকের প্রথমে। প্রতিষ্ঠাতা সম্ভবতঃ হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী। পূর্ব্বে আসামের অন্তর্গত এবং পরে কোচবিহারের অধীনে কামাক্ষীয় মন্দির বিখ্যাত। কিংবদন্তী অনুযায়ী, কামরূপের পৌরাণিক রাজা নারকাসুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যানে দেখা যায়, বর্ত্তমান কোচবিহার, গোয়ালপাড়া, আসাম অঞ্চলে নারকাসুরের পুত্র ভগদত্ত রাজত্ব করতেন। ইনি দুর্য্যোধনের পক্ষ নিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাই অর্জ্জুন কামরূপের রাজধানী প্রাগজ্যোতিষপুর দখল করেছিলেন। এই ভগদত্তের বংশে হর্ষবর্দ্ধনের বন্ধু ভাস্করবর্মণের জন্ম। এই বংশের বিলুপ্তির পর কোচবিহার অঞ্চলটি রাজা ধর্মপাল অধিকার করেন। পরবর্ত্তীকালে এর ধ্বংসাবশেষের

উপর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা নরনারায়ণ দুটি নাটমন্দির—পঞ্চরত্ন ও নবরত্নসমেত ইটের পরিখা দ্বারা বেষ্টিত বর্ত্তমানের এই কামাক্ষীয় মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবতী মূর্ত্তি। দরজায় নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক উৎকীর্ণ।

লোকানুগ্রহকারকঃ করুণয়া পর্যোধনুর্বিবত্তয়া
দানেনাপি দধীচিকর্ণসাদৃশো মর্য্যাদয়োম্ভোনিধিঃ।
নানাশাস্ত্রবিচারচারুচরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বলঃ
কামাক্ষ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো নৃপঃ।
তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা ধীরেন্দ্রমৌলিস্থলী
মাণিক্যং ভজমান কল্পবিটপী নীলাচলে মণ্ডলম্।
প্রাসাদং মুনি-নাগ-বেদ-শশচ্ছকে শিলারাজিভি
দেবী ভক্তি মাতংবরো রচিতবান্ শ্রীপূর্ব্ব শুক্লধ্বজঃ॥

এ ছাড়া আরও কিছু কিছু দুর্গ যেমন ফেঙ্গুয়াগড়, বৈদ্যের গড়, বিক্রম রাজার গড়- প্রতাপগড়, কামতাপুর দুর্গ, বারো পাইকের গড়, বিশ্বসিংহের কেল্লা, চিলারায় (শুক্লধ্বজ) কোট ইত্যাদি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত। এদের মধ্যে চিলারায়ের কোট উল্লেখযোগ্য। মাটি-ইট-চূণ মেশানো উঁচু পাঁচিলঘেরা এক গড়—চিলারায়ের কোট। উত্তর দক্ষিণে ৮৪ মিটার বিস্তৃত। দুর্গের মধ্যে ছিল অন্দরমহল, তাই স্থানের নাম অন্দরাণ ফুলবাড়ি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে রাজা নীলধ্বজ বা নীলাম্বর নির্মিত কামতাপুর দুর্গ মাটির পাঁচিল, প্রায় ২২ কিলোমিটার বিস্তৃত। দুর্গের অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বার—শিলদুয়ার, সন্ন্যাসীদুয়ার, জয়দুয়ার, নিমাইদুয়ার ও হেঁকো-দুয়ার নামে আখ্যাত। এই দুর্গে পাথর ব্যবহার হয়েছিল কিনা সঠিক বলা না গেলেও দুয়ারে যে পাথর ব্যবহৃত হয়েছিল, শিলদুয়ার নামকরণ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। খেন ও কোচরাজারা অনেক জলাশয়, সেতু ও রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন যার ধ্বংসাবশেষ অধুনা বিদ্যমান। পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন যা আমাদের নজরে আসে তা সবই প্রাক্‌পালযুগীয়। পাল-

সেনযুগীয় পাথরে খোদাই করা যে সব দেবদেবীমূর্ত্তি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে বিষ্ণু, সূর্য্য, উমা, মহেশ্বর উল্লেখযোগ্য। কোচবিহারের অনেক মন্দির ইটের তৈরী হলেও, অধিকাংশ ছিল মাটির দেওয়াল টীনের চালাযুক্ত। প্রাচীন মন্দিরগুলি সাধারণতঃ চারচালা ধরণের এবং নির্মাণ রীতিতে মুঘল স্থাপত্যের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। দেওয়ালে চূণবালির খাঁজকাটা পলস্তরা ব্যতীত কোন শিল্পকাজ দেখা যায় না। খ্রীষ্টাব্দ ষোড়শ শতাব্দী থেকে কোচবিহারে ইটের মন্দির নির্মিত হতে থাকে এবং অন্যান্য জেলার মত এখানেও দোচালা, চারচালা, আটচালা-রীতি অনুসৃত হয়। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের লক্ষণীয় বিষয় হোল এর বাঁকা কর্নিস—অনেকটা কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি এবং ছাদ গম্বুজাকৃতি। কোচবিহারের মন্দির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তবে অধিকাংশ শিব, বিষ্ণু, দুর্গা ও কালীমন্দির। খেনরাজাদের মত তাঁদেরও উপাস্যদেবী হলেন কামতেশ্বরী ও ভবানী।

কোচবিহারে সুভাষপল্লী অঞ্চলে অনাথনাথ শিবমন্দির (আলোক চিত্র-৯)। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং উচ্চতায় প্রায় ২৮ ফুটের মত হবে। মন্দিরটি চারকোণা এবং চারকোণে চারটি স্তম্ভ দেখে মুসলিম স্থাপত্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। ইটের তৈরী এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে। দেওয়ালের গায়ে দুটি বিড়ালমূর্ত্তি, দুটি সিংহমূর্ত্তি ও একটি গণেশ মূর্ত্তিসহ পদ্মের অলংকরণ আছে। সামনের দেওয়ালে খাঁজকাটা অনেক খোপ দেখা যায়। মন্দিরের ছাদের উপর গম্বুজ—গম্বুজের উপরে পদ্ম, আমলক, ত্রিশূল আছে। মন্দিরটির অভিনবত্বের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে বিড়ালমূর্ত্তির উপস্থাপনা, যা সারা পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও দেখা যায় না। এই উপস্থাপনার মধ্যে হয়তো কোন ইতিহাস থাকতে পারে কিন্তু তা আমাদের জানা নেই।

ধলিয়াবাড়িতে পোড়ামাটির ফলকযুক্ত দক্ষিণমুখী সিদ্ধনাথ শিবের (আলোকচিত্র-১০) পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা যায়। এ মন্দিরটিও দক্ষিণমুখী এবং উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট। দেবালয়ের বাঁকানো চালের উপরে

চারকোণে চারটি রত্ন আছে কিন্তু মাঝখানে আরও একটি রত্ন ছিল বলে মনে হয় যা বহুপূর্ব্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে কিছু পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায়। অনাথনাথ শিবমন্দিরের মত এই মন্দিরেও মুসলিম স্থাপত্যের আধিপত্য লক্ষিত হয়। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে নয় ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মিহরাবের উপস্থাপনা করা হয়েছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের খিলান বহুমুখী এবং ছুঁচালো। তার নীচে ও দুপাশে দুটি থাম আছে। থামের গায়ে পলকাটা আমলকের অলংকরণ দেখা যায়। দেওয়ালের গায়ে খাঁজকাটা অনেক-গুলি খোপ আছে, এবং সেই সমস্ত খোপে দশাবতার, পৌরাণিক দেবীর মূর্ত্তি, বন্দুকধারী পল্টন, নর্ত্তকীমূর্ত্তি এবং লতাপাতার অলংকরণ দেখা যায়। সম্ভবতঃ হরেন্দ্রনারায়ণ এটির নির্মাণকার্য্য শুরু করেন এবং শিবেন্দ্রনারায়ণ তার সমাপ্তি ঘটান। প্রতিষ্ঠাফলক না থাকার জন্য অনেকে বলেন যে মন্দিরটি মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। সিদ্ধনাথ শিবমন্দির ছাড়া আর সর্বত্রই পোড়ামাটির অলংকরণ অনুপস্থিত। এই মন্দির সাদৃশ্যে বর্দ্ধমান জেলার অনুরূপ। এরই অদূরে যে স্তূপ দেখা যায় তা সম্ভবতঃ উপেন্দ্রনারায়ণের রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

বৈরাগীদীঘির উত্তরতীরে মদনমোহন মন্দির মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। মদনমোহন কিভাবে ও কোন সময়ে কোচবিহারের রাজাদের কুলদেবতাতে পরিণত হন তা জানা যায় না। তবে শোনা যায়, মহারাজ নরনারায়ণ এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে, কোচ রাজাদের কুলদেবতা ছিলেন নারায়ণ। অনেকে প্রাণনারায়ণকে এর প্রতিষ্ঠাতারূপে বর্ণনা করলেও নানা সাক্ষ্যপ্রমাণে মনে হয় যে মহারাজ রূপনারায়ণই ছিলেন এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। রূপনারায়ণ নির্মিত মন্দিরটি সম্ভবতঃ পুরানাবাসে ছিল। পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ এই বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কোচবিহারের অধিকাংশ মন্দিরের মত এটিও

বাংলা চারচালার অনুকরণে চারকোণা ঘরের বাঁকানো কর্নিসের উপর গম্বুজ বসিয়ে নির্মিত। তার উপরে যথারীতি পদ্ম, কলস, আমলক প্রভৃতি। মন্দিরের সামনে আছে সমতল ছাদের এক বারান্দা এবং পাশাপাশি কয়েকটি ঘরের অবস্থানের জন্য দালানে মন্দিরের প্রভাব এসে পড়েছে। মদনমোহনের কষ্টিপাথরের তিনটি মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরের পূর্ব্বদিকে দক্ষিণমুখী ভবানীদেবীর মন্দির।

এই জেলার বিভিন্নস্থান থেকে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি, মুদ্রা পাওয়া গেছে। এদের অধিকাংশই পঞ্চদশ শতাব্দীর, কিছু মুসলমান রাজত্বের তবে কোনটাই পালপূর্ব্ব যুগের নয়। পাল-সেন যুগে নির্মিত কিছু কিছু দেবদেবী মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজপাটে কতকগুলি খোদিত মূর্ত্তি দেখা যায়। শিল্পনৈপুণ্যের চাতুরী না থাকলেও পুরাবস্তুর দিক থেকে এগুলি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। নির্মাণকাল সেনযুগের পরবর্ত্তীকালের। এই মূর্ত্তিগুলির দেহের গঠন ও মুখ লম্বা ও পাতলা ধরণের হওয়ার জন্য মন্‌থমের ভাস্কর্য্যের সাদৃশ্য মেলে। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত আরও ন'টি মূর্ত্তিফলক উল্লেখযোগ্য। গোঁসানীমারিতে যে বিষ্ণুমূর্ত্তিটি পাওয়া যায় তা পালযুগীয় এবং প্রকারভেদে নারায়ণমূর্ত্তি বলে আখ্যাত। বিগ্রহ গরুড়বাহন ও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। তাঁর বামে শ্রী ও শঙ্খপুরুষ এবং ডানে সরস্বতী ও চক্রপুরুষ। সেনযুগের আট ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট একটি ব্রোঞ্জের সূর্য্যমূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। দু'হাতে পদ্ম নিয়ে দণ্ডী পিঙ্গল, উষা, প্রত্যুষা ও অরুণের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে পদ্ম ও কোমরে তরবারিবিশিষ্ট। পালযুগীয় সূর্য্যমূর্ত্তিটিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিগ্রহটি কষ্টিপাথরের।

কোচবিহার জেলায় যে সব মসজিদ এবং মাজার আছে তার মধ্যে মহারাণীগঞ্জে তোর্সাপীরের ধাম ও হলদিবাড়ীর পীর একরাসুল হকের মাজার বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া পুরাণী মসজিদ, খাগড়াবাড়ির মসজিদ, শিবপুরের মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

কোচরাজারা মুঘলদের সঙ্গে চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী মুদ্রা প্রচলন করার অধিকার আদায় করে নিয়েছিল এবং ভারতচুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই মুদ্রা নারায়ণীমুদ্রা নামে খ্যাত ছিল। অবশ্য ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করার চেষ্টা করে এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এক আদেশবলে ব্রিটিশ সরকার মুদ্রা প্রচলনের এই অধিকার ও মুদ্রার ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। বর্ত্তমানে কোচবিহার জেলা জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। জেলাটিতে প্রথমে এসেছে জৈনধর্ম, পরে তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে এখানে তৈরী হয়েছে কালীতারা ও ভবানীদেবীর মন্দির। তারপর একদিন বৈষ্ণব সাধনার স্রোতে কোচবিহার প্লাবিত হয়েছে। অতি আধুনিককালে সেখানে ব্রহ্মধর্মের প্রচারও চলেছে।

দার্জিলিং

দার্জিলিং-এর ইতিহাস অতীব বিচিত্র। প্রাকৃতিক পরিবেশ, পাঁচমেশালী অধিবাসী, তার সংস্কৃতির আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে দার্জিলিং অন্যান্য জেলা থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে অরণ্য পর্ব্বতের অপরূপ সৌন্দর্য্য আর অপরদিকে সমতলভূমিতে সবুজ বনের সমারোহ। একদিকে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ও পাগলাঝোরার ঝরঝর শব্দে দার্জিলিং মুখরিত, অন্যদিকে তিস্তার ভৈরব গর্জন! ধ্যানমৌন পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্টিপথ থেকে শুরু হয়ে দিগ্বলয়ের কোলে গিয়ে মিশেছে, এর প্রতি শিলাস্তরেই কতই না বৈচিত্র্য জমা হয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। প্রাণচঞ্চলা দার্জিলিংই শুধু বিস্ময় নয়, বিস্ময় তরাই-এর সীমাহীন অরণ্যশ্রেণী। একদা দার্জিলিং এমন অপরূপা ছিল না। শুধু গিরিগুহায় সেদিন লেপচা আর সিকিমী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রার্থনা প্রতিধ্বনিত হোত। সে সন্ন্যাসীরা দোর্হজ সম্প্রদায়ভুক্ত। তখন আজকের দার্জিলিং শুধুমাত্র দোর্জ-লিং—দোর্জদের স্থান—অন্য কারো নয়।

দার্জিলিং-এর নামকরণ নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। কিংবদন্তী অনুযায়ী, অবজরভেটরী পাহাড়ের এক গুহায় দুর্জয়লিঙ্গ নামে এক মহাকালের মন্দির ছিল। এই দুর্জয়লিঙ্গের নামানুসারেই দার্জিলিং নামের উৎপত্তি।

দার্জিলিং-এর ইতিহাস খুব বেশীদিনের নয়। বর্ত্তমান কালিম্পং তখন ভুটানের অন্তর্গত। শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য সেই কালিম্পংকে সিকিমের অন্তর্ভুক্ত করা হোল ১৭০৬ সালে এবং পাহাড় দার্জিলিং-এর সঙ্গে কালিম্পং-এর যোগসাধন এবং ১৮৮০ সালে শিলিগুড়িকে জলপাইগুড়ি জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দার্জিলিং-এর সঙ্গে যোগ করার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হোল।

সুবে বাংলার প্রাণকেন্দ্রে তখন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডের গুরুভার চেপে বসেছে। রাজ্যলিপ্সু ইংরাজরা সীমান্ত থেকে সীমান্তে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছিল দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত, যে মুহূর্ত্তে এক একটি রাজ্য গ্রাস করা যায়। ১৮১৪ সালে অক্টারলোনির নেতৃত্বে ইংরাজ সৈন্য নেপালের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে তুলল এবং সিকিমরাজকে উস্কানি দিয়ে চললো নেপালের বিরুদ্ধে। ঠিক এই সময়ই নেপালী গুর্খাসৈন্য সিকিমরাজ্য আক্রমণ করে সিকিমরাজকে গদিচ্যুত করে। তখন সিকিমরাজ ইংরাজদের শরণাপন্ন হলে ইংরাজ সৈন্য প্রকাশ্যেই সিকিমের পক্ষে অবতীর্ণ হয় এবং তাদের সাহায্যে রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে। তখনকার মত বিরোধ মিটলেও ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার নেপালী ফৌজের হানা ঘটে। এবারও ইংরাজদের প্রচেষ্টায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাদের প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে বেড়ে যায়। এরপর থেকেই ইংরাজ রাজপুরুষদের আনাগোনা বেড়ে চলে এ অঞ্চলে এবং পরিশেষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও জলবায়ুতে মুগ্ধ হয়ে সেখানে উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগ দেয়। সারা পশ্চিমবাংলায় তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। অন্ততঃ এর হাত থেকে বাঁচার জন্য এবং বাংলায় প্রভুত্ব করতে গেলে এরকম একটা আবহাওয়াকর জায়গার প্রয়োজন ছিল। কেননা নিজ দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে এই অঞ্চলের আবহাওয়ার কিছু সাদৃশ্য মেলে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্য ভুটানরাজ্যের কিছুটা অংশ কেড়ে নিয়ে দার্জিলিং-এর আয়তন বৃদ্ধি ঘটায় এবং পরবর্ত্তীকালে দার্জিলিং জেলার রূপ পায়। সিকিমরাজের দলিলে সই করার একাংশ—"The Governor General expressed his desire for the possession of the hill of Darjeeling on account of its cool climate, for the purpose of enabling the servants of his Goverment, suffering for sickness to avail themselves of its advantages, I, the Sikkim putty Raja, out of friendship for the said Governor General hereby present

Darjeeling to the East India Company, that is all the land south of the Great Rangeet river, east of the Balasun, Kahail and little Rangeet rivers and west of Rungpo and Mahanadi river." দার্জিলিং জেলা ইংরাজদের অধিগ্রহণের এই হোল প্রথম এবং প্রামাণ্য ইতিহাস। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দার্জিলিং হস্তগত করে যখন এর সামগ্রিক উন্নয়নের কাজে হাত দেয়, তখন উন্নততর জীবনধারণের আশায় নেপালী, ভুটানী এবং সিকিমীরা দলে দলে আসতে থাকে ফলে এখানকার আদিম অধিবাসী লেপচারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। দার্জিলিং জেলার অধিবাসীদের মধ্যে রাজবংশী সম্প্রদায় এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই সম্প্রদায় মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীভুক্ত এবং মেচ নামে অভিহিত। মেচরাজা বাণেশ্বর বর্ত্তমান পজ্ঞাবাড়ির কাছে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব পল্লীগীতি, গাঁথা, পাঁচালী গান উত্তরবঙ্গের এক অমূল্য সম্পদ। বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গান মুখ্যতঃ রাজবংশীদেরই অবদান। এদের উপাস্য দেবদেবীর মধ্যে প্রধানা হলেন বিষহরি বা মনসাদেবী। তরাই অঞ্চলে মধ্যপ্রদেশের আদি অধিবাসী মুণ্ডা, ওঁরাও, কোরোয়া প্রভৃতির উপাস্য দেবতা সূরযনারায়ণ বা সূর্য্য। সেজন্য কোন পূজাবিধি প্রচলিত নেই। সিংবোঙা বা বীরহড় নামে যে দেবতার উল্লেখ আছে তা বস্তুতঃ মাঠের ও বনের দেবতা। নেপালী হিন্দুরা শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত। আর্য্য-সভ্যতা যখন সিন্ধুনদের অববাহিকা ধরে উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করতে থাকে—তখন প্রাগার্য্য জাতিসমূহের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে পরাস্ত জাতিসমূহ আর্য্য সভ্যতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এইভাবে একদা মোঙ্গল বংশোদ্ভূত জাতিগুলিও আর্য্য সভ্যতার নিকট নতি স্বীকার করে। নেপালের পশুপতিনাথের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার পিছনে যে কাহিনী প্রচলিত আছে—সে কাহিনী যুগ যুগ ধরে নেপালী জনসাধারণকে প্রভাবিত করেছে। দার্জিলিং শহর থেকে কিছু দূরে

মহাকালের মন্দির সম্পর্কেও অনুরূপ কিংবদন্তী আছে। কুচুনীপল্লীতে কুচুনী নারীর সঙ্গে শিব যখন প্রণয়লীলায় মত্ত তখন পার্ব্বতী তা জানতে পেরে শিবকে তাড়না করেন। শিব পর্বতগর্ভে অন্তর্হিত হয়ে যান পার্ব্বতীর ভয়ে এবং মহাকাল পর্ব্বতে এসে আবির্ভূত হন। দার্জিলিং-এর জনসাধারণ মহাকাল মন্দিরে গিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আজও শিবার্চনা করেন। এখানে তিব্বতীয়দের একটি প্রাচীন বৌদ্ধমঠও ছিল কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নেপালীরা এ অঞ্চল জয় করবার পর ঐ মঠ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পরে পুনর্নির্মিত হয়। বর্ত্তমানে ঐ মঠের মধ্যে পাকা বারান্দাযুক্ত ছোট মন্দিরে মহাকালের মূর্ত্তি অর্থাৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবলিঙ্গটি শ্বেত পাথরের এবং এই মূর্ত্তির পাশে একটি বৌদ্ধ মূর্ত্তিও আছে এবং উভয়মূর্ত্তির মধ্যস্থলে বড় ত্রিশূল প্রোথিত। মহাকাল মন্দিরের কাছেই পাথরের খোদাই করা সুন্দর এক কালীমূর্ত্তি। তাঁর বামপাশে পদ্মের উপর উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি এবং ডানদিকে একটি শিলখণ্ড—যার প্রকাশ বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অবিদিত।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং-এ প্রথম মন্দির শ্রীমন্দির (আলোকচিত্র-১১) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এর আমূল সংস্কার করা হয়। মন্দিরের ভিতরে সুন্দর কারুকার্য্যখচিত দারুবেদীর উপর কালো পাথরের প্রায় ত্থফুট উঁচু বিষ্ণুমূর্ত্তি। চারিহাতে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, মাথার উপর পিতলের দণ্ডযুক্ত ছত্রশোভিত। শোনা যায়, মূর্ত্তি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পাথর ইতালী থেকে আনা হয়েছিল এবং নির্মাণকার্য্যে ২৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল। মূল মূর্ত্তির বামদিকে পিতলের কালীমূর্ত্তি, মাটির গৌর-নিতাইয়ের মূর্ত্তি ও ডানদিকে সিংহাসনে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া পিছনে রয়েছে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গদেবের দণ্ডায়মান মাটির মূর্ত্তি। এই মন্দিরের মধ্যে রয়েছে পাবলিক হল ও কাদীশ্বর পাবলিক লাইব্রেরী।

দার্জিলিং-এর আর এক প্রাচীন মন্দির হলো বড়ীঠাকুর মন্দির।

মন্দিরটি পাকা বারান্দাযুক্ত। মন্দিরের এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটিতে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের শিলামূর্ত্তি, পিতলের নির্মিত গোপাল, দুর্গা প্রভৃতি ছোট ছোট মূর্ত্তি আর একটিতে রয়েছে শুধুমাত্র শিবলিঙ্গ। এই প্রকোষ্ঠের আর এক মণ্ডপে রয়েছে সাদা পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তি ও প্রবেশ দ্বারে সাদা পাথরের কামধেনু। দেওয়ালের গায়ে গণেশমূর্ত্তি ও মহাবীরের মূর্ত্তি রয়েছে। সম্ভবতঃ, রামপ্রসাদ সিং কর্ত্তৃক ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। দার্জিলিং ষ্টেশনের কাছেই ধীরধাম শিব-মন্দিরে ধীরেশ্বর মহাদেবের শিবলিঙ্গ আছে। শিবলিঙ্গের উপরে রূপার তৈরী পাঁচটি মুখমণ্ডল সংযুক্ত। সামনে কালো পাথরের কামধেনু। মন্দিরে পার্ব্বতী, বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, শিব প্রভৃতি পঞ্চদেবতার সাদা পাথরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি ত্রিতলবিশিষ্ট। এ ছাড়া এ শহরে রয়েছে অগণিত বৌদ্ধবিহার—তামাং বৌদ্ধবিহার, গন্ধমাদন বৌদ্ধবিহার, ভুটিয়াবস্তি বৌদ্ধবিহার (আলোকচিত্র ১২) আলুবাড়ী বৌদ্ধবিহার প্রভৃতি। সমগ্র ভারতবর্ষে তখন বৌদ্ধধর্মের প্লাবন।

'পূর্বে observatory পাহাড় বৌদ্ধ বিহার শোভিত ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গুর্খা সৈন্যদের অত্যাচারে তা বিধ্বস্ত হয়। পরবর্ত্তীকালে অবশ্য পুনরায় নির্মাণ করা হয় তবে তা ঐ পাহাড়ের অনেক নীচে ভুটিয়াবস্তিতে। কিন্তু ভাগ্যের বিপর্য্যয়, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে তা বিনষ্ট হলে বর্ত্তমান সুদৃশ্য বিহারটি নির্মাণ হয় সিকিমের মহারাজার বদান্যতায়। ঘুম অঞ্চলের বৌদ্ধবিহার পীত জাতীয় লামা-গণ কর্ত্তৃক পূজিত। বিহারের বৌদ্ধ মূর্ত্তিটি মৈত্রেয় বুদ্ধ বলে আখ্যাত। এই বিহারটিও ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু লামাগণ তাকে আবার পুনরোজ্জীবিত করে তোলে। বিহারে বিহারে ধ্বনিত হয় বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। জজবাজারের কাছে নেপালীদের জন্য তৈরী হয় তামাং বৌদ্ধবিহার ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে (আলোকচিত্র—১৩)। একদা এই পথ দিয়ে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতে এক বাঙালী ভিক্ষু এগিয়ে গিয়েছিলেন তুষারঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে। তিনি অতীশ দীপংকর। তারও

অনেক আগে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং এখানে এসে পবিত্র করে তুলেছিলেন গিরিরাজ্যগুলিকে।

উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে সারা দার্জিলিং জেলায় অনেকগুলি ইউরোপীয় উপাসনাগার তৈরী হয়েছিল। তৈরী হয়েছিল মুসলমানদের মসজিদ—জুম্মামসজিদ ও ছোট মসজিদ।

আর্য্য সভ্যতার পূর্বেও বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তে যে একটি সভ্য ও কৃষ্টিসম্পন্ন জাতির অস্তিত্ব ছিল এবং আর্য্য-সম্প্রদায় থেকে তাদের জীবন-যাপন প্রণালী যে কোন অংশেই হীন ছিল না, তা জাতিগত বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। মেচ বা তৎকালীন অনুন্নত জাতিগুলির সম্পর্কে আর্য্য-আগন্তুকদের প্রথম সম্পর্ক স্থাপন বিরোধের মাধ্যমে। ক্রমে আর্য্য-ভাষা ও সংস্কৃতি দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক ভাষাগুলিকে খর্ব করেছিল এটাও সহজে অনুমান করা যায়। বর্ত্তমানে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, সিপাইধুরা, গাড়িধুরা প্রভৃতি নামের সঙ্গে দ্রাবিড় সভ্যতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গুড়ি শব্দের অর্থ গুলি বা সমষ্টি—ধুরা শব্দে পাহাড়ে ওঠার পথ প্রভৃতি। সুতরাং দ্রাবিড় সভ্যতার প্রথম আলোকে উদ্ভাসিত শিলিগুড়ি—অনন্ত শিলাসমষ্টি। আবার অনেকে দাবী করেন যে কোন এক মেচ রাজা, মতান্তরে, রাজা বাণেশ্বর দ্রাবিড় আক্রমণের ভয়ে পঙ্খাবাড়ির কাছে যে গড় নির্মাণ করেছিলেন তার থেকেই শিলিগুড়ি নামের উৎপত্তি। পাহাড়ীগড় বা শিলাগড় থেকে এসেছে শিলিগুড়ি। শিলিগুড়িতে পুরাকীর্ত্তির তেমন কোন সন্ধান মেলে না। একমাত্র প্রাচীনতম লাইব্রেরী হরিহর মজুমদার লাইব্রেরী। দেশ বিভাগের পর শিলিগুড়ি শহর ও গ্রামাঞ্চল পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে উদ্বাস্তু আগমনে। শিলিগুড়িতে তখন রাজবংশীদের বসবাস। নবাগতরা এদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। রাজবংশীদের উপাস্য দেবদেবীর মধ্যে প্রধানা হলেন মনসাদেবী ও বিষহরি। ইনি যে শুধুমাত্র সর্পাতঙ্কই দূর করেন না, ইনি সকল রকম ব্যথা, যন্ত্রণা, পীড়া নিরাময় করেন—এ ধরণের বিশ্বাস তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। গ্রামের মঙ্গলের জন্য

থাকেন গ্রামঠাকুর। তাই রাজবংশী মেয়েরা মাটিগোবর দিয়ে গ্রাম-ঠাকুরের মূর্ত্তি নির্মাণ করেন। পায়রা ও ছাগ বলি দেওয়া হয় পূজা উপলক্ষ্যে। নারীপুরুষের নৃত্যানুষ্ঠান চলে সাড়ম্বরে। কার্শিয়াং শব্দটি ভুটানী এবং অর্থ হল কুরচি ফুল। নেপালী উচ্চারণ খরসাং যদিও এর অভিধানগত কোন অর্থ নেই। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কার্শিয়াং-এ একদা ভুটানী প্রতিপত্তি ছিল তার প্রমাণ হিসাবে সিভোক (সব্বক), লিশ, ঘিস, চেল প্রভৃতি নদীগুলির নামের সাথেই পরিস্ফুট। কার্শিয়াং-এর আদিমতম হোল একটি স্কুল—ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুল (১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ)। এ ছাড়া আছে আবাসিক বিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি। কার্শিয়াং-এর "রাজ-রাজেশ্বরী" বাড়িটি নেপালী ও বাঙালী সংস্কৃতির পীঠস্থান।

মুর্শিদাবাদ

ঐতিহাসিক বিচারে মুর্শিদাবাদ একটি ইতিহাস। স্বাধীনতার রক্তে রাঙ্গা মুর্শিদাবাদ ইতিহাসের পাতায় এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই জেলার নামকরণ নিয়ে প্রচুর মতবিরোধ আছে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন মুর্শিদকুলী খাঁর নাম থেকেই জেলার নাম হয় মুর্শিদাবাদ। আবার কেউ বলেন মুর্শিদাবাদের নামকরণ হয়েছে নানকপন্থী সাধু মুকস্সূদন দাসের নাম থেকে। গৌড়ের নবাব হোসেন শাহ একসময় খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন সেই সাধু অলৌকিক যোগবলে নবাবের প্রাণ রক্ষা করেন। নবাবও প্রীত হয়ে সাধুকে এই অঞ্চলে এক নিষ্কর জমি দান করেন। সেই সাধু মুকস্সূদনের নাম থেকে জায়গাটির নাম হয় মুকস্সূদাবাদ। কালক্রমে, লোকমুখে এই নাম পরিবর্ত্তিত হতে হতে মুর্শিদাবাদে পরিণত হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, চূণাখলির মুকস্সুদ আলীর নাম থেকেই মুর্শিদাবাদ নামকরণ হয়েছে।

মুর্শিদকুলী খাঁ ছিলেন বাংলার সুবাদার ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুশ্বানের দেওয়ান। ঢাকা তখন বাংলার রাজধানী। ঔরঙ্গজেব স্বয়ং মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, কেন না কুলী খাঁ জানেন কি ভাবে নবাবের রাজস্ব আদায় করতে হয়। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর খবর পেয়ে যখন আজিমুশ্বান দাক্ষিণাত্যে চলে যান তখন মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনকার্য্য কার্য্যতঃ চালাতে থাকেন। মুর্শিদকুলী খাঁর পর বাংলার নবাব হন তাঁর জামাতা সুজাউদ্দৌলা তারপর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ। সরফরাজকে পরাজিত করে তাঁরই আশ্রিত আলিবর্দ্দি খাঁন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনভার দখল করে নেন। ঠিক এই সময় থেকেই বাংলা দেশে ইংরাজ শক্তি অনুপ্রবেশ করতে থাকে। আলিবর্দ্দি বুঝেছিলেন যে কোন ক্রমেই ইংরাজশক্তিকে

প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। তাই মৃত্যুর পূর্ব্বে দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলাকে সেই মত উপদেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু অস্থির মস্তিষ্ক বিলাসপ্রিয় সিরাজের পক্ষে ইংরাজকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেতন-ভোগী কর্মচারী ক্লাইভ শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ইনি পরে লর্ড ক্লাইভ বলে ইতিহাসে বিদিত। লর্ড ক্লাইভ ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন পুরুষ। তাই মুর্শিদাবাদের নবাবী গ্রহণ না করে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সিরাজউদ্দৌলার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের গদিতে বসান কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ইংরাজদের অর্থলালসা মীরজাফরের পক্ষেও মেটানো সম্ভব হয়নি। ফল যা হবার তাই হোল। অর্থাৎ মীরজাফরকে গদির মায়া ত্যাগ করতে হোল আর তাঁরই জামাতা মীরকাসিম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। মীরকাসিম ইংরাজদের চরিত্র সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ক্ষমতা দিয়ে ইংরাজদের হঠাতে না পারলে বাংলার দুর্যোগের আকাশ কোনদিনই কাটবে না। যতখানি সম্ভব তিনি বিদেশী কায়দায় সেনাগণকে শিক্ষিত করে তুলতে লাগলেন। কিন্তু ইংরাজদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হোল না। মীরকাসিমের মতিগতি বুঝতে পেরে ইংরাজরা আবার মারজাফরকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসান এবং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনের নামে শোষণ করতে থাকে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে যখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনভার পড়ল তখন তাঁরা মোগল আমলের চাক্‌লা ও পরগণাভিত্তিক শাসন বাতিল করে বিভাগ ও জেলাভিত্তিক শাসনের প্রবর্ত্তন করেন। কাজেই বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ অঞ্চলটিকে একটি জেলার রূপ দেওয়া হয়। ১৭৭৪ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। দেখতে দেখতে মুর্শিদাবাদের খ্যাতি ম্লান হয়ে এলো। রাজধানীরূপে মুর্শিদাবাদের খ্যাতি মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দীর। এই পঞ্চাশ ষাট বছরের ইতিহাস...

এই পঞ্চাশ ষাট বছরের ইতিহাসে মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ ও মসজিদে পরিপূর্ণ। তবে মন্দিরের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। ইমামবাড়া, খোশবাগ, মোবারক মঞ্জিল, মতিঝিল, চাঁদ্‌নীর বড় মসজিদ (আলোকচিত্র-১৪) দেখে যেমন দর্শকরা বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারে না তেমনি হিন্দুমন্দিরের রত্নেশ্বরের শিবমন্দির (আলোকচিত্র-১৫) এবং আদিনাথের মন্দিরের (আলোকচিত্র-১৬) পাশাপাশি অবস্থান দেখে কম কৌতূহলের সৃষ্টি করে না। রত্নেশ্বরের শিবমন্দির পোড়ামাটির অলংকরণ-সমৃদ্ধ। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে মন্দিরের গায়ে অলংকরণের মাধ্যমে। এ ধরনের অলংকরণসমৃদ্ধ মন্দির গোটা মুর্শিদাবাদ শহরে আছে কিনা সন্দেহ। জৈনদের মন্দির আদিনাথের মন্দির। মোটামুটিভাবে মুর্শিদাবাদের নবাবী বংশের একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে।

মুর্শিদকুলি খাঁন
সুজা-উ-দ্দিন
সরফরাজ খাঁন
আলিবর্দি খান
সিরাজউদ্দৌলা
মীরজাফর
মীরকাসিম আলি
মীরজাফর (২য়)
নাজিমউদ্দৌলা
সাফিউদ্দৌলা
মোবারকউদ্দৌলা
বাবর জঙ
আলি ঝা
ওলা ঝা
হুমায়ুন ঝা

ফেরাহুন ঝা

নবাব বাহাদুর স্যার সৈয়দ হোসেন আলি মির্জ্জা

মুসলীম প্রভাবিত মুর্শিদাবাদে সামগ্রিকভাবে হিন্দুমন্দিরের সংখ্যা নিতান্তই অল্প তাই পুরীর জগন্নাথদেবের গগনচুম্বী মন্দিরের মত সৌধের কথা ভাবা উচিত হবে না। তবে কাশিমবাজারের মহারাজা, নসীপুরের রাজাবাহাদুর, রাজা এ এন. রায় এমনকি বিত্তবান ব্যক্তিদের বাসস্থান সংলগ্ন রাজবাড়ীর সংখ্যা খুব কম নয়। আজিমগঞ্জে জৈন পরিবারের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির দেখা যায়। বড়নগরে ভবানীশ্বরের শিবমন্দির (আলোকচিত্র-১৭) দ্বাদশ মূর্তিবিশিষ্ট, ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বারো লক্ষ টাকা ব্যয়ে নাটোরের রাণী ভবানী কর্তৃক নির্মিত। বড়নগরকে বাংলাদেশের কাশী বলা হয়। জিয়াগঞ্জের পুরাতন নাম গাণ্ডীলা। এটি ছিল জৈনধর্মাবলম্বীদের আশ্রয়স্থল। বৈষ্ণবরাও পরবর্ত্তীকালে এখানে তাঁদের মঠ নির্মাণ করেছিলেন।

মুর্শিদাবাদের বর্তমান রাজপ্রাসাদ হাজারদুয়ারী নামে খ্যাত। এর নির্মাণকাল ব্রিটিশ আমলে, নবাবী আমলে নয়। নির্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন ঝা'র আমলে। এই সুরম্য-সুবিশাল প্রাসাদে অসংখ্য মূল্যবান চিত্র ও সুদৃশ্য আসবাবপত্র আছে। নীচের তলায় তখনকার সময় ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষিত। নবাবী আমলে যে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল তা ইমামবাড়া বলে একদা পরিচিত ছিল। বর্তমান প্রাসাদের উত্তরে ইমামবাড়া সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এর নির্মাণকার্য্যের জন্য কেবলমাত্র মুসলমান মিস্ত্রীদের ডাকা হয়েছিল এবং সিরাজ নিজহস্তে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এই সৌধের মধ্যস্থলে মেদিনা অবস্থিত। এই মেদিনার জন্য যে স্থান ছ' ফুট নীচু করা হয়েছিল সেই স্থান মক্কা থেকে মাটি এনে ভরাট করা হয়। পূর্বে মজলিস ঘর, পশ্চিমে ইমানের গম্বুজ সোনা, রূপা, মূল্যবান বিভিন্ন কাচ-কাঠ দিয়ে মণ্ডিত এবং উপরে শতাধিক পতাকা। মহরম উৎসবের আলোকসজ্জার জন্য উত্তর ও দক্ষিণের ঘর

ব্যবহৃত হোত। দ্বিতীয় তলের ঘরগুলিতে মাইকার উপর নানাবিধ ফুল, পশুপাখি ও মানুষের প্রতিকৃতি। উত্তর দক্ষিণের ঘরে কতকগুলি মূর্ত্তি দেখা যেত। মুখমণ্ডল মনুষ্যাকৃতি কিন্তু দেহ ময়ূরের—ঢাল, তরবারি এবং ছুরি শোভিত এর লেজ ছাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এই প্রাসাদের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। ১৮৪২ ও ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিরাট অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। কেবলমাত্র মেদিনা রক্ষা পেয়েছিল এবং বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদে স্থাপিত। এই বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ ইমামবাড়ার অনুকরণে নির্মিত। এই রাজপ্রাসাদের পশ্চিমে একটি হিন্দুমন্দির ছিল এবং সম্ভবতঃ মুসলীম যুগে তা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় এবং মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদ নির্মাণ করতে ছ' লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং নির্মাণকার্য্যে নিযুক্ত নৃপতিদের একটি করে শাল উপহার দেওয়া হয়। শোনা যায়, মনসুর আলি কিছুদিন এই মসজিদে ঈদ নামাজ পাঠ করেছিলেন।

আরঙ্গাবাদ গ্রামের নামকরণ হয় দিল্লীর বাদশাহ আরঙ্গজেবের নামানুসারে। বাদশাহ আমলে এখানে একটি সরাইখানা ও সেনানিবাস ছিল। খননকার্য্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে কারুকার্য্যখচিত অনেক-গুলি ইট, বাদশাহী আমলের বহু আসরফী। এছাড়া গ্রামের কয়েকটি স্থান থেকে হাতীর হাড়, সেপাইদের জলপানের জন্য ইন্দারার সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যে ব্রহ্মামন্দির, রাধাগোবিন্দ মন্দির ও ছোটখাট পাঁচটি শিবমন্দির আছে।

অমরকুণ্ডের গ্রাম্যদেবতা গঙ্গাদেবী ও আদিত্যের মন্দির ছাড়া ভগ্নপ্রায় বাসুদেব, কাত্যায়নী ও নারায়ণের শিলামূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ পালরাজগণের সময় এই শেষ মূর্ত্তি দু'টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তরে আরেকটি ভগ্নপ্রায় মন্দিরে কষ্টি পাথরের শিবলিঙ্গ আছে। এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারে একটি প্রকাণ্ড পাথর খোদিত দরজার চারিপাশে চৌকাঠ বেষ্টিত। এই গ্রাম একদা বর্গিদ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং এখানকার নিপীড়িত জনগণ পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।

কিরীটেশ্বরী একান্ন পীঠের অন্যতম। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহ একান্ন অংশে বিভক্ত হয়ে ভারতের নানাস্থানে পতিত হয়েছিল। কিরীটেশ্বরী পীঠে সতীর কিরীটের এক কণামাত্র পড়েছিল বলে প্রবাদ আছে। এই পীঠস্থানের দেবী বিমলা ও ভৈরব সম্বর্ত্ত নামে খ্যাত।

"ডিহি কিরীটেশ্বরী মধ্যে কিরীটেশ্বরী গ্রাম।
মহাপীঠ হয় সেই মহামায়ার ধাম॥"

সম্ভবতঃ, কিরীটেশ্বরী মন্দির পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্মিত হয়েছিল। পরে বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ এই মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন। সয়ের-উল-মুতাক্ষারিণে লেখা আছে যে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত নবাব মীরজাফরকে মৃত্যুর পূর্ব্বে মহারাজা নন্দকুমার কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়েছিলেন। এই মন্দির পশ্চিমমুখী; মন্দিরের মধ্যে কোন প্রতিকৃতি নেই, কেবল একটি উচ্চ প্রাচীর বেদী আছে। উচ্চ প্রাচীর বেদীর উপর আরও একটি বেদী আছে এবং এইটিই দেবীর কিরীটরূপে পূজিত হয়। এর মধ্যে দক্ষিণদিকের মন্দির রাজা রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত। কিরীটেশ্বরীর ভৈরব বলে যে মূর্ত্তি পূজা করা হয় তা প্রকৃতপক্ষে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি।

মুর্শিদাবাদ নবাবদের পতনদশায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজের অধিকার বজায় রাখবার জন্য বহরমপুর বা ব্রহ্মপুরে সৈন্যসামন্ত মোতায়েন রাখত। বর্ত্তমানে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলার সদর ও প্রধান শহর। এই জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করুণাময়ীকালী বিশেষ জাগ্রত দেবী বলে জনসাধারণের বিশ্বাস। দেবীর বর্ত্তমান মন্দিরটি ও তৎসংলগ্ন অতিথিশালা লালগোলার রাজপরিবার কর্ত্তৃক নির্মিত। উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরে চারহাত বিশিষ্ট দেবীর অর্দ্ধাঙ্গ মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। মন্দিরের মধ্যেই দেবীর ভৈরব মহাকাল শিবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শোনা যায়, কালাপাহাড় যখন দক্ষিণ ভারতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির ধ্বংস করছিলেন তখন জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁর হাত থেকে করুণাময়ীকে রক্ষা করার জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে মূর্ত্তিটিকে

উড়িষ্যায় আনয়ন করেন এবং পুরী যাবার পথে মূর্ত্তিটিকে আর রক্ষা করা যাবে না ভেবে নদীতে নিক্ষেপ করেন এবং জলপ্রবাহে মূর্ত্তিটি বিষ্ণুপুরের শ্মশান ঘাটে এসে উপস্থিত হয়। দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর্য্যের সঙ্গে বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তিটির সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত জয়পুরে "নাককাটা" গ্রামে কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গেছে। মূর্ত্তিটির আকৃতি বিশ্লেষণ করে বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি মূর্ত্তির অন্যতম উপেন্দ্রমূর্ত্তি বলে অনুমান করা হয়েছে। চারহাত বিশিষ্ট এই মূর্ত্তির ডানে শঙ্খ ও গদা এবং বামে পদ্ম ও চক্র বিদ্যমান। এই মূর্ত্তির ডানপাশে লক্ষ্মীদেবী ও বামপাশে বীণাবাদনরতা সরস্বতীদেবীর মূর্ত্তির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। উপরে ও নীচে বিষ্ণুর নানা প্রকার লীলাবিষয়ক দৃশ্য খোদিত তবে মূর্ত্তিটির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

রূপপুর গ্রামে রুদ্রদেবের মন্দির বাংলা ১৩০১ সনে নির্মিত। এটি দক্ষিণমুখী এবং সম্মুখে বারান্দাযুক্ত একটি সাধারণ পাকা দালানঘর মাত্র। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি বেদীর উপর প্রায় দেড়ফুট উঁচু ও একফুট চওড়াবিশিষ্ট কালো পাথরের খোদিত ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠিত আছে। প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বুদ্ধদেব যোগাসনে উপবিষ্ট, মূর্ত্তিটির ডান হাত নাভিমূলে এবং বাম হাত ভূমিস্পর্শিত। এই বুদ্ধ মূর্ত্তিই এখানে রুদ্রদেব নামে খ্যাত এবং শিবের ধ্যানে পূজিত। মন্দিরে রুদ্রদেবের মূর্ত্তি ব্যতীত দারুময় বাণেশ্বর মূর্ত্তি এবং মূল মন্দিরের দু'পাশে মোট চারটি চারচালার শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরগুলিতে গৌরীপট্টযুক্ত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে বাংলার ১৩৩০ সনে মন্দিরটিকে সংস্কার করা হয়; তবে প্রথম কবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা জানা যায় না। সম্ভবতঃ, রাজপরিবার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকের মন্দিরের বাইরের গায়ে ও প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে লতাপাতা, ফুল, আশ্বারোহী ও থামের আকৃতি এবং অপর তিনদিকে রামায়ণ কাহিনীর বিভিন্ন দৃশ্যসম্বলিত অপূর্ব্ব

পোড়ামাটির কাজ দেখতে পাওয়া যায় যদিও কালের প্রভাবে প্রাচীন শিল্প সৌন্দর্য্য বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গেছে।

মুর্শিদাবাদে মুসলমান নবাবদের কীর্ত্তি যত্রতত্র। মুর্শিদাবাদ থেকে দু'মাইল দূরে খোসবাগ। আলিবর্দি খান ও তাঁর পরিবারের স্মৃতি-সৌধ এখানে বিরাজমান। নবাব রাজপ্রাসাদের বিপরীত দিকে সুজা-উদ্দিন খান ও সিরাজউদ্দৌলার কীর্ত্তিস্তম্ভ শোভিত রোসনি বাগ বা গার্ডেন অব লাইট। আরও অন্যান্য কীর্ত্তিস্তম্ভের মধ্যে আলিবর্দি নির্মিত একটি মসজিদ উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদকুলি খানের আদেশক্রমে নির্মিত হয় কাট্রা মসজিদ। শুধু প্রার্থনাগৃহ নয়, নবাবদের সাময়িক বসবাসের জন্যও ব্যবহৃত হোত। বর্ত্তমানে এই মসজিদের অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ। কথিত আছে, মক্কার অনুকরণে এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

মুকস্থুদাবাদ যখন অবাঞ্ছিত গ্রাম ছিল তখন জঙ্গীপুরে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে, খারিয়াতে এবং এক্না চাঁদপুরে একটি করে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এক আনার পরিবর্তে পাওয়া এই এক্না চাঁদপুর সৈয়দ শরীফ মুখী কর্ত্তৃক তৈরী। ইনিই পরবর্তীকালে হোসেন শাহ বাদশাহ বলে বিদিত এবং ১৪৯৮ থেকে ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন।

মুর্শিদকুলি খান যখন ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে যে কয়েকজন কর্মচারী ওধনী ব্যবসায়ী এসেছিলেন তার মধ্যে জগৎ শেঠের নাম উল্লেখযোগ্য। জগৎ শেঠ ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়—এটি একটি উপাধিমাত্র। তাঁর আসল নাম ফতে চাঁদ। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ তাঁকে এই উপাধিতে সম্মানিত করেছিলেন এবং এই জগৎ-শেঠের আদি বাসস্থান ছিল যোধপুরে। জগৎ শেঠ মুর্শিদাবাদে টাকশাল স্থাপিত করে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। তাঁর প্রাসাদের বিশালতা ও শিল্প সৌন্দর্য্য একদিন দর্শকমাত্রকেই অভিভূত করেছিল কিন্তু বর্ত্তমানে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই জেলার রাঙামাটি গ্রামের কাছে কর্ণস্থবর্ণ ছিল মহারাজা শশাঙ্কের রাজধানী। রাঙা-

মাটির বেশীরভাগ আজ ভাগীরথী নদী গ্রাস করেছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে এসেছিলেন। তিনি এখানকার সংঘারামগুলিতে দু'হাজার বৌদ্ধ শ্রমণকে বসবাস করতে দেখেছিলেন। এই কর্ণসুবর্ণে গুপ্তবংশীয় রাজারা বহুদিন রাজত্ব করেছিলেন। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুপ্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের স্তূপ থেকে বহু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গেছে। হয়তো এখানকার মাটি খুঁড়লে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য জানা যেতে পারে। পরবর্তীকালে পাল-সেন যুগেও এই অঞ্চল সমৃদ্ধশালী ছিল। মোগল আমলে মুর্শিদাবাদ নূতন করে জেগে ওঠে এবং বাংলার রাজধানী হবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করে।

নদীয়া

নদীয়ার উৎপত্তি-ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই। মৌর্য্য এবং গুপ্তযুগের কোন নিদর্শন নদীয়ায় পাওয়া যায় না। তবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের যে স্বাধীন বঙ্গরাজ্য গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে এই জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বিশ্লেষণে নদীয়া জেলা শশাঙ্কের রাজ্যের সীমানার মধ্যে ছিল। পালরাজারা বাংলাদেশে প্রচুর বিহার সংঘারাম নির্মাণ করেছিলেন কিন্তু নদীয়ায় তার তেমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে লক্ষ্মণসেনের রাজধানীর নাম ছিল নূদীয়া। এই নূদীয়াই যে নবদ্বীপ বা নদীয়া তাতে কোন সন্দেহ নেই। নদীয়ার ইতিহাস বিশেষ করে অতীত ইতিহাস খুবই গৌরবোজ্জ্বল। এই নদীয়াতেই একদিন বাংলার স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তমিত হয়েছিল। যখন লক্ষ্মণসেন এই নবদ্বীপে বসবাস করেছিলেন তাঁর অশীতিতমবর্ষে, তখন তুর্কী নায়ক মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করেন চৌহানবীর পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে। এই সময় তাঁর সেনানায়ক বক্তিয়ার খিলজী নদীয়া আক্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায় তবে এর পেছনে ঐতিহাসিক যুক্তি কতখানি আছে শোনা যায় নি। যুক্তিদ্বারা বঙ্কিমবাবু বলেছেন যে তুর্কী সৈন্যের পক্ষে তখন বাংলা আক্রমণ বা দখল করা সম্ভব হয় নি। এ ঘটনার ঠিক চারশো বছর পর বাংলার বারোভুঁইয়ার অন্যতম ভুঁইয়া রাজা প্রতাপাদিত্য যখন দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন তখন মানসিংহ সদলবলে প্রতাপাদিত্যকে বশীভূত করার জন্য নদীয়ায় এসে হাজির হন। হয়তো একা মানসিংহের পক্ষে প্রতাপাদিত্যকে দমন করা সম্ভব হোত না যদি না ভবানন্দ রায় মানসিংহকে সাহায্য করতেন। এই ভবানন্দ রায়ই নদীয়া জেলায় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। শুধু নদীয়া কেন, সমগ্র বাংলাদেশ কখনও মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তা সুনির্দ্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়

নি। একমাত্র উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার মহাপ্রস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্য্যযুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত লিপি ভিন্ন এ বিষয়ে আর কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি। গুপ্তযুগের নিদর্শন নদীয়া জেলায় কিছু পাওয়া না গেলেও সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় বাংলাদেশ (বঙ্গদেশ) গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীনে আসে। ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে একটি স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্ত্তমান নদীয়া জেলা এই বঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে মনে হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে মহারাজা শশাঙ্ক কর্ণস্মুবর্ণকে রাজধানী করে গৌড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ, নদীয়া জেলা তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভবানন্দের বংশধর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় যখন নদীয়ার সিংহাসনে সেই অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বাংলার নবাব সিরাজের চরম পরাজয় ঘটে ক্লাইভের হাতে পলাশীর প্রান্তরে। নদীয়াতে যে রাজবংশ রাজত্ব করতেন তাঁদের আদিবাস ছিল মাটিয়ারীতে। এই রাজবংশের রাজা রাঘব মাটিয়ারী ছেড়ে কৃষ্ণনগরে এসে বসবাস করতে থাকেন, যা পরে রাজধানীতে পরিণত হয়। এই বংশের রাজা রঘুরাম রঘুবীর নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর পুত্রের নাম মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি লর্ড ক্লাইভের কাছে যে কয়েকটি কামান উপহার পেয়েছিলেন তা আজও কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে। কৃষ্ণচন্দ্রের পর থেকেই এই বংশের প্রতিপত্তি কমতে থাকে। ১৭৭২ সালে নদীয়া প্রথম জেলা বলে গণ্য হয়। তখন প্রেসিডেন্সী বিভাগকে বলা হোত নদীয়া বিভাগ। ১৮৬০ সালে নদীয়া বলে একটি ছোট জেলার সৃষ্টি করেন তদানীন্তন ছোট লাট গ্রাণ্টসাহেব। অবশেষে, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরে প্রায় অর্ধাংশ নদীয়া জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন র‍্যাডক্লিফ। নদীয়া জেলার বেশীর ভাগ অঞ্চল পলিমাটিতে তৈরী, তবে উত্তরদিকে মুর্শিদাবাদ থেকে নেমে আসা অল্প কালচে রঙের ভূ-ভাগকে বলা হয় কালান্তর অঞ্চল। বর্ত্তমানে এ জেলার দুটি মহকুমা—কৃষ্ণনগর এবং রাণাঘাট।

নদীয়া জেলা অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিদ্যাচর্চার জন্য সারা বাংলাদেশের কাছে এক বিশেষ শ্রদ্ধার্হ ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করেছে বহুকাল ধরে। তার স্মৃতি, ন্যায়, তার বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনা শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা ভারতের গৌরবের বস্তু। প্রাক্ পাল-সেন যুগের সভ্যতার নিদর্শন নদীয়া জেলায় চোখে না পড়লেও পাল-সেন যুগের কিছু কিছু পাথরের মূর্ত্তি, ধাতুমূর্ত্তি, তাম্রশাসনের নিদর্শনের অভাব নেই। বল্লালসেনের বল্লালঢিবির ঐতিহ্য আজও নদীয়ায় অটুট তবে একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে এই জেলায় পাল-সেন যুগে কোন মন্দির নির্মিত হয় নি। অন্যান্য জেলার মত এখানেও মন্দির নির্মাণ-শৈলীতে বাংলারীতি অনুসৃত। বিভিন্ন মন্দিরে পোড়ামাটির ভাস্কর্য্যের প্রধান বিষয় বস্তু কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণুর দশাবতার, পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং সামাজিক দৃশ্য। 'প্রস্তর ও ধাতুর মূর্ত্তি নির্মাণ ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং অর্থশালী ব্যক্তিগণই এই সমুদয় প্রতিষ্ঠা করতেন। শিল্পীগণও এই সম্প্রদায়ের আদেশে এবং শাস্ত্রানুশাসন ও লোকাচারের নির্দ্দেশমত মূর্ত্তি প্রস্তুত করতেন। এতে তাঁদের শিল্পরচনার শক্তি ও স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হোত। বিশেষতঃ, এই শিল্পীগণ তাঁদের অনুগ্রহে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন; শিল্পের সৌন্দর্য্যবোধ অপেক্ষা ধর্মনিষ্ঠাই ছিল তাঁদের মনে অধিকতর প্রবল সুতরাং বাংলার এই শিল্পীগণের পরিস্থিতি প্রকৃত শিল্পের উৎকর্ষের অনুকূল ছিল না; তা সত্ত্বেও, তাঁরা যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে প্রমাণিত হয় যে তাঁদের মধ্যে শিল্পের একটি সহজ ও স্বাভাবিক অনুভূতি ছিল। ধনী ও অভিজাতবর্গের অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিস্ফুট এই সমুদয় শিল্পীর রচনা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মনোরঞ্জন ও প্রয়োজনের অনুকূল হত।' (রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস)।

কৃষ্ণনগর থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে দেবপল্লী বা দেপাড়া। এই স্থান নৃসিংহের মন্দিরের জন্য উল্লেখযোগ্য। পথের পাশে জঙ্গলাবৃত উঁচু

ভূখণ্ডের একাংশে নৃসিংহদেবের মন্দির। মন্দিরটি অতি প্রাচীন। মন্দির প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ ভাঙা পাথর ও ইট দেখতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, বহুপূর্ব্বে এই মন্দিরটি খুবই বৃহৎ ছিল। এরই ধ্বংসাবশেষের উপর বর্ত্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। প্রাঙ্গণের একদিকে কয়েকটি কালো ও ধূসর রঙের বেলে পাথর পড়ে থাকতে দেখা যায়। তারমধ্যে অনেকগুলি অতি প্রাচীন ও কারুকার্য্যখচিত। নৃসিংহদেবের মুর্ত্তি একটা বড় কষ্টি পাথরের উপর খোদিত—উচ্চতা প্রায় চারফুট হবে। পদতলে প্রহ্লাদ ও কোলে হিরণ্যকশিপু অবস্থিত। বহুস্থানেই মূর্ত্তিটির অঙ্গহানি হয়েছে। কিংবদন্তী, কালাপাহাড়ের অত্যাচারের ফলেই এই মূর্ত্তিটির এরূপ দুর্দশা হয়েছে। মূর্ত্তিটি ভূপ্রোথিত। অনুমান করা যায়, ৭০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান মন্দিরের পাদদেশে লিপিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবো জয়তি
নাগেন্দুগজ ভূশক শ্রীনৃসিংহ পদাশ্রিতঃ।
শ্রীক্ষিতীশো নৃসিংহস্য সংশ্চক্রে মন্দিরং নৃপঃ॥
শকাব্দঃ ১৮১৮।

এই গ্রামের পাশে চামটার বিল থেকে একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত সুন্দর উগ্রতারা মূর্ত্তি পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে চাম্টার বিল কথাটি চামুণ্ডার বিলের অপভ্রংশ. এবং এককালে হয়তো এই বিলের পাশেই চামুণ্ডার মন্দির ছিল।

কৃষ্ণনগরের পূর্ব নাম ছিল রেউই। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বতন পুরুষ মহারাজা রুদ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামানুসারে রেউইয়ের নাম রাখেন কৃষ্ণনগর। নদীয়ার রাজারা আদিশূর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের নেতা কাণ্যকুব্জ প্রদেশের ক্ষিতীশ নামক রাজা পুরভট্টনারায়ণের বংশজ। এর একাদশ পুরুষ পর্যন্ত সম্পত্তি ভোগদখল করেন মোট তিনশো বাইশ বছর ধরে। এই একাদশ পুরুষে কামদেবের জন্ম হয়।

কামদেবের পুত্র ছিলেন বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ রায়ের পুত্র রাজা কাশীনাথ ঘাতকের হাতে নিহত হন। নদীয়া কাহিনী থেকে জানা যায় যে চতুর্বেষ্টিত দুর্গস্বামী, কায়স্থকুলভূষণ রাজা কাশীনাথ রায় মোগলদের পক্ষে পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীকে বাগোয়ান পরগণার জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের শরণাপন্ন হতে হয় এবং রামচন্দ্রের জন্মলাভ ঘটে। রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাস। এই দুর্গাদাসই ভবানন্দ মজুমদার নামে পরবর্তীকালে খ্যাত হন। জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহকে বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করে ভবানন্দ কয়েকটি পরগনা লাভ করতে সক্ষম হন। ভবানন্দের পর গোপাল এবং গোপালের পর রাঘব রাজ্যলাভ করে। রাঘব মাটিয়ারী থেকে রেউই-এ রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং রেউইয়ের নাম পরিবর্ত্তন করে কৃষ্ণনগর রাখেন। বাংলাদেশে কৃষ্ণনগর জগদ্ধাত্রীপূজার আদি পীঠস্থান। তন্ত্রে জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ থাকলেও বাংলাদেশে পূর্বে ব্যাপকভাবে এই পূজার কথা শোনা যায় না। অনেকের মতে, কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই পূজার প্রথম প্রবর্তন করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরীশচন্দ্র কর্তৃক এই পূজা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগর থেকে ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে পূজার যে প্রচলন হয় সে বিষয়ে সকলেই একমত। এই হিসাবে বিচার করে দেখলে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রাচীনত্ব আড়াইশো থেকে তিনশো বছরের বেশী নয়। বিভিন্ন জায়গায় দেবী বিভিন্নভাবে পূজিতা। দেবী চতুর্ভুজা, তবে কোনস্থানে দেবীর বাহন সিংহের পদতলে হাতী, কোনস্থানে কেবলমাত্রই সিংহ আবার কোনস্থানে দেবী প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা এবং তাঁর দু'ধারে দুটি সিংহমূর্ত্তি। কোন স্থানে দেবী সিংহের গায়ে হেলান দিয়ে দণ্ডায়মানা। আবার রাজবাড়ীর জগদ্ধাত্রী সিংহবাহিনী নন, শ্বেত অশ্ববাহিনী। দেবী ঘোড়ার উপর ঘোড়সওয়ারের মত বসেছেন, দেবীর চারহাতে শঙ্খ, চক্র, তীর ও ধনুক। রাজবাড়ী

দরবারকক্ষ, বিষ্ণুমহল ও পূজামণ্ডপ প্রভৃতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালে (১৭২৮-১৭৮২ খ্রীঃ) তৈরী। রাজবাড়ীর মধ্যে পূজামণ্ডপটি পঙ্খের নকাশি অলংকরণে সুসজ্জিত। এত বৃহৎ এবং অলংকৃত পূজামণ্ডপ পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। রাজবাড়ীর মুসলীম স্থাপত্যানুগ চারমিনারবিশিষ্ট তোরণ পথটি বিচিত্র ধরনের। মহারাজা গিরীশচন্দ্র (কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র) ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দময়ীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি চারচালাযুক্ত এবং ৪০ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট। মন্দিরের তিনদিকে দালান সংযোগ করা হয়েছে। মন্দিরের গায়ে কিছু কিছু কারিগরি শিল্পের নিদর্শন মেলে। শয়ান মদাকলের উপর তিনি আসীনা। মন্দিরের আশেপাশে কিছু কিছু শিবমন্দির যেমন আনন্দ শিবমন্দির, চৌধুরীপাড়ায় চারচালা শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য। সেগুলি অলংকার সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু বর্তমানে বিধ্বস্ত।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম নবদ্বীপ হিন্দু তথা বৈষ্ণবদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। এইস্থান শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীগণের বহু দেবালয়ে, মন্দিরে ও আখড়ায় পরিপূর্ণ। নবদ্বীপ বাংলার শ্রেষ্ঠ গৌরবের স্থান। কিন্তু এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তেমন কোন প্রমাণ নেই। এমন কি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে কোন উল্লেখ নেই। খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনরাজগণের বাসস্থানস্বরূপ নবদ্বীপের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই নামকরণ নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন, গঙ্গাগর্ভ থেকে উত্থিত নূতন দ্বীপ নবদ্বীপ, আবার কেউ বলেন, জনৈক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এই দ্বীপে প্রতি রাত্রে ন'টি আলোধার জ্বেলে যোগসাধনা করতেন বলে নবদ্বীপ বা নদীয়া হয়েছে। আবার অনেকের মতে, ন'টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত বলে নাম হয়েছে নবদ্বীপ। নবদ্বীপের উপর যাঁদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ বৈষ্ণবরা এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। সেন রাজাদের সময় থেকেই নবদ্বীপ এক সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয় এবং এখানকার ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্যখ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ

করে। চৈতন্যদেবের আর্বিভাবকালে নবদ্বীপ অতি সমৃদ্ধ এবং জনবহুল ছিল। চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস লিখেছেন ঃ

"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নেই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই।

নবদ্বীপবাসীগণ পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের ও নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার জ্ঞান করতে আরম্ভ করেন। নবদ্বীপধামে একাধারে বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মিলন দেখা যায়, তার ফলে পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মাধর্মীর দেবালয় ও মন্দির গড়ে ওঠে। লর্ড হেস্টিংসের দেওয়ান কান্দিরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নবদ্বীপে এসে বসবাস করেন এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মদনমোহনজীর এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই মন্দিরটি বর্ত্তমান ছিল কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই গঙ্গা গর্ভে নিমজ্জিত হয়। নবদ্বীপে একটি দু'টি নয় প্রচুর শিবলিঙ্গের দর্শন মেলে; বুড়োশিব, যোগনাথ শিব, পাড়ডাঙার শিব, আলোদের শিব, দণ্ডপাণি বালকনাথ এলানে পলকনাথ প্রভৃতি। এই সমস্ত শিবের অধিকাংশেরই খুব প্রাচীনতার জন্য প্রসিদ্ধি; অনেক পুরানো কিংবদন্তী এদের সঙ্গে জড়িত। কেউ কেউ মনে করেন, নবদ্বীপের এই রকম লিঙ্গমূর্ত্তিগুলি প্রাচীন গৃহ মন্দিরাদির ভগ্নাংশ। সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ ধর্মসাধনা কেন্দ্র, স্তূপ, বিহার প্রভৃতির অস্তিত্বের কথা অনুমান করতে চান যে এগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধবিহার, মন্দির প্রভৃতি থেকে সংগৃহীত। বৌদ্ধধর্মের বিলোপের পর এগুলি প্রকল্প ধর্মের রূপ নিয়েছিল। সেন আমলে নব ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুজ্জীবনে সেই ধর্ম শিবে পরিণত হয়। বাংলার গ্রামে গ্রামে অনেক প্রাচীন লিঙ্গ সম্বন্ধে নবযুগের এমন বিচারের কথা শোনা যায়। নবদ্বীপের উপর কালে কালে বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মমতের যে উত্তাল তরঙ্গ বয়ে গেছে তার কথা বিচার করলে এই রূপান্তরের যুক্তিকে অগ্রাহ্য করা শক্ত। পাড়ডাঙ্গার শিব হাত-পাহীন কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ড। এই শ্রেণীর মূর্ত্তিগুলি শূন্যজ্ঞাপক ও

অতি প্রাচীন। এই প্রকারের মূর্ত্তি ঐতিহাসিকগণের মতে সম্রাট অশোকের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যুগনাথ শিব এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড। এই শ্রেণীর মূর্ত্তিগুলি অতি প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ, হর্ষবর্ধনের সময় স্থাপিত হয়ে থাকবে। এই মন্দিরে একটি ধাতুনির্মিত পদ্মপাণি বুদ্ধের মূর্ত্তি পাওয়া যায়। সমগ্র বাংলাদেশে এ ধরনের মূর্ত্তি পাঁচ ছ'টির বেশী হবে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া ষষ্ঠীঠাকুরাণী নামে ধ্যানস্ত বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যায়। হাত দু'টির জানুর উপর সংস্থাপিত। পা দুটির নীচের দিক কিছুটা অস্পষ্ট। এই মূর্ত্তির দু'পাশে দু'টি সিংহ মুখের চিত্র দেখা যায়। বড় প্রস্তরখণ্ডের একটি হেঁটমুখ দণ্ডধারী পুরুষ বাম উরুর উপর ডান পা স্থাপন করে দণ্ডায়মান। দণ্ডপাণি বলে আখ্যাত হলেও, দেখলে বৌদ্ধ শ্রবণমূর্ত্তি বলে মনে হয়। দণ্ডপাণি শব্দের অর্থ যম বা ধর্মরাজ অর্থাৎ বুদ্ধ। এ সকল কারণে অনেকে একে বুদ্ধমূর্ত্তি বলে ধারণা করেন। বহু পণ্ডিত ও পুরাতত্ত্ববিদের মতে মায়াপুরই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং এই স্থানই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান। প্রাচীন ইতিহাস ও বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত। গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত নবদ্বীপকে তাঁরা প্রাচীন নবদ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্গত কোলাদ্বীপ থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। তাঁদের মতে প্রাচীন নবদ্বীপ নগর গঙ্গার ভাঙ্গনে বিনষ্ট হবার উপক্রম হলে তাঁরা পশ্চিমতীরে চলে আসেন এবং বর্ত্তমান নবদ্বীপধাম গড়ে তোলেন। সেনবংশীয় রাজা বল্লাল সেন গঙ্গাবাসের জন্য নবদ্বীপে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তা ঐতিহাসিক সত্য এবং তাঁর রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও গঙ্গার পূর্বতীরে বিদ্যমান। সুতরাং প্রাচীন নবদ্বীপের অন্ততঃ একাংশ যে মায়াপুরে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মায়াপুর শ্রীশ্রীযোগপীঠ মন্দির বা শ্রীচৈতন্যদেবের মন্দিরের (আলোকচিত্র-১৮) জন্য উল্লেখযোগ্য। মন্দির সুউচ্চ এবং দেখতে অতীব মনোরম। রাত্রিকালে মন্দিরের চূড়াগুলি বিচিত্রবর্ণ আলোকের দ্বারা উদ্ভাসিত

করা হয় এবং বহুদূর থেকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের আর কোন মন্দিরে সারা বৎসর এরূপ আলোক সজ্জার ব্যবস্থা নেই। মন্দিরটি ন'টি চূড়াবিশিষ্ট। কিন্তু মাঝখানের চূড়ার গায়ে প্রতি দিকে চারটি করে মোট ষোলটি অঙ্গশিখর আছে। এ মন্দিরের ভিত্তি-প্রস্তর খননকালে শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী কষ্টিপাথরের একটি ক্ষুদ্র ও সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গেছে। মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌররাধামাধব, গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া, লক্ষ্মী এবং পর্বততত্ত্বের বিগ্রহ বিরাজমান। মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তর পাশে ক্ষেত্রপাল শিবের মন্দির অবস্থিত। তারই পাশে নিমগাছের তলে শচীমাতার সূতিকাগৃহে শয়ান শিশু নিমাই, নিকটে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র উপবিষ্ট। মায়াপুরের অদূরেই বামনপুকুর গ্রামে চাঁদকাজীর সমাধি ও বল্লালসেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বল্লালঢিবি দেখা যায়। চাঁদকাজীর প্রকৃত নাম মৌলানা সিরাজুদ্দিন; তিনি হোসেন শাহের নিমক ছিলেন। একটি প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের মধ্যে এই সমাধি অবস্থিত। নবদ্বীপে পোড়া-মা জাগ্রতা লোকায়ত দেবী। এখানে রাজা গিরীশচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভবতারণ শিব এবং ভবতারিণী কালীর দুটি রত্নমন্দির আছে। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ। এখানকার বুড়োশিবতলায় ইটের তৈরী এক সুউচ্চ পঞ্চরত্ন মন্দিরে বুড়োশিব ছাড়া দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীমূর্ত্তি, প্রস্তরনির্মিত গণেশমূর্ত্তি, সূর্য্য নামে পরিচিত এক ক্ষুদ্র স্ফটিকখণ্ড এবং ধাতব মঙ্গলচণ্ডী উল্লেখযোগ্য।

রণাডাকাতের নাম থেকেই রাণাঘাঁটি বা রাণাঘাট। জনশ্রুতি অনুযায়ী, মহারাণীর ঘাট থেকে রাণাঘাট অথবা রাণা মানসিংহের নাম থেকেই রাণাঘাটের উৎপত্তি। ঐতিহাসিক বিচারে রাণা মানসিংহ যশোহর অভিযানকালে চূর্ণী নদী হয়ে এসে এইস্থানে অবতরণ করেছিলেন এবং সেই থেকেই এই অঞ্চলের নাম হয় রাণাঘাট। রাণাঘাটে অনেক ছোট বড় মন্দির আছে তন্মধ্যে একজোড়া আটচালা শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য। খিলান পত্রাকৃতি এবং খিলানের নীচ ঢেউ

খেলানো। হংসপংক্তির দৃশ্য নদীয়া জেলার বেশীরভাগ মন্দিরেই লক্ষ্য করা যায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। এ ছাড়া পদ্মফুল, ফুলকারি নকসা, লতাপাতা, দশভুজার মূর্ত্তি তো আছেই। এই মন্দিরে দেবদেবীর মূর্ত্তির পরিবেশন অত্যন্ত বেশী। সামাজিক দৃশ্যের অবতারনা যথেষ্ট করা হয়েছে তবে সংস্কারের ফলে অধিকাংশ দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়েছে। মন্দির দুটি খুব প্রাচীন না হলেও দেড়শো বছরের পুরানো হবে। প্রতিষ্ঠাফলক না থাকার জন্য সঠিক নির্মাণকাল নির্দ্ধারণ করা যায় না, তবে পালচৌধুরী জমিদার আমলে তৈরী বলে অনুমান করা যায়।

রাণাঘাট থানার অন্তর্গত আড়ংঘাটা একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, যুগলকিশোর মন্দিরের জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। শোনা যায়, কোন একসময়ে বৃন্দাবন থেকে শ্রীকৃষ্ণের এক কিশোর মূর্ত্তি আনয়ন করে নবদ্বীপের নিকট সমুদ্রগড়ে স্থাপন করা হয়। বর্গীদের আক্রমণ নবদ্বীপে বৃদ্ধি পেলে জনসাধারণ এই মূর্ত্তিটি সঙ্গে করে আড়ংঘাটায় নিয়ে চলে আসেন এবং মন্দির নির্মাণ করে পূজার্চনা করতে থাকে। গোপীনাথ জীউর মন্দিরের পাশে এই মন্দিরে কিশোর বিগ্রহই থাকত কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভূগর্ভ থেকে রাধিকামূর্ত্তি উদ্ধার করে এই বিগ্রহের বামপাশে স্থাপন করেন এবং সেই সময় থেকেই এই মন্দিরের নামকরণ হয় যুগলকিশোর মন্দির। মহারাজা এই মন্দিরের নিত্যসেবার জন্য একশো পঁচিশ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন বলে শোনা যায়। যুগলকিশোর মন্দিরটি পূর্বমুখী সাধারণ দালান ঘর মাত্র। সামনের দিকে চণ্ডীমণ্ডপ আকারের থামযুক্ত প্রশস্ত বারান্দা। তারপর পরস্পর পাঁচটি প্রকোষ্ঠের মধ্যটিতে কাঠের বেদীর উপর রাধিকাসহ যুগলকিশোরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। রাধিকা ধাতুময়ী এবং শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিটি পাথর নির্মিত। বামদিকের প্রকোষ্ঠে যথাক্রমে কালাচাঁদ ও শ্যামচাঁদ বিগ্রহ এবং দক্ষিণ দিকের দুটি প্রকোষ্ঠে যথাক্রমে রাধাবল্লভ ও গোপীবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। এঁদের মধ্যে কেবলমাত্র কালাচাঁদ বিগ্রহ একক, রাধিকামূর্ত্তি নেই। এসকল

প্রকোষ্ঠে শালগ্রামশিলা, বালগোপাল বিগ্রহাদি আছে। এছাড়া মন্দির সংলগ্ন দক্ষিণমুখী ভিন্ন একটি প্রকোষ্ঠে বলরাম ও রেবতীর মৃন্ময়মূর্ত্তি, শালগ্রামশিলা, ধাতুনির্মিত সাক্ষীগোপাল এবং গণেশের বিগ্রহাদি সংরক্ষিত আছে।

শ্যামচাঁদের মন্দির ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল (আলোকচিত্র-১৯)। শ্যামচাঁদের মূর্ত্তিটি কষ্টি পাথরের কৃষ্ণমূর্ত্তি। শ্যামচাঁদের মন্দিরটি একসময় পশ্চিমবাংলার বৃহত্তম মন্দির ছিল। উচ্চতা প্রায় ৭২ ফুট। দেওয়ালে পোড়ামাটির মূর্ত্তি, রাজা সামন্তবর্গের মূর্ত্তি, দশাবতার ও পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি বিশেষভাবে অবতারণা করা হয়েছে। মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির প্রাচীরবেষ্টিত। গোকুলচাঁদের আটচালা মন্দির এ অঞ্চলে প্রাচীন। সম্ভবতঃ, ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে জামগ্রামের নন্দীদের পৃষ্ঠপোষকতায় (লোকশ্রুতি অনুযায়ী) এ মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। জ্যামিতিক নকসা ছাড়া আর কিছুই দেওয়ালে লক্ষ্য করা যায় না। তবে এই দেবালয়ের কাছেই অদ্বৈত প্রভুর মন্দিরে প্রচুর ভাস্কর্য্যের অলংকরণ নজরে পড়ে। পৌরাণিক ও সামাজিক দৃশ্য মন্দিরের দেওয়ালে যত্রতত্র। দশভুজা, মহিষমর্দ্দিনী, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য পৌরাণিক মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকসা তো আছেই। ইটের তৈরী এই মন্দিরের উচ্চতা ২৪।২৫ ফুট হবে। কোন প্রতিষ্ঠাফলক নেই। জলেশ্বর মহাদেবের মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দির বাংলার শিল্পপদ্ধতি অনুসারে নির্মিত এবং এদের কারুকার্য্য অতীব সুন্দর। এই মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে উৎকীর্ণ পৌরাণিক চিত্রাদির শিল্পচাতুর্য্য অতি চমৎকার। মন্দিরের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকের প্রবেশদ্বারে কুলঙ্গির মধ্যে মূর্ত্তিগুলি উৎকীর্ণ। মূর্ত্তিগুলির বিষয়বস্তু পৌরাণিক ও সামাজিক। কৃষ্ণলীলা, রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনী, হরগৌরী, বিষ্ণু, কালী, সরস্বতী, গণেশ, নারদ প্রভৃতি একদিকে, অপরদিকে বন্দুকধারী সাহেব, তীরন্দাজ, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী প্রভৃতির দৃশ্য শোভিত। আবার কিছু কিছু মিথুন

দৃশ্যেরও অবতারণা করা হয়েছে। বর্ত্তমানে সংস্কারের ফলে অনেকাংশ বিনষ্ট। নবদ্বীপের ন্যায় শান্তিপুরও পূর্ব্বে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক গোপালভাঁড় শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন।

বীরনগরের প্রাচীন নাম উলা। এখানে উলাইচণ্ডী দেবীর মন্দির আছে তাই গ্রামটির নাম এরূপ হয়েছে। বীরনগর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়া নাম। দেশের অধিবাসীদের বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তারা এই নাম দিয়েছিল। এখানে প্রায়ই ডাকাতের উপদ্রব হোত এবং স্থানীয় অধিবাসীরা নিজেদের শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করত বা ধৃত ডাকাতদের শাস্তি দিত। বীরনগরে প্রাসাদোপম অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। এখানকার জোড়বাংলা মন্দির দেখবার মত। সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির জীর্ণফলকে নিম্নলিখিত লিপিটি উৎকীর্ণ—

অঙ্গেককালেন্দুসিতে
শকাব্দে ১৬১৬ লায়
স্থ কায়স্থ হরেষধ
র্ম্মাঃ। যো নির্ম্মমে শ্রীহ
রি যুগ্মধাম
রামেশ্বর মিত্র দাসঃ॥

কারিগরি নৈপুণ্যে মন্দিরটি এই জেলায় অতুলনীয়। সংস্কারের ফলে কিছু অংশ শ্রীহীন হলেও সামনের দেওয়ালে টেরাকোটার অলংকরণ, ভিতর ও বাইরের দেওয়ালে পালকিমধ্যে বাবু ও রক্ষকগণ, বাণিজ্যতরী, মৃগয়ার দৃশ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রবেশপথে কৃষ্ণলীলা ও পৌরাণিক দেবদেবী, থামের গায়ে কার্ত্তিক গণেশ সমেত মহিষমর্দ্দিনী-মূর্ত্তিগুলি আজও আপন মহিমায় উজ্জ্বল। বীরনগরে মিত্রমুস্তাফী বংশ পুরাকীর্ত্তি তালিকাকে কিছু বর্দ্ধিত করেছে, তার সাক্ষ্যহিসাবে কাঠের তৈরী দোচালা চণ্ডীমণ্ডপের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান।

এ হেন কারুকার্য্যমণ্ডিত চণ্ডীমণ্ডপ শুধু নদীয়াতে নয়, সারা পশ্চিম-বাংলায় বিরল। কাঠের থাম ও কড়িবরগাগুলিতে পদ্ম, ফুলকারি নকসা, অসংখ্য দেবদেবীমূর্ত্তি, সামাজিক ও মিথুনদৃশ্য খোদিত। নদীয়াজেলায় আনুমানিক মুসলীম পরবর্ত্তীকালের এবং সর্ব্বপ্রাচীন মন্দির পালপাড়ায় অবস্থিত (আলোকচিত্র-২০)। ইটের চারচালা মন্দির—ভিতরের ছাদ গম্বুজাকৃতি। দক্ষিণমুখী মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ২৭ ফুট। খিলানের উপরে ও দু'পাশে টেরাকোটার অলংকরণ। সামনের দেওয়ালে অনুরূপ অলংকরণ ছিল কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে আজ তা বিনষ্ট। সারিসারি জ্যামিতিক নকসা, লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্য, বানরসেনাবেষ্টিত রামচন্দ্র, অন্যদিকে রাবণ ও তার পারিষদবর্গ। পিছনের দেওয়ালে টেরাকোটার পদ্ম। বস্তুতঃ, এত উৎকৃষ্ট ধরনের পোড়ামাটির কাজ নদীয়া জেলায় বিরল। এই মন্দিরটি বর্ত্তমানে সরকারী তত্ত্বাবধানে। কবে কার দ্বারা মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল জানা যায় না, তবে পাঁচশো বছরের বেশী পুরাতন হবে, একথা হলপ করে বলা যায়।

আমঘাটায় হরিহর মন্দিরটি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। হরিহর মূর্ত্তির বাম অংশ হরি—হাতে শঙ্খ-চক্র আর ডান অংশ শিবের (হরের) হাতে ত্রিশূল ও অভয়মুদ্রা। পাথরের মূর্ত্তি। ছাদ সমতল। এখানে অবসর বিনোদনের জন্য রাজা এক সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তার সাক্ষ্য হিসাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইট ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এই অঞ্চলের আর এক পুরানো মন্দির হোল কালভৈরবের মন্দির। মূর্ত্তি চতুর্ভুজ—হাতে সাপ, ত্রিশূল ও ডমরু, অন্য আর এক হাত সাপের মাথার উপর প্রসারিত। পিছনে কুকুর।

ঘোড়াইক্ষেত্রে শ্যামরায়ের মন্দির পোড়ামাটির মূর্ত্তি ও অলংকরণ-যুক্ত। মন্দিরটি দোচালাবিশিষ্ট ছিল কিন্তু কালক্রমে বিনষ্টপ্রায়। ত্রিহট্ট বা তেহট্ট গ্রামে কৃষ্ণরায়ের জোড়বাংলা মন্দিরটি বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে "শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দনিরত শ্রীরামদেব মহান লক্ষ্মী যস্য পদারবিন্দসেবন বিধৌ ব্যাপারসম্পাদিনী" শ্রীপুরুষোত্তমের মন্দির নির্মিত হয়। নির্মাণকর্ত্তা রুদ্র রায়। ইটের তৈরী এ মন্দিরটি পশ্চিমমুখী—সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির প্রচুর অলংকরণ। এছাড়া আছে ফুলপাতার নকসা। পিছনের দোচালার প্রবেশপথে কৃষ্ণের দুটি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি এবং দুটি রাজমূর্ত্তি লক্ষ্য করা যায়।

বিল্বপুষ্করিণীতে নদীয়ারাজের আদেশে ১০৮টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি ছাড়া আর সবই বিলুপ্ত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠাকাল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বাচস্পতিপাড়ায় শিবমন্দিরের দেওয়ালে পোড়ামাটির মূর্ত্তি ও ফুলকারি নকসা আছে। ভিত্তিবেদীর নিকট হংসপংক্তি, প্রবেশদ্বারে দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, ব্রহ্মা, কালী, শিব, কার্ত্তিক, গণেশ, নারদ, গরুড়, হনুমান মূর্ত্তি এবং রামায়ণ কাহিনীর ও সামাজিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। ডানদিকের দেওয়ালে মিথুনমূর্ত্তিটি উল্লেখযোগ্য।

শিবনিবাসের অন্যতম মন্দির হোল বুড়োশিবের মন্দির বা রাজরাজেশ্বরের মন্দির (আলোকচিত্র-২১)। নির্মাণশৈলীতে এই মন্দিরটি প্রচলিত বাংলার মন্দির রীতির মধ্যে পড়ে না। বরং কিছু মুসলীম প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের চূড়া ছত্রাকার এবং আটকোণবিশিষ্ট তিনটি প্রবেশদ্বার। আবার খিলানগুলি গথিকরীতি অনুযায়ী নির্মিত। মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ৮০ ফুট। সম্ভবতঃ, পশ্চিমবাংলায় এ ধরনের উঁচু মন্দির আর নেই এবং অভ্যন্তরের শিবলিঙ্গ পূর্ব্ব ভারতের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। শিবনিবাসের জঙ্গলেই নাকি মহারাজার প্রাসাদ ছিল; মাটির নীচে প্রোথিত ধ্বংসাবশেষই তার প্রমাণ। রাজপ্রাসাদ খুব সুরক্ষিত ছিল এবং দুর্গের আকারে গথিকরীতি অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল।

দিকনগরে রাঘব রায় কর্ত্তৃক ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত রাঘবেশ্বর মন্দির—চারচালা, পশ্চিমমুখী এবং ৩০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট। রাঘবেশ্বরের মন্দির বলে অভিহিত হলেও এটি আসলে শিবমন্দির। দেওয়ালের গায়ে টেরাকোটার প্রচুর অলংকরণ। বিভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা করা আছে দেওয়ালে দেওয়ালে। সামাজিক দৃশ্যও যেমন আছে তেমনি আছে পৌরাণিক দৃশ্য। যেমন, পালকিমধ্যে বাবু, অশ্বারোহী, শিকারী, মিথুনদৃশ্য, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, কালীয়দমন, রাম, বলরাম প্রভৃতি মূর্ত্তি। মন্দির নির্মাণে পাল ভাস্কর্য্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। গর্ভগৃহের চারকোণে লহরার বিন্যাস করে তার উপর গম্বুজাকৃতি ভিতরে ছাদ স্থাপিত। প্রবেশপথে চৌকাঠ হিসাবে দুটি কালো পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। এই রাঘবরাজের আর এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি শ্রীনগরের চারচালা শিবমন্দির। এই মন্দিরটির নির্মাণকাল সঠিকভাবে নিরূপণ করা না গেলেও পূর্ব্বের মন্দিরের সমসাময়িক। পোড়ামাটির অসংখ্য অলংকরণ, জ্যামিতিক ও ফুলকারির নকসা মন্দিরটির শোভাবর্ধন করেছে। এইস্থানেই রাজা তার অবসর বিনোদনের জন্য এক সুরম্য রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। আজ তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেলেও নিরীক্ষণসৌধ তার সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে। রাজপ্রাসাদের নির্মাণকাল সম্ভবতঃ ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে—মরালী নদীর ধারে।

রাজা রাঘব রায় ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মাটিয়ারীতে এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন যা আজ রুদ্রেশ্বরের শিবমন্দির বলে পরিচিত। মন্দিরটি ইটের এবং অলংকরণযুক্ত চারচালা। মন্দিরের মাথায় আমলক, কলস, ত্রিশূল ও চক্রবিশিষ্ট তিনটি চূড়া দেখা যায়। টেরাকোটার সজ্জার বিশেষত্ব সশস্ত্র মোগলমূর্ত্তির আধিক্য। অনুমান করা যায় যে এখানে মোগল প্রতিপত্তির প্রভাব পড়েছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর মানসিংহের সুপারিশ অনুযায়ী ভবানন্দকে এই জেলার জমিদারী দান করেছিলেন। ভবানন্দের পৌত্র ছিলেন রাঘব রায়। রাঘব পুত্র রুদ্র

রায়ও মোগল সম্রাট আলমগীরের কাছ থেকে বিস্তীর্ণ এলাকা আদায় করে নিয়েছিলেন এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাদের ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য মন্দিরের গায়ে মোগল মূর্ত্তির অলংকরণ করেছিলেন। রাজা রাঘব রায় এই স্থানে এক রাজপ্রাসাদ ও গড় নির্মাণ করেছিলেন তার সাক্ষ্য আজও বিদ্যমান। ইট-পাথরের টুকরা, তোরণের ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ নজরে পড়ে। এরই অদূরে মলি-অল গসের দরগা। দরগায় যে সমস্ত পাথর ব্যবহার হয়েছে তা অধিকাংশই প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ।

রাণাঘাট থানার অন্তর্গত দেবগ্রামে দেবপাল রাজার প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি ঢিবি এবং পুষ্করিণী আছে। এনামেল-করা ইট, কারুকার্য্যময় পাথর প্রভৃতি একদা এখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই দেবপালের সঙ্গে পালবংশীয় বিখ্যাত দেবপালের কোন যোগাযোগ নেই। List of ancient monuments in Bengal-এ উল্লেখ আছে"...outside the fort are the ruins of several large temples which appear to be of great interest and of some antiquity as evidenced by the size of the bricks. They are the only undoubtedly premuhammadan ruins seen or heard of in the district." (page 118, 1896.) সে সব মন্দিরের কোন চিহ্ন এখন আর দেখা যায় না। তবে চারটি উঁচু ঢিবি এখনও আছে। মনে হয়, শত্রুবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এইগুলির প্রয়োজন হয়েছিল। বাহিরগাছি গ্রামে বারোটি শিবমন্দিরের মধ্যে ইটের তৈরী একটি চালামন্দির এখনও বর্ত্তমান। একদা এই মন্দিরের গায়ে প্রচুর পোড়ামাটির অলংকরণ মূর্ত্তি ছিল; বহুবার সংস্কারের পরেও কয়েকটি টেরাকোটা মূর্ত্তি এখনও নজরে পড়ে। গর্ভগৃহে প্রবেশের কাঠের কপাট দু'টি একদা বহুলঅলংকৃত ছিল। বামন-পুকুর গ্রামে সেনরাজা বল্লালসেনের ঢিবি অবস্থিত। স্তূপটি উচ্চতায়

৩০ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০০ ফুট হবে। ঢিবির চারিপাশে পুরাতন ইটের গাঁথুনি এবং উপরে ছোট ছোট পাথরের টুকরো যত্রতত্র। এই ঢিবি থেকে একসময় বহু কারুকার্য্যশোভিত পাথর ও স্তম্ভ কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে আনা হয়েছিল, এমনকি কাজীবাড়ি ও মোল্লাবাড়ি এই ঢিবিরই ইট দিয়ে তৈরী। এই ঢিবি থেকে প্রাপ্ত পাথরের পদ্মফুল, জানালার অংশবিশেষ এবং পিতলের একটি দীপবাহিকামূর্ত্তি বর্ত্তমানে কলিকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। আরো খননকার্য্য চালালে হয়তো অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ হতে পারে।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীযুদ্ধের স্মারক হিসাবে ইংরাজ সরকার পলাশীর বাগানে গ্রানিট পাথরের এক ক্ষুদ্র বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। লর্ড কার্জন সেটিকে বৃহৎভাবে নির্মাণ করেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই স্তম্ভের কাছেই দৌলত আলির সমাধি আছে। ১২৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জমিদার কালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক কালিগঞ্জে রাজরাজেশ্বরীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। দেবী যোগনিদ্রায় শায়িত মহাদেবের নাভি থেকে উত্থিত একটি পদ্মের উপর উপবিষ্টা, দেবী বহু বাহুবিশিষ্ট। দক্ষিণে গঙ্গা, বামে যমুনা ও নীচে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ইন্দ্রদেবীর বন্দনায় রত। এরূপ মূর্ত্তি বাংলাদেশে খুব কমই নজরে পড়ে। এ ছাড়াও নদীয়াতে আরও অনেক গ্রামগঞ্জ আছে যেখানে বহু শিবমন্দির চোখে পড়ে। মন্দির নির্মাণে ও অলংকরণ সজ্জায় একই রীতি অনুসরণ করা হয়েছে বলে সবগুলির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই জেলায় এমন কোন মন্দির নেই যেখানে পোড়ামাটির কারুকার্য্য অনুপস্থিত। এই বিচারে পশ্চিমবাংলার মধ্যে নদীয়াতেই ভাস্কর্য্যশিল্পের চর্চ্চা প্রবল ছিল বলে মনে হয়।

হাওড়া

সাত আট শতকের কাছাকাছি সময় থেকে হাওড়ার উৎপত্তি। তবে নব্যপ্রস্তর যুগের নবাস্মর আয়ুধ আবিষ্কারের ফলে হাওড়ার উৎপত্তি অনেক পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। হাওড়ার রাধাপুর গ্রামে রোমান শিরস্ত্রাণ পরিহিত দ্বিমুখবিশিষ্ট পোড়ামাটির এক অদ্ভুত মূর্ত্তি আবিষ্কারের ফলে এই জেলার সভ্যতা তাম্রলিপ্ত সভ্যতার সমসাময়িক বলে পরিগণিত হয়। ঐ দেবতা প্রাচীন রোমক যুদ্ধদেবতা "জানুসের" সঙ্গে পরিকল্পিত। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হাওড়া জেলা সীমানায় সবচেয়ে ছোট হলেও একদা এই জেলার ভূ-ভাগ প্রাচীন-কালের লাঢ় (রাঢ়) এবং সুহ্ম জনপদবিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জৈন ধর্মগ্রন্থ কল্পসূত্রে, বৌদ্ধজাতকে, পতঞ্জলির (দ্বিতীয় শতক) মহাভাষ্যে এবং কালিদাসের (পঞ্চম শতক) রঘুবংশে এই জনপদের উল্লেখ আছে। বৃহৎসংহিতায় ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে সুহ্মের উল্লেখ দেখা যায়। এই জেলার প্রধান নদী কৌশিকীর (কানানদী) নাম পুরাণে উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক প্রবোধ সেন তাঁর আলোচনামূলক গ্রন্থে (Some Janapadas of Ancient Radha—Indian Historical Quarterly) বলেছেন যে প্রাচীনকালে রাঢ়দেশের যে অংশ সুহ্ম নামে পরিচিত ছিল তা রাঢ়ের দক্ষিণাংশ বর্ত্তমানের হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলাকেই সূচিত করে। ১৯০৫ সালের হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার অনুযায়ী, খানাখন্দ ও জলভূমি অঞ্চল ('পূর্ব্ববঙ্গের হাওড়া ও উড়িষ্যার হাবোড়') থেকেই হাওড়া নামের উৎপত্তি। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের এই জেলা গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকে দিল্লীর বাদশাহ ফারুকশায়রের সিংহাসন-প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল কাউন্সিল তাদের

প্রেরিত প্রতিনিধি মারফৎ কলিকাতার অপর তীরে যে সব মৌজার পত্তন প্রার্থনা করেন তা হোল—শালিকা, হাড়িয়াড়া, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর এবং বেতড়। হাড়িয়াড়া ছাড়া অন্য নামগুলি এখনও প্রচলিত আছে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী যখন হাড়িয়াড়া মৌজায় আজকের রেলস্টেশনের পত্তন করেন তখন থেকেই সে মৌজার নাম লোকমুখে বিবর্তিত হয়ে হাওড়ায় পরিণত হয়েছে। অন্যথায় আড়া অর্থে বাসস্থান। হাড়ি জাতির বাসস্থান হাড়িয়াড়া, যেমন পাল জাতির বাসস্থান পালাড়া। এই ধরনের আড়া অন্ত গ্রামের নাম পশ্চিমবঙ্গে বহু আছে। সুতরাং হাড়িয়াড়ার অপভ্রংশ হাওড়া।

দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত আজকের হাওড়া জেলার অবস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় দশম শতকের শেষে শ্রীধরাচার্য্যের ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে। সেখানে তিনি বলেছেন—

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাং।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ॥

হাওড়ার অপর নাম ভূরশুট। তখন গৌড়ের সিংহাসনে পাল-রাজা অধিষ্ঠিত। তবে কোন্ নৃপতি হাওড়ায় রাজত্ব করেছিলেন তা জানা না গেলেও এ অঞ্চলে এক ধীবর কিছুদিনের জন্য রাজত্ব করেছিলেন। তারপর এক কায়স্থ পাণ্ডুদাস ভূরশুটের সিংহাসনে বসেন। পরে আসেন রাঢ়ীশ্রেণী এক ব্রাহ্মণ, তখন গৌড়ের সিংহাসনে বাদশাহ হোসেন শাহ। গোবিন্দপুরে (২৪ পরগনা) প্রাপ্ত লক্ষণসেনের তাম্রশাসনে বলা হয় যে বর্ধমানভুক্তি ভাগীরথী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং হাওড়া এই সীমানাভুক্ত। বিজয়সেন হাওড়ার রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেন এবং হাওড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করেন। হোসেন শাহ এ অঞ্চলে বেশীদিন আধিপত্য বজায় রাখতে পারেননি তার কারণ উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব হরিচন্দন বাংলা আক্রমণ করে হাওড়া জেলা দখল করে নেয়। আবার ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলেমান কররাণী এই অঞ্চলকে

করদরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় ফলে এর নামকরণ সুলিয়ামানাবাদ হয় এবং পরিশেষে আকবরের শাসনাধীনে আসে তার কারণ হিসাবে একথা বলা যায় যে সুলিয়ামানাবাদ আকবরের সুবা বাংলার অন্যতম সরকার ছিল।

আকবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে তখন কৃষ্ণরায় ভূরশুটে রাজত্ব করছিলেন। মাঝখানের ইতিহাস এক রাজবংশের হাতে ছিল—তা প্রায় দুশো বছর হবে। কিন্তু বর্ধমান রাজবংশ পরাক্রমশালী হয়ে ওঠার ফলে এই রাজবংশের পতন হয় এবং কীর্ত্তিচন্দ্র ভূরশুটের রাজাকে উচ্ছেদ করে এই পরগনা দখল করে নেয়। সেই সময় বাংলার আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। মোগল শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শক্তি—ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে ভূরশুটের রাজ্যহারা রাজকুমার নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রয় লাভ করেন। ইনিই পরবর্ত্তী জীবনে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। এই রায়গুণাকর উপাধি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকেই পাওয়া। ভূরশুটে তিনটি প্রধান গড় ছিল, তারমধ্যে গড়ভবানীপুর সবচেয়ে প্রাচীন। বর্ত্তমানে গড়ের কিছুমাত্র চিহ্ন নেই, তবে রাজৈশ্বর্য্যের সাক্ষীরূপে গড়-ভবানীপুরে বিশাল দোতলা ইটের মণিনাথ মন্দিরটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। যদিও জীর্ণ, এত বড় এবং এরকম দোতলা মন্দির খুবই কম দেখা যায়। দ্বিতীয় গড় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়োগ্রামে—পেঁড়ো বসন্তপুর বলে পরিচিত। ভূরশুটের তৃতীয় গড় দোগাছিয়ায়।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর অথবা পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার ইতিহাসে এক আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। হাওড়া তখন ভুটিয়াদের আশ্রয়স্থল। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে ভুটান রাজার সঙ্গে কোচবিহারের এক যুদ্ধ বাধে এবং এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করার ফলে ভুটানরাজ পরাজিত হয়ে তিব্বতরাজ পাঞ্চেন লামার শরণাপন্ন হন এবং তাঁর চেষ্টায় এক সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরাজ বাণিজ্য-মিশন তিব্বতে

প্রেরিত হোল এবং তিব্বতী মঠ কলকাতার কাছাকাছি হাওড়ায় স্থাপিত হোল। বাংলার সঙ্গে তিব্বতের বহু শতাব্দীর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অব্যাহত রইল। এইভাবেই সৃষ্টি হোল ভোটবাগানের—তিব্বতী বা ভুটিয়াদের নামানুসারে। প্রতিষ্ঠিত হোল তিব্বত থেকে আনীত আর্য্যতারা, মহাকাল ভৈরব, ব্রজভ্রূকুটি, পদ্মপাণি প্রভৃতি বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদবী। কারুকার্য্যময় পিতলের সিংহাসনের ওপর বিগ্রহগুলি স্থাপিত। তিব্বতী মঠ হলেও তিব্বতীগুম্ফার সঙ্গে কোন মিল নেই, মঠ দোতলা—দালান। দেড়শো বিঘা জমির উপর এই মঠ অবস্থিত। আশেপাশে কমপক্ষে যে দশটি ছোট বড় সমাধি দেখা যায় তার মধ্যে পূরণগিরির সমাধি উল্লেখযোগ্য।

হেস্টিংস-এর সময়ে বাংলাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘাঁটি সুদৃঢ় হয় এবং হুগলীতে পর্ত্তুগীজদের তাড়া খেয়ে জব চার্নক কলিকাতায় এবং অব্যবহিত পরে ১৭১৪ সালে মুর্শিদকুলি খাঁর অনুমতি পেয়ে হাওড়ায় সালকিয়া অঞ্চলে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেন। হাওড়া থেকে বাণিজ্য-ব্যাপারে ইংরাজ বণিকেরা প্রচুর মুনাফা লুটতে থাকে। স্থাপিত হয় বোটানিক্যাল গার্ডেন শিবপুরে। অসংখ্য শিবমন্দিরের জন্য এই অঞ্চলের নাম শিবপুর। বেশীর ভাগ শিবমন্দিরই আন্দুলরাজ রামচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক নির্মিত। মন্দিরগুলি কোনটি নবরত্ন, কোনটি পঞ্চরত্ন। মন্দিরগাত্রে কিছু কিছু পোড়ামাটির অলংকরণ-ফলক, পঙ্খের কাজ লক্ষ্য করা যায়।

মুসলীম যুগের প্রথম দিকে বিশেষ মন্দিরাদি নির্মিত না হলেও পালযুগীয় পাথরের মন্দিরের অস্তিত্ব কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। উড়িষ্যার শিখরপদ্ধতির ধারা হাওড়ার মন্দির গঠনশৈলীতে অনুসৃত হলেও বাংলার আদিমতম রীতি সেই চালা, রত্ন এবং দালানের ব্যবহার প্রচুর হয়েছে। হাওড়ার সমস্ত পুরাকীর্ত্তি, বিত্তশালী ব্যক্তিদের দান। শোনা যায়, পাঁচলা থানায় গৌড়েশ্বর রাজার রাজপ্রাসাদ ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে তার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। স্থানটি গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

এরই অদূরে দেউলপুর গ্রামে আনুমানিক একশো বছর আগে বর্ধমানের মহারাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিংহবাহিনীর পাকা মন্দির। এই গ্রামে বহু দেবদেউল একদা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান। অগণিত দেবদেউলের জন্য এই স্থানের নাম হয় দেউলপুর। এই অঞ্চলের বর্ত্তমান বারোচালা মন্দির এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য, কেননা বারোচালার মন্দিরের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে বিরল। চালার বিন্যাস ত্রিরথ, এবং কার্নিসের নীচে পোড়ামাটির ঘোড়া, সিংহ, হাতি, ভালুক ছাড়াও রামায়ণ-কাহিনী, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীর ভাস্কর্য্য নজরে পড়ে। প্রতিষ্ঠালিপি নেই। এইস্থানের বুড়ো সাহেবের পীরের মাজার উল্লেখযোগ্য।

বাদশাহ আকবরের সময়ে পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করবার জন্য তাঁর সেনাপতি মানসিংহ জগৎবল্লভপুর থানার গৌরীগঙ্গার দু'তীরে ছাউনি ফেলে কিছুদিন অবস্থান করার জন্য এই অঞ্চলের নাম হয় মানসিংহপুর। এখানকার উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ধর্মঠাকুরের মন্দির। বর্ত্তমানে অলংকরণ নেই, আগে ছিল বলে মনে হয়। এই অঞ্চলের অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে রাধাকান্ত জীউর মন্দির ও ধর্মঠাকুরের মন্দির উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও মন্দিরগুলি অতি প্রাচীন নয়। একশো-দেড়শো বছরের মধ্যে তৈরী। মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির অলংকরণ হয়তো আগে ছিল, কিন্তু চূণবালির পলস্তারায় সেগুলি অদৃশ্য। কিছু কিছু পঙ্খ অলংকরণের অবতারণা করা হয়েছে।

নজরপুর গ্রামে ঢেরুকেশ্বরাধিপতি শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবনচন্দ্র জীউর মন্দির। বিগ্রহের ডানদিকে শ্রীকৃষ্ণ এবং বামদিকে রাধিকা। মন্দিরটির আনুমানিক প্রতিষ্ঠাকাল ১৪৫৪ শকাব্দ। আগেকার মন্দিরটি বর্ত্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বর্ত্তমান মন্দিরটি এই পুরাণো মন্দিরের উপরই তৈরী হয়েছে। পুরাণো মন্দিরের ইটগুলি গড়নে পেটাটালির মত ছিল। বর্ত্তমান গৃহের দু'দিকে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড। নাজিরদের নামানুসারে

নাজিরপুর গ্রাম—লোকের মুখেমুখে নজরপাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীউ-এর মাহাত্ম্য স্বীকার করে মুসলমানেরা ২৪ বিঘা জমি ছাড় দিয়ে দেয় এবং পরে ঐ জমির চারিদিকে গড় তৈরী করা হয়েছিল (কৌশিকী, পৌষ-চৈত্র সংখ্যা—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। চাঁচুলের রঘুনাথজীউর মন্দির (আলোকচিত্র-২২) ইটের তৈরী। শিখরগুলি সপ্তরথ এবং বীরভূম জেলার মত উদ্গতপট্টি দিয়ে শিখর অলঙ্কৃত। উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হলেও বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত হওয়ায় ধ্বংসের পথে। ভিতরের ছাদ প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী ধাপপদ্ধতিতে গঠিত। মাড়ঘূরালি গ্রামে দামোদরজীউর মন্দিরটি অন্যতম পুরা-কীর্ত্তি। উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলে অনুমান করা হয়। পোড়ামাটির অলংকরণের বিষয়বস্তু হোল গণেশজননী, রাম, কৃষ্ণ, নৃত্যরত শিব, বন্দুকধারী সাহেব প্রভৃতি। জগৎবল্লভপুরের শিবমন্দির ইটের তৈরী। অলংকরণের মধ্যে রয়েছে রাম-রাবণের যুদ্ধ, শিকার ইত্যাদি। সম্ভবতঃ, ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল। রামেশ্বরপুর গ্রামে মিত্র পরিবার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমমুখী আটচালা শিবমন্দির এখানকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্ত্তি। গর্ভগৃহের ছাদ চার-দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৩০।৩২ ফুট হবে। বর্গীর আক্রমণে মন্দিরটি বিধ্বস্ত হলে এটি পরিত্যক্ত হয়। এরই অদূরে আরো দু'একটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের নজীর অবশ্য যত্রতত্র। এছাড়া রয়েছে ইটের মহেন্দ্রেশ্বরের শিবমন্দির। পোড়ামাটির পদ্মফুল ছাড়া আর কিছু অলংকরণ নেই। আর রয়েছে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তৈরী মুসলমানদের উপাসনালয় শাহী মসজিদ।

সাদতপুর গ্রাম পূর্ব্বে ঘোষালবাটী বলে পরিচিত ছিল কিন্তু মুসলমান রাজত্বের সময় সাহাদত আলি এই অঞ্চলে জায়গীর নিয়ে বসবাস করেন। সম্ভবতঃ, তাঁর নামানুসারে আজও এই গ্রাম সাহাদতপুর

নামে খ্যাত। ঐতিহাসিক পটভূমিকা ছাড়া এ অঞ্চল পুরাকীর্ত্তির জন্য উল্লেখযোগ্য নয়। বেগড়ী গ্রামে এক সময় হাবসী রাজারা রাজত্ব করতেন। কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত তাদের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপগুলি দেখা যেত। প্রাসাদ সংলগ্ন এবং প্রাসাদের এলাকাভুক্ত শেষপ্রান্তে পরিখা ছিল। নাম ছিল ভিতরগড় ও বাহিরগড়। এই বাহিরগড় থেকেই গ্রামের নাম বাইগড়ী ও কালক্রমে বেগড়ী হয়েছে।

মাকড়চণ্ডী মন্দিরের জন্য মাকড়দহ প্রসিদ্ধ। প্রবাদ অনুযায়ী, এই দেবী শ্রীমন্ত সদাগরের প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্ত্তমান মন্দিরটি ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে দেবীর মন্দির কিরূপ ছিল তা জানা যায় না। দেবীর মূর্তির উপর সিঁদুর দ্বারা শোভিত একটি শিলাখণ্ড। কিংবদন্তী আছে যে পূর্বে দেবীর মূর্ত্তি খুবই বিশাল ছিল। চণ্ডীকে যুক্ত করে মাকড়চণ্ডী নামকরণ কেন হয়েছে বলা শক্ত। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও অনুরূপ নামের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই আটচালা মন্দিরের দালানের ছাদ খিলানযুক্ত এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার-দেওয়াল থেকে উত্থিত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। মঙ্গলকাব্যে মাকড়চণ্ডীর নাম উল্লেখ না থাকলেও মেলাইচণ্ডীর নাম পাওয়া যায়। এই মেলাই-চণ্ডী আমতায় অবস্থিত। হাটখোলার দত্ত পরিবার কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় সতরো শতকে নির্মিত। অলংকরণ বর্ত্তমানে নেই, একদা ছিল কিনা বলা যায় না। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, অলিন্দের ছাদ অর্দ্ধবৃত্তাকার টানা খিলান ও গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজাকৃতি।

খালনা গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্ত্তি, কৃষ্ণরায়জীউর মন্দির। ইটের তৈরী, দক্ষিণমুখী, আটচালা মন্দির। উচ্চতায় প্রায় ২৬ ফুট হবে। এখানেও টানা খিলান ব্যবহৃত হয়েছে এবং গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজাকৃতি। সম্ভবতঃ ১৬০৫, খ্রীষ্টাব্দ মন্দিরটির নির্মাণকাল। রামায়ণের কাহিনী ও দশাবতারের অলংকরণ মন্দিরে স্থান পেয়েছে। পশ্চিমপাড়ায় দামোদরজীউর দালানমন্দিরটি পোড়ামাটির ভাস্কর্য্যে অতুলনীয়। কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, শিশু কোলে স্ত্রীলোক, কলসী কাঁখে

বধূ, মিথুনরত নরনারী, বন্দুকধারী ইউরোপীয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। খালনায় আরো দু'একটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি পুরাকীর্ত্তির জন্য উল্লেখযোগ্য না হলেও দর্শনযোগ্য। যেমন ঘটেশ্বর শিবমন্দির, ধর্মরাজের মন্দির এবং পঞ্চানন্দের মন্দির।

উদয়নারায়ণপুরে একজোড়া আটচালা মন্দির এখানকার একমাত্র পুরাকীর্ত্তি। দক্ষিণমুখী এই মন্দির দুটিতে, একটিতে শিব ও অন্যটিতে কূর্মরাজ ধর্মরাজ অধিষ্ঠিত। মন্দিরের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। অলংকরণ নেই, প্রতিষ্ঠালিপিও নেই। মনে হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত। এরই অদূরে আমতা গ্রামে বিখ্যাত শ্রীধরনাথ জীউর (আলোকচিত্র-২৩) ইটের তৈরী দক্ষিণমুখী, নবরত্ন মন্দির। মন্দিরটি রথের আদলে তৈরী। দেবালয়ের সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির সজ্জা। খিলানশীর্ষে লঙ্কাযুদ্ধ, দেওয়ালের দু'পাশে পৌরাণিক ঘটনাবলী ও নীচে বিবিধ সামাজিক দৃশ্য ও কিছু মিথুনদৃশ্য দেখা যায়। সামনের ত্রিখিলান দেওয়ালের পাদমূলে একসারি সামাজিক দৃশ্য—বন্দুকহাতে বিদেশী সৈন্যদল, মল্লযুদ্ধ, পদাতিক, পালকীতে ভ্রমণরত বাবু ইত্যাদি উৎকীর্ণ হয়েছে এবং উপরের সারিতে কৃষ্ণলীলা। দেবালয়টি ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি উচ্চতায় ৩৬ ফুট। মন্দির সংলগ্ন হরসুন্দর শিবের আটচালা মন্দির। সম্মুখভাগে পদ্মের নকাশি।

গাজীপুর গ্রামে মজুমদার পাড়ায় মজুমদার পরিবার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দরায় জীউর মন্দির (আলোকচিত্র-২৪)। মন্দিরটি উচ্চতায় ৩০ ফুট ও দৈর্ঘ্য প্রস্থে ২৫ ফুটের মত। দোতলা দালান মন্দির স্থাপত্যের দিক থেকে অভিনব এবং এ ধরনের মন্দির পশ্চিমবঙ্গে খুব কমই আছে। মন্দিরটি ইটের তৈরী এবং পূর্ব্বমুখী। খিলানের মাথায় প্রথাগতভাবে রাম-রাবণের যুদ্ধ দৃশ্য, দেওয়ালে অসংখ্য পদ্মের অলংকরণ। মন্দিরটির নীচের তলার চেয়ে উপরের

তলা অপেক্ষাকৃত ছোট। বর্তমানে খিলানের দু'পাশের দেওয়ালে খাড়াভাবে চারটি করে ও খিলানের উপরে আড়াআড়িভাবে বারোটি মনোরম পদ্ম কুলঙ্গির মধ্যে উৎকীর্ণ। এছাড়া সূক্ষ্ম নকাশি কাজও আছে। প্রতিষ্ঠাকাল লিপি অনুযায়ী "শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৩৬ মাহ অগ্রহায়ণ"—অর্থাৎ ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই মন্দিরের অদূরেই আর একটি দক্ষিণমুখী আটচালা শিবমন্দির বর্তমানে ভগ্ন, পরিত্যক্ত এবং জঙ্গলে আবৃত। এই মন্দিরটি অতীব প্রাচীন এবং কয়েকটি সুন্দর সজ্জা ও দশাবতার ফলক ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বাগনানের অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হোল দামোদরজীউর ইটের তৈরী, পূর্বমুখী নবরত্ন মন্দির। পাল-পাড়ার পাল পরিবার কর্তৃক ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ২২ ফুট। ত্রিখিলান দালানের ছাদ অর্ধবৃত্তাকার টানা খিলানের দ্বারা এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। খিলানের বামদিকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন প্রতিকৃতি, ডানদিকে কৃষ্ণলীলা এবং মধ্যস্থলে রামরাবণের যুদ্ধ ইত্যাদি। থামের গায়েও অনুরূপ ভাস্কর্য্য যেমন সামাজিক জীবন, শিকারদৃশ্য ও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাহিনী উৎকীর্ণ। এখানকার অপর পুরাকীর্তি একটি কালীমন্দির। বিরাট আকারের পোড়ামাটির দ্বারপাল এবং চূণবালির পলস্তারার উপর পদ্মের কাজ ও পাখির সমারোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জয়পুরের ধর্মঠাকুরের মন্দির ইটের তৈরি, পশ্চিমমুখী এবং অলিন্দবিহীন আটচালা মন্দির। ধর্মরাজ মন্দিরের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে খুবই কম। মন্দিরটি অনেকদিনের, ফলে জীর্ণ। সম্ভবতঃ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল। জীর্ণ হওয়ার ফলে অধিকাংশ ভাস্কর্য্য বিলুপ্ত। তবুও যে কয়েকটি সারিবদ্ধ পোড়ামাটির ফলক আজও চোখে পড়ে তা প্রশংসার দাবী রাখে। উচ্চতায় ৩০ ফুটেরও বেশী এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর

স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। এরই কাছাকাছি আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির আছে। তারমধ্যে শ্রীধরজীউর মন্দির অলংকরণ-সমৃদ্ধ। এটি অলিন্দযুক্ত, দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দির। বাঁকানো কার্নিসের নীচে দশাবতার ও পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি, খিলানের উপরে লঙ্কাযুদ্ধ, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতির দৃশ্য বিদ্যমান। গর্ভগৃহের ছাদ আগের মন্দিরের অনুরূপ। এই প্রসঙ্গে ঐ অঞ্চলের লক্ষ্মীজনার্দন জীউর এবং জলেশ্বর শিবমন্দিরের উল্লেখ না করে পারা যায় না। একটি দোতলা দালান মন্দির, অপরটি চারচালা মন্দির। স্থাপত্যপ্রকরণও বেশ দেখার মত। শেষোক্ত মন্দিরে কষ্টিপাথরে নির্মিত পালযুগের শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী এক বিষ্ণুমূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাতিহাল গ্রামের মজুমদার পাড়ায় বেশ কতকগুলি মন্দির আছে। অধিকাংশের প্রতিষ্ঠালিপি না থাকার জন্য নির্মাণকাল নির্ণয় করা শক্ত। তবে একটি পূর্বমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরের উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন, কেননা পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের অভিনবত্বপূর্ণ মন্দির আর নেই। লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্যে রাম এবং রাবণকে মুখোমুখি এ মন্দিরে অবতারণা করা হয়নি। সামাজিক দৃশ্যের বদলে নকাশি সজ্জার অবতারণাও ব্যতিক্রমস্বরূপ। উচ্চতায় ৪০ ফুটের কাছাকাছি।

মেল্লকগ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হোল মদনগোপালজীউর মন্দির। বিগ্রহ কৃষ্ণরাধিকা। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং অলিন্দযুক্ত। এই আটচালা মন্দিরটি উচ্চতায় ৪৫ ফুট এবং এর গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। পাথরের চৌকাঠের গায়ে খোদাই-এর কাজ। খিলানে তিনসারির অলংকরণ—উপরে মারীচবধের দৃশ্য, বামদিকে লক্ষ্মী-সরস্বতী এবং ডানদিকে রামলক্ষ্মণের মূর্তি। কার্নিসের নীচে দশাবতার ও পৌরাণিক দেবদেবী এবং অবশিষ্ট জায়গায় পোড়ামাটির ছোট বড় পদ্মফুলের ফলক দেখা যায়। মন্দিরটি অতীব প্রাচীন। সম্ভবতঃ ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি হয়ে থাকবে। ভিত্তিবেদীর উপর জোড়হস্তে গরুড়মূর্তি উড়িষ্যার

স্থাপত্যশিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দালানে কিছু কিছু হস্তপদাদি-ভগ্ন অবস্থায় বাসুদেব মূর্তির সন্ধান মেলে।

সুলতানপুর গ্রামের বিশিষ্ট পুরাকীর্ত্তি হোল একটি চারচালা মন্দির। মন্দিরটি খটিয়াল শিবের এবং সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি। মন্দিরটি অলিন্দহীন এবং উচ্চতায় প্রায় ত্রিশ ফুট। মন্দিরের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে, খিলানের মাথায় ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত পোড়ামাটির পদ্মফুল এবং তারই মাঝে মাঝে মারীচবধের দৃশ্য। তার ডানদিকে বৃক্ষশাখাধারী হনুমান এবং বামদিকে সর্পভোজনরত এক ময়ূরের ফলক। প্রবেশপথের খিলানে ফুলকারি নকশা এবং লম্ফমান সিংহমূর্তি। মন্দিরে কমপক্ষে পাঁচটি প্রতিষ্ঠালিপি চোখে পড়ে এবং তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য না থাকার জন্য নানারকম প্রশ্ন উঠতে পারে। মনে হয়, এই লিপিগুলি সংস্কারের পরবর্তী সময়ের। মন্দিরটি যে দেড়শো বছরের অধিক প্রাচীন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রামেশ্বরপুরের মত আটচালা শিবমন্দির মানিকুরাতে আছে—নরমাধব শিবমন্দির। মন্দিরটি পূর্বমুখী এবং উচ্চতা ৪০ ফুটের মত। মন্দিরটিতে প্রতিষ্ঠালিপি না থাকার জন্য নির্মাণকাল সঠিক নিরূপণ করার উপায় নেই। এর স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য হোল যে এর ছাদ দু'পাশের দেওয়াল থেকে আড়াআড়িভাবে খিলান তৈরি করে চারদেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর গম্বুজ। খিলানের বদলে লহরার উপর ছাদ স্থাপিত হওয়ার ফলে স্থাপত্যগত নতুনত্বের পরিচয় দেয়। সামনের দেওয়ালে ও প্রবেশপথে কুলঙ্গিমধ্যস্থ পোড়ামাটির দশাবতার, কৃষ্ণ-বলরাম, সুভদ্রা, শিব, মিথুনদৃশ্য উল্লেখযোগ্যভাবে নজরে পড়ে।

রাউতাড়া গ্রামে ঘোষ পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সীতারামজীউর দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দির এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি।

খিলানের সামনের দেওয়ালের নীচে সামাজিক চিত্র—অশ্বারোহী শিকারী, যুদ্ধসাজে সজ্জিত অশ্ব, পালকি মধ্যে বাবু, নৌকাভ্রমণ ইত্যাদি। উপরের সারিতে কৃষ্ণলীলা, বিবিধ পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি, বাদকবাদিকা ইত্যাদি। কুলঙ্গির মধ্যে বামদিকে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশসহ জননী দুর্গার মূর্তিটি অপূর্ব কারিগরিসম্পন্ন। টেরাকোটার অলংকরণও খুব উচ্চাঙ্গের, যদিও সংস্কারের অভাবে অধিকাংশ হতশ্রী। মন্দিরটি উচ্চতায় ৩৫।৩৬ ফুট এবং প্রতিষ্ঠাকাল সম্ভবতঃ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ের আরো পরে নির্মিত হয় দামোদর-জীউর মন্দির। মন্দিরে ভাস্কর্যের অভাব নেই, উচ্চতাও উপেক্ষণীয় নয়, তবুও পূর্বের মন্দিরের পর্য্যায়ে একে ফেলা যায় না।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে ভূরশুটের দ্বিতীয় গড় ছিল পাণ্ডুয়ায় বা পেঁড়ো গ্রামে। এইখানেই কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জন্মস্থান এবং তাঁরই জন্মভিটায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিনটি শিবমন্দির যা এখানকার দর্শনীয় বস্তু। একটি যজ্ঞেশ্বর, দ্বিতীয়টি বিশ্বেশ্বর এবং তৃতীয়টির নাম হরিশ্বর। শেষ দুটি একদুয়ারী আটচালা শিবমন্দির এবং এদের দেওয়ালে লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্য ও প্রস্ফুটিত পদ্মের টেরাকোটা কাজ দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ মন্দিরগুলি একই সময়ে তৈরি হয়ে থাকবে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়। এরই অদূরে রামেশ্বর শিবের শিখর দেউল—পূর্বমুখী, পঞ্চরথ। মন্দিরের দেওয়ালে টেরাকোটার অসংখ্য বিষয়বস্তু। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সামাজিক জীবনের আলেখ্য দেওয়ালে তুলে ধরা হয়েছে। তবে মন্দিরটি খুব প্রাচীন নয়।

বেলুড়মঠ এবং তৎসংলগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরটি পুরাকীর্তির পর্য্যায়ে না পড়লেও এদের স্থাপত্যশৈলী এতই অভিনব যে এ ধরনের দেবালয় পশ্চিমবঙ্গে আর নেই। স্বামী বিবেকানন্দ এই মন্দির সম্বন্ধে বলেছিলেন—

"এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয়

শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী ঘুরে শিল্প সম্বন্ধে যত সব idea নিয়ে এসেছি, তার সবগুলিই এই মন্দির নির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা করব। বহুসংখ্যক জড়িত-স্তম্ভের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। তার দেওয়ালে শতসহস্র প্রফুল্ল কমল ফুটে থাকবে। হাজার লোক যাতে একত্র বসে ধ্যানজপ করতে পারে নাটমন্দিরটি এমন বড় করে নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমনভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে দূর থেকে দেখলে ঠিক ওঁ কার বলে ধারণা হয়। মন্দির মধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মূর্তি থাকবে। দোরে দুদিকে দুটি ছবি এইভাবে থাকবে: একটি সিংহ ও একটি মেষ বন্ধুভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা যেন প্রেমে একত্র সম্মিলিত হয়েছে। মনে এইসব idea রয়েছে। এখন জীবন কুলোয় তো কাজে পরিণত করে যাব। নতুবা ভাবী generation ঐগুলি ক্রমে কাজে পরিণত করতে পারে তো করবে।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১৯১ পৃঃ, ৯ম খণ্ড।)

মন্দির সংলগ্ন উপাসনালয়টির উচ্চতা ১০৮ ফুট এবং এটি দক্ষিণমুখী। ছাদের বাইরের গঠন বাংলার চালা-আকারের এবং আমলকশীর্ষ উড়িষ্যার। এ ধরনের মন্দির ছোট ছোট আয়তনে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গে একাধিক করার প্রচেষ্টা হয়েছে।

এই জেলায় মসজিদ বা মাজারের সংখ্যা অল্প হলেও প্রাচীনত্বের দিক থেকে কম উল্লেখযোগ্য নয়। সতেরো শতকে নির্মিত চেঙ্গাইল, শিবগঞ্জ, জগৎবল্লভপুর, রাউতাড়া গ্রামের মসজিদ ও মাজার স্থাপত্যের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চব্বিশ পরগনা

বিশালায়তন চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশ অতি দুর্গম ও রহস্য-ময়। অথচ এই দুর্গম, রহস্যময় অংশেই আত্মগোপন করে আছে বহু পুরাতন মন্দির, অধিকাংশই জরাজীর্ণ বা অর্ধভগ্ন। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে এই জেলার বিভিন্ন অংশ বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের ভূমির অবনমন ঘটেছে বহুবার। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ধ্বংস করেছে বহু সমৃদ্ধ জনপদ। তাছাড়া, বাতাসে আর্দ্রতা ও লবণের ভাগ অত্যধিক হওয়ায় ইটের অট্টালিকা এবং মন্দিরের আয়ুষ্কাল কমে গেছে। প্রকৃতি আজও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় পূর্বের মতই অশান্ত। আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীর অরণ্যে ভূমির অবনমন ঘটছে। সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে স্থলভাগ, জীর্ণ মন্দিরগাত্র থেকে রাশি রাশি সুদৃশ্য অলংকৃত ইট খসে পড়ছে। শীর্ষদেশের আগাছা পরিষ্কার করে দেওয়া সত্বেও আবার অতি দ্রুত জন্ম নিচ্ছে নিম, তেঁতুল, বট ইত্যাদি গাছ। সংস্কার যদি অচিরেই না করা যায় তাহলে যেটুকু আছে তাও আমরা হারাব, আর হারাব আমাদের শিল্পীদের শিল্পসাধনা—সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী ঐতিহ্যও।

বাংলাদেশে যে শিল্পরীতি প্রচলিত ছিল চব্বিশ পরগনায় তা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত। রত্নমন্দিরের চূড়া নির্মাণের সময় স্থপতিরা রেখ, পীড়া এবং চালারীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। কখনও রেখ পীড়ার সাথে মিলিত হয়েছে, কখনও চালা মিলিত হয়েছে রেখর সাথে, আবার কখনও চালা একাই সৃষ্টি করেছে চূড়া। পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ রত্নমন্দিরই রেখ ও পীড়া একত্র মিলিত হয়ে চূড়া সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমায় সমুদ্রকূলবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ সুন্দরবন নামে অভিহিত। নিম্নবাংলায় যেখানে গঙ্গা বহুশাখা বিস্তার করে সাগরে আত্মবিসর্জন করেছে, 'প্রাচীন সমতটের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেই লবণাক্ত পল্লবময় অসংখ্য বৃক্ষ-গুল্ম সমাচ্ছাদিত শ্বাপদসঙ্কুল চরভাগ

সুন্দরবন বলে কীর্তিত। সুন্দরবন বর্তমানকালে চব্বিশ পরগনা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ—এই তিন জেলার অন্তর্গত। সুন্দরবন নাম নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন সুন্দরী গাছের জন্য সুন্দরবন, কেউ বলেন সুন্দর বনরাজির জন্য সুন্দরবন, কারো মতে বাখরগঞ্জে সুগন্ধা নদীর নাম থেকে সুন্দ্যা, সুন্ধার বন বা সুন্দরবন, কারো মতে সমুদ্রবনের অপভ্রংশ সুন্দরবন। যাই হোক, সুন্দরবন ছিল, আছে এবং থাকবে। তবে হয়তো স্থান পরিবর্তন করতে পারে অর্থাৎ আগে যেখানে ছিল আজ হয়তো সেখানে নেই। কলকাতা এবং শিয়ালদহের কাছে পুষ্করিণী খননকালে বোঝা যায় যে এই অংশও সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল এবং ক্রমেই উত্তর ও দক্ষিণে সরে যাচ্ছে। মহারাজা প্রতাপাদিত্য এই অঞ্চলে যে শিলাময় দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন তারই উত্তর-পূর্ব কোণে একটি শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। সুন্দরবনের ভীষণ অরণ্যানির মধ্যে বিবিধ কারুকার্য্যখচিত এবং অভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান এমন মন্দির আর দেখা যায় না। মনে হয় এটি মোগল আমলে কোন হিন্দু কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এর খিলান গোল নয়, পরন্তু মুসলমান স্থাপত্যানুগত খিলানের মত ত্রিকোণ মন্দির সুন্দরবনের একটি প্রধান নিদর্শন। মন্দিরের বাইরের ইটে, দেওয়ালের কার্নিসে নানা কারুকার্য্য আছে। প্রাচীন বাংলায় এই রেখা-দেউলের প্রভাব এসেছিল ভিন্ন প্রদেশ থেকে। উড়িষ্যার রেখা-দেউল নির্মাণ রীতিটি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন হিন্দু স্থপতিরা। অবশ্য স্থানীয় প্রভাব যে তার উপর ছিল না এমন নয়। উড়িষ্যার মতই বাংলার রেখা দেউল শীর্ষ থেকে ভূমিপৃষ্ঠ পর্যন্ত চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত—যেমন পিষ্ঠ, বাড়, গণ্ডী এবং মস্তক। পিষ্ঠ অংশটি দৃশ্যমান নয়। তাই মনে হয়, ভিত্তি ছাড়াই দেউল সোজা উপরে উঠেছে। বাড় অংশ আবার তিনভাগে, কখনও কখনও পাঁচভাগে বিভক্ত। পাভাগ, তালজাঙ্গ, বাদনা, উপরজাঙ্গ ও বরণ্ড। শীর্ষদেশ বা মস্তকও বিভক্ত হয়েছে চার অংশে, যেমন—বেঁকী, আমলক, কলস ও পতাকা।

বাংলাদেশের এই শিল্পরীতি একইভাবে অনুসৃত হয়েছে চব্বিশ পরগনা জেলায়।

চব্বিশ পরগনা জেলার অন্যতম মন্দির হলো জটার দেউল (আলোক চিত্র ২৫)। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মনি নদীর পূর্বতীরের বনভূমি পরিষ্কার করে বসতি পত্তনের সময় এই মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়। জটার দেউলের নামকরণ নিয়ে আজও প্রচুর মতভেদ আছে। কেউ বলেন জটাধারী নরখাদক বাঘের আশ্রয়স্থল হিসাবে এই মন্দিরটির এইরূপ নামকরণ হয়েছে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া একটি তাম্রলিপি অনুসারে একথা বলা যায় যে, রাজা জয়ন্তচন্দ্র হিন্দু যুগে আনুমানিক ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এই মন্দিরটিই উড়িষ্যা তথা বাংলাদেশের শিল্পরীতি অনুযায়ী স্থাপিত হয়েছিল। আবার অনেকে মনে করেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মন্দিরটি নির্মিত হয় প্রতাপাদিত্যের জয়স্তম্ভ স্বরূপ। আবার অনেকের মতে, এই মন্দিরটির নির্মাণকাল মুঘলযুগে। মহামান্য কাশীনাথ দীক্ষিত বলেন যে, মন্দিরটি উড়িষ্যার মন্দিরশৈলীর অন্তর্ভুক্ত এবং ভুবনেশ্বর মন্দির স্থাপিত হওয়ার পর এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের শীর্ষদেশ ভেঙ্গে পড়লেও মধ্যাংশ পর্য্যন্ত অটুট আছে। গণ্ডীর গায়ে অলংকরণের সমারোহ আজও চোখে পড়ে। বিশালায়তন এই দেউল আদিতে ছিল অপূর্ব লালিত্যমণ্ডিত। সাধারণতঃ রেখা-দেউলের ক্ষেত্রে রথপগের যে কাঠিন্য বর্তমান, তা জটার দেউলে অনুপস্থিত ছিল। রথপগের সযত্ন বিন্যাসে জটার দেউলের বাহ্যিক আকৃতি ছিল প্রায় বর্তুলাকার। মন্দিরটির আদি অবস্থার কিছু কিছু লক্ষণ নজরে আসে। বৃটিশ সরকার এই মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে মন্দিরটির সংস্কারের কিছু কিছু চেষ্টাও হয়েছিল কিন্তু এরজন্য যেসব ইট ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি অযত্নে তৈরী এবং তার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই অব্যবহার্য্য হয়ে পড়েছে।

সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলে আরও কয়েকটি বিগত-শ্রী জীর্ণদেহ

দেউলের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেবালয়গুলির দর্শনীয় আকর্ষণ কিছু না থাকলেও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব কিছু কম নয়। জটার দেউলের অনতিদূরে দেলবাড়ী গ্রামে প্রথম দেউলটি অবস্থিত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে দেবালয়টি আবিষ্কৃত হয় ভাঙাচোরা অবস্থায়। মন্দিরটি বর্তমানে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। প্রবেশপথের পাঁচিল স্থূল এবং লম্বাকৃতি। প্রবেশপথটি জটার দেউলের মতই খরদাল পদ্ধতিতে নির্মিত। আসন বর্গাকার এবং ভিতরে প্রবেশের জন্য কয়েক ধাপ সিঁড়ি আছে।

দ্বিতীয় দেউলটি আবিষ্কৃত হয় বনশ্যাম নগরে। দেলবাড়ীর মতই এই দেউলটির কেবলমাত্র বাড় অংশটিই অবশিষ্ট আছে। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং আগাছার উৎপাতে মন্দিরটি বিলুপ্তপ্রাপ্ত। দেউলটি উচ্চতায় ২৮।৩০ ফুট। আসন বর্গাকার এবং প্রবেশপথ জটার দেউল এবং দেলবাড়ীর মতই খরদালে গঠিত। বনশ্যামনগরের প্রায় সাত আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে গোবিন্দপুরে তৃতীয় বা শেষ দেউলটি আবিষ্কৃত হয়। খননকালের পূর্বেই গর্ভগৃহ ছাড়া দেউলের মূলদেহ বিনষ্ট হয়েছে। গৃহটি বর্গাকার এবং প্রবেশের জন্য সিঁড়ি আছে। কেন্দ্রস্থলে নাতিউচ্চ শিবলিঙ্গ আছে। এই মন্দিরটির নির্মাণকাল সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়. কেননা বাড় ছাড়া আর কিছুই দেউলটিতে অবশিষ্ট নেই! এই গ্রামের আরেকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির হোল শিবমন্দির। মন্দিরটি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এবং অলংকরণে সুসজ্জিত ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই মন্দির বর্তমানে জীর্ণ। তার কয়েকটি অলংকৃত ফলকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে মন্দিরটির লুপ্ত সৌন্দর্য্যের একটা ধারণা করা যেতে পারে। প্রথম ফলকে একটি গণেশমূর্তি উৎকীর্ণ, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, আয়ুধধারী, বরাভয়দাতা গণেশের মূর্তিটিতে শিল্প-লালিত্য ও গাম্ভার্য্য ফুটে উঠেছে। পরবর্তী ফলক এক যোদ্ধার প্রতিকৃতি—বীরোচিত এবং গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। একই আকৃতিবিশিষ্ট তৃতীয় ফলকে শিকারদৃশ্য—বর্শা হাতে শিকারীর মৃগের পশ্চাদ্ধাবন; শেষ ফলকে এক রমণী মূর্তি—অপূর্ব এই মূর্তিটির সন্নিবিষ্ট। ময়ূরপৃষ্ঠে

উপবিষ্ট এই রমণীর এক হাতে ধনুক অপর হাতে বাণ। ময়ূরের মুখে একটি মৃত সর্প। লালিত্যপূর্ণ এই মূর্তিটিতে অপরূপ কমনীয়তার ছাপ।

জয়নগরে মিত্রগঙ্গার তীরে আটচালা মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। আয়তনে উল্লিখিত না হলেও অঙ্গসজ্জা ও মিথুনদৃশ্য পরিকল্পনায় অদ্বিতীয়। সম্ভবতঃ, ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল। এই গ্রামের অদূরে অবস্থিত ছত্রভোগেও দুটি প্রাচীন মন্দির ছিল। একটির অবস্থান ত্রিপুরসুন্দরীর বর্তমান মন্দিরের পেছনে এবং অপরটির অবস্থান বদরিকনীয়ের (মন্দির প্রাঙ্গণে)। জয়নগরের নিকটে দেড়বেড়িয়া গ্রামে একটি আটচালা মন্দির লক্ষ্য করা যায়। আয়তনে উল্লেখযোগ্য না হলেও আকৃতি মোটের উপর সামঞ্জস্যপূর্ণ। অলংকরণের যে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তা হোল একই বিষয়বস্তুর ব্যবহার। পদ্ম, পদ্মকোরক, পদ্মপত্রসম্বলিত ফলক সর্বত্রই ব্যবহার করা হয়েছে। পোড়ামাটির ক্ষুদ্র নরমুণ্ড লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়।

সাগরদ্বীপের বিভিন্ন অংশেও কয়েকটি পুরাতন মন্দিরের সাক্ষাৎ মেলে। কচুবেড়িয়া খেয়াঘাটের অনতিদূরে মন্দিরতলা গ্রামে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয় মন্দিরটির নির্মাণকাল পালযুগ বলে মনে করেন।

গড়িয়ার নিকটবর্তী বোড়াল গ্রামে খননকার্য্যের ফলে আরও একটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়। সম্ভবতঃ, সেনযুগের শেষভাগে বা মুসলমানদের অনুপ্রবেশের অব্যবহিত পূর্বে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দির-গাত্রে অলংকরণ আজও কিছু কিছু চোখে পড়ে।

চব্বিশ পরগনায় প্রাচীন মন্দিরের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প, প্রায় নেই বললেই চলে। তার প্রধান কারণ হিসাবে একথা বলা যায়, যে সমস্ত মন্দির নির্মাণ হয়েছিল তা বাংলার প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে রক্ষা পায়নি; দ্বিতীয়তঃ, বাংলায় বিশেষ করে চব্বিশ পরগনায় বিধর্মীদের আগমন এবং তাদের অনুদার নীতি। অনেক মুসলমান শাসকই মন্দির বিনষ্ট করেছে, হিন্দু মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করেছে এমন নজীর বাংলার

ইতিহাসে বিরল নয়। এসব বিপর্য্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যা বেঁচে আছে তাও বিলুপ্তপ্রায়।

বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামে গোবিন্দদেবের দেউল। যদিও মন্দিরটির সঙ্গে দেউলটির কোন সামঞ্জস্য নেই তবুও মন্দিরটি দেউল নামে পরিচিত। মন্দিরটি ভগ্নপ্রায় হলেও গঠনরীতি বিচার করে একথা বলা যায় যে এককালে মন্দিরটি দ্বিতল ছিল। চতুষ্কোণ প্রথম তলার উপর অষ্টকোণাকৃতি কক্ষ স্থাপন করে এই মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিল। উপরে উঠার সিঁড়িও ছিল কিন্তু আজ অস্তিত্ববিহীন। প্রথমতলে প্রবেশ করার জন্য শক্ত খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার। আটদিক থেকে আটটি চালা উপরদিক থেকে উঠে একটি শীর্ষবিন্দুতে মিলিত ছিল। মন্দিরটি পোড়া মাটির অলংকরণে সুসজ্জিত ছিল এবং তার প্রমাণ যততত্র ছড়ানো ভাঙা ইটের মধ্যে পাওয়া যায়। বিবিধ পৌরাণিক বিষয়বস্তুও অলংকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হোত। ঘনীভূত কল্পলতা ও বৃহৎ পদ্ম যে দক্ষতার সঙ্গে পোড়ামাটিতে রূপায়িত করা হয়েছে তা নিতান্তই দুর্লভ। প্রবেশ পথের উপরে হাতীর সুদৃশ্য ফলক আজও দেখা যায়। ইছাপুরের এই মন্দির যে কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সঠিক বলা যায় না। তবে বিংশশতাব্দীর প্রথম থেকেই এই মন্দিরগুলি জীর্ণ হতে থাকে।

আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত রাজপুরের অন্নপূর্ণার মন্দিরটি সপ্তদশ শতাব্দীতে তৈরী হয়েছিল। আয়তনে গোবিন্দদেবের মন্দির অপেক্ষায় অনেক ক্ষুদ্র হলেও, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের দিক থেকে কোন অংশকেই উপেক্ষা করা যায় না। স্থানীয় জনসাধারণের যথেচ্ছ ব্যবহারে মন্দিরটি আজ বিপদাপন্ন। মন্দিরের গায়ে পদ্ম, পাখী ছাড়াও রামায়ণের বহু আলেখ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল; যেমন—রাম-রাবণের যুদ্ধ, বানরভক্ষণরত কুম্ভকর্ণ, হনুমানের বিশল্যকরণী আনয়ন ইত্যাদি। মন্দিরটি চার বা আটচালাবিশিষ্ট এবং নির্মাণকাল প্রদেশপাল সায়েস্তা খাঁর সমসাময়িক।

চব্বিশ পরগনার এমন অনেক মন্দির আছে যার বয়স আজ থেকে প্রায় দেড়শো দু'শো বছরেরও অধিক কিন্তু বার বার সংস্কারের ফলে মন্দিরগুলিকে খুব আধুনিক বলে মনে হয়। কেননা প্রাচীন ঐতিহ্যের স্পর্শ আর তাতে লেগে নেই। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার পর্বদহ গ্রামের পাটেশ্বরীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরটি আটচালাবিশিষ্ট প্রচুর অলংকরণে পূর্ণ কিন্তু সংস্কারের ফলে তা আর কোথাও অবশিষ্ট নেই। গঠনভঙ্গী লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বর্গাকারাসনের উপর দণ্ডায়মান চারটি দেওয়াল এমনভাবে উপরের আচ্ছাদনের সাথে মিলিত হয়েছে যা সামগ্রিকভাবে লালিত্যময় এবং এই লালিত্য অদ্যাবধি উপলব্ধি করা যায়।

পাটদহের অনতিদূরে মন্দিরবাজার গ্রামে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কেশবেশ্বরের আটচালা মন্দির। আরাধ্য দেবতা কেশবেশ্বর—শিব, তাই কেশবেশ্বরের মন্দির (আলোক চিত্র ২৬) বলেই খ্যাত। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটির নির্মাণকার্য্য সুরু হয়। এই মন্দিরের নামকরণ নিয়ে একটা সুন্দর গল্প আছে। মন্দিরের নির্মাতা রাজা কেশব রায়চৌধুরী। তিনি অপুত্রক থাকায় তাঁর মহিষী দেবাদিদেব মহাদেবের বর লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন এবং তপস্যা শেষে মহাদেব রাজা কেশব ও তাঁর মহিষীর সঙ্গে দেখা করে পুত্র বর প্রদান করেন। পুত্র লাভ করলে রাজা কেশব এই মন্দির নির্মাণ করেন। এই কিংবদন্তী যেমন অস্বীকার করার নয়, তেমনি শিবের নামানুসারে মন্দিরের নামকরণেরও প্রতিবাদ করা যায় না। এই মন্দিরের গঠন-প্রকৃতি বড় বিচিত্র। দৈর্ঘ্যের তুলনায় দেওয়ালের উচ্চতা কম আবার দেওয়াল ও আসনের তুলনায় আচ্ছাদনও কম। পাঁচ ফুট ভিত্তির উপর মন্দিরটি দণ্ডায়মান। এই মন্দিরের এতই বৈচিত্র্য ছিল যে দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা দেখতে আসত। বাহ্যিক গঠনের ক্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও আয়তন, অঙ্গসজ্জা এবং অভিনবত্বে

মন্দিরবাজারের মন্দির চব্বিশ পরগনা তথা পশ্চিম বাংলার আটচালা মন্দিরশৈলীর এক দর্শনীয় দৃষ্টান্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যথাসময়ে দেখাশুনা এবং সংস্কার না করার জন্য মন্দিরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। মন্দিরের গায়ে যে সমস্ত অলংকরণ ছিল তা ধ্বংস হতে চলেছে।

আলিপুর মহকুমার পাইকপাড়া বা পোকপাড়ি গ্রামে একটি পুরাতন ও উল্লেখযোগ্য মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি সম্ভবতঃ ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল এবং আয়তনে পাটেশ্বরী অপেক্ষা বড় এবং কেশবেশ্বর অপেক্ষা ছোট। কিন্তু গঠন প্রকৃতিতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই এবং প্রতিটি অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী যা কেশবেশ্বরের মন্দিরে অনুপস্থিত। মন্দিরটি অলংকরণমুক্ত ছিল না যেমন পুষ্পশাখা, সর্পভক্ষণরত ময়ূর ইত্যাদি ছাড়া রামায়ণের দৃশ্য বিশেষতঃ রাম-রাবণের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আমতলার নিকটে বাওয়ালী গ্রামে রাধা-বল্লভজীউর মন্দির উল্লেখযোগ্য। একদা মন্দিরটি সুসজ্জিত ছিল। এখনও আচ্ছাদনের নীচে উত্তর দিকে তিনটি করে মোট ছয়টি অলংকৃত ফলক দেখতে পাওয়া যায়। এক প্রান্তে দেবী চণ্ডীর উপাসক দুই সন্ন্যাসী, অপর প্রান্তে শিবপূজারত তিন সন্ন্যাসী এবং কেন্দ্রে দেবী চণ্ডী। এছাড়া এই গ্রামে জমিদার মণ্ডল বংশের দশ বারোটি দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চসহ মন্দির আছে। তারমধ্যে একটিতে পোড়ামাটির অলংকরণ আছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং আটচালা মন্দিরের চালার আলিসার। সুন্দর ফুলের নক্সাকাটা ও চূণবালির ছ'টি ফুলের তোড়া দেখা যায়। চূড়ায় তিন সারিতে দু'টি করে মোট ছ'টি ঘট স্থাপিত। মন্দিরের সামনে নাটমন্দির। এই মন্দিরের পূবপাশে গোপীনাথজীউয়ের নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী ও সম্মুখে নাটমন্দির। মন্দিরটি ১২০১ বঙ্গাব্দে নির্মিত। এই মন্দিরের পিছনে আটচালা-বিশিষ্ট রাধাকান্তজীউর মন্দির—সুন্দর লতাপাতা, পাতাফুলের নকসায়

পরিপূর্ণ। মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ দেখার মত জিনিষ ছিল কিন্তু সংস্কারের ফলে অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। এই মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে বনের মধ্যে একটি আটচালাবিশিষ্ট বিরাট মন্দির দেখা যায়। মন্দির দক্ষিণমুখী এবং কিছু কিছু পোড়ামাটির কাজ আছে। অলংকারবিহীন আরো আটচালা মন্দির এই গ্রামে আছে। রাসমঞ্চের দিক থেকে ধান্যকুড়িয়ার রাসমঞ্চের (আলোকচিত্র ২৭) কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। এহেন অপূর্ব রাসমঞ্চ চব্বিশ পরগনায় আর কোথাও নেই। গঠনশৈলীর দিক থেকে মনোরম এবং অলংকার শোভিত। রাজারামপুরের মন্দিরটিতেও পৌরাণিক জীবনের পাশে সামাজিক জীবনের চিত্র স্থান পেয়েছে। এতে শিল্পীর বাস্তবমুখিতা ও সমাজচেতনার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। পোড়ামাটির বিভিন্ন অলংকরণের মধ্যে রামরাবণের যুদ্ধ, প্রসবরতা দেবকী, অশ্বমেধ যজ্ঞ ইত্যাদি পৌরাণিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। এছাড়া হাস্যালাপরত দুই বৃদ্ধ, প্রসাধনরতা সম্ভ্রান্ত মহিলা, ক্রয়-বিক্রয়ের দৃশ্য ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের উল্লেখ উত্থাপিত হয়েছে।

বাণেশ্বর পঞ্চাননের মন্দির দু'টি পোড়ামাটির উৎকৃষ্ট অলংকরণের জন্য উল্লেখযোগ্য। বামদিকের মন্দিরটির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পোড়ামাটির ফুল, লতা-পাতা, দেবদেবী ইত্যাদি নানাবিধ নকসা দৃশ্যমান। খিলানশীর্ষে কোন পৌরাণিক দৃশ্য স্থান পায়নি। দক্ষিণ পাশের মন্দিরটির পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বহু অলংকৃত ফলক আছে। বিষয়বস্তু এক ধরনের হলেও দু'একটিতে মিথুন দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। দেব-দেবী, মানুষ অপেক্ষা লতা-পাতা ও পাখীর নক্সাই মন্দিরটিতে স্থান পেয়েছে বেশী।

হালিসহরে কয়েকটি পুরাতন মন্দিরের মধ্যে বারেন্দ্র গলির নন্দকিশোর মন্দির উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য মন্দিরগুলি ধ্বংস-প্রাপ্ত হলেও এই মন্দিরটি আজও নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। পোড়ামাটির অলংকরণে মন্দিরটি প্রশংসার দাবী রাখে। মদনগোপাল

রায় নামক এক ব্যক্তি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এই শিব মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরটি আটচালা এবং গঠন প্রকৃতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলকের সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যে নন্দকিশোরের মন্দিরই অধিক সুন্দর। খিলানের উপর রাম-রাবণের যুদ্ধের বিস্তীর্ণ দৃশ্য। প্রবেশ পথের ছ'দিকে বিচিত্র লতা, ফুল ও পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি স্থান পেয়েছে। জগদ্ধাত্রী, বৃষারূঢ় পঞ্চানন, অপ্সরা প্রভৃতি উৎকীর্ণ হয়েছে। সমসাময়িক ইউরোপীয়দের দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি দিকের প্রতিফলন হয়েছে পোড়ামাটির অলংকরণে। এই চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, যে সমস্ত ইউরোপীয় প্রভাব মন্দিরটিতে এসে পড়েছে তা হোল—(১) বাসভবনে বিশ্রামরত পর্তুগীজ, পরিচর্যারতা রমণীর নিকটে গৃহপালিত কুকুর ; (২) শিকারকার্য্যে পর্তুগীজরা ; (৩) বন্দীপ্রাপ্তা নারীর অধিকার নিয়ে পর্তুগীজ সৈন্যেরা বিবদমান ; (৪) ভারতীয়দের (পুরুষ ও নারী) নিয়ে বিদেশীদের সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি। মুঘল শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এক সময় পর্তুগীজ জলদস্যুরা যে ভারতে তথা গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং নিরীহ নরনারীর উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল তারই প্রতিচ্ছবি এই মন্দিরটিতে। কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক দৃশ্যগুলি আয়তকার ফলকে উৎকীর্ণ। মূর্তিগুলি আকারে ছোট হলেও অঙ্গসঞ্চালন এবং মুখভঙ্গীতে জীবন্ত উজ্জ্বল অথচ নয়নাভিরাম। শিল্পীরা এই ফলকগুলিতে গতি ও ছন্দের সমতা রক্ষা করেছেন। স্থাপত্যগত গুরুত্ব না থাকলেও অলংকরণের উৎকর্ষতা বিচারে নন্দকিশোরের মন্দির নিঃসন্দেহে এক সার্থক সৃষ্টি।

খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দিরটি (আলোকচিত্র ২৩) চবিশ পরগনার আটচালা শৈলীর মন্দিরগুলির অন্যতম। সম্ভবতঃ ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই মন্দির একদা পোড়ামাটির অলংকরণে সুসজ্জিত ছিল। অভিনবত্বে, বৈচিত্র্যে ও সমৃদ্ধিতে বৃটিশ যুগের মন্দির শিল্পচর্চ্চার এক উজ্জ্বল সাক্ষর খড়দহের এই শ্যামসুন্দরের মন্দির। উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট, চূণার থেকে পাথর আনিয়ে এই মন্দির

নির্মিত হয়। ইটের ব্যবহার এখানে হয় নি। অলিন্দগাত্রে নয়নাভিরাম প্রাচীরচিত্রগুলিই মন্দিরের মূল আকর্ষণ, যেমন---রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও শিবলীলা। প্রথম চিত্রে, বৃষারূঢ় হরপার্বতী, দুইপাশে নন্দী ও ভৃঙ্গী। দ্বিতীয়টিতে, বনবাসান্তে অযোধ্যায় রাজত্বকারী রামের সভাদৃশ্য। তৃতীয়টিতে, গণেশের বন্দনারত দুই ব্যক্তি। চতুর্থ চিত্রটিতে বৃন্দাবনের কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ। এছাড়া বিষ্ণুর অবতার-বিষয়ক চিত্র—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম, রাম, কল্কি ইত্যাদি। কৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক, বিশেষ করে বাল্যলীলার চিত্রও আঁকা আছে। এর প্রাচীরের গায়ে আরেকটি চিত্র বড় মনোরম। প্রাসাদ-উদ্যানে উপবিষ্টা অন্যমনস্কা রাধা। উদ্যানসংলগ্ন প্রাসাদের এক কোণ থেকে কৃষ্ণ গোপনে রাধাকে দেখছেন। কিন্তু তার এই আগমন যিনি জানতে পেরেছেন তিনি সখী বিশাখা। বিশাখা তাই তা বোঝাবার জন্য রাধার নিকট মুকুর ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। মুকুরে কৃষ্ণকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনাদর ও অবহেলার দরুণ এই মন্দিরের অলংকরণ আজ ধ্বংস হতে বসেছে। এদের সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন। শ্যামসুন্দরের মন্দির ব্যতীত আরও অনেকগুলি মন্দির আছে। যেমন—গোপীনাথ মন্দির, মদনমোহন মন্দির, রাধাবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির, রাধাকান্ত, অন্নপূর্ণার মন্দির উল্লেখযোগ্য। মদনমোহন মন্দির আটচালা। রাধাকান্ত মন্দির থেকে কিছু দূরে প্রাসাদতুল্য লক্ষ্মী-নারায়ণজীউর পশ্চিমমুখী মন্দির। মূল মন্দিরের পাঁচটি চূড়ার মাঝখানটিতে পর পর তিনটি কলস ও তার উপর বিষ্ণুচক্র। লক্ষ্মীদেবী-সহ বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী মূর্তি। মূর্তি ও মন্দিরের মেঝে শ্বেতপাথরের।

কাঁচড়াপাড়ায় কৃষ্ণরাই মন্দিরের একমাত্র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তার গঠনপ্রকৃতি। মন্দিরটি উচ্চতায় ৭০ ফুট, প্রস্থে ৪০ ফুট এবং চারদিক সুউচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। মন্দিরের সামনের দেওয়াল বড় বড় পোড়ামাটির পদ্মফুল দ্বারা শোভিত। বর্তমানে এই দেওয়ালে

চুণ-বালির প্রলেপ পড়ায় শিল্পসৌন্দর্য্য বহুলাংশে নষ্ট হয়েছে। গর্ভ-গৃহের দরজায় খোদিত দশাবতার মূর্তি ও অপূর্ব সুন্দর লতাপাতার শিল্পকার্য্য সহজেই মানুষের মন কেড়ে নেয়। সমস্ত মন্দিরটির কারুকার্য্য ও স্থাপত্যশিল্প বাস্তবিক প্রশংসনীয়। এই বিরাট মন্দিরে কোথাও খিলানের ব্যবস্থা করা হয় নি। মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি হয়েছিল। এ ছাড়া, গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলের দু'টি অঞ্চলে দু'টি জীর্ণ পঞ্চরত্ন মন্দির লক্ষ্য করা যায়। বাংলা মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাও কেশবেশ্বরের মন্দিরে অনুপস্থিত। গর্ভগৃহের তিনদিকে তিনটি খিলান আছে। খিলান শীর্ষে পোড়ামাটি ও চূণামাটির নানারকম কারুকার্য্য—যেমন পতাকাশোভিত মন্দিরে পদ্ম, সেবিকা পরিবেষ্টিত বিষ্ণু, চণ্ডী ইত্যাদি। এই মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং ইটের তৈরি। মন্দিরটি আটচালা গঠনে নির্মিত হলেও সাধারণ রীতি অনুযায়ী নীচের চালাগুলি মূল মন্দির-ঘরের দেওয়ালের সংযুক্ত হয়ে সরাসরি না নেমে মন্দিরের চারিদিকের বারান্দার উপর সমতল ছাদ সৃষ্টি করে চালা আকারে নেমেছে। মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূলযুক্ত কলস এবং দেওয়াল পোড়া-মাটির শিল্প অলংকরণ পরিপূর্ণ। দেওয়ালের গায়ে যে লিপি উৎকীর্ণ তা এরূপ—

আকাশাব্দি রসঃ ক্ষৌণীমিতে শাকে শিবালয়ং।
ভূপঃ শ্রীকেশবোকাজ্ক্ষীদ্বাসুদেবেন শিল্পিনা॥

কিন্তু নির্ণয়কাল সঠিক নিরূপণ করা যায় না প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে। মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ পর্বে মন্দির দু'টি নির্মিত হয়েছিল এবং কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য নন্দকিশোর মন্দিরের সমসাময়িক বলে ধরা হয়। মন্দিরগুলির রত্নগুলি ত্রিরথ এবং অঙ্গসজ্জায় যথেষ্ট নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় মেলে। নানাবিধ পৌরাণিক দৃশ্য, পুষ্পস্তবক, পদ্ম ইত্যাদি মন্দিরগাত্রে ইতঃস্তত বিরাজমান।

বিষ্ণুর অবতাররূপ গ্রহণ, কৃষ্ণের জন্ম ও লীলা ইত্যাদি প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যানগুলি যত্ন সহকারে শিল্পীরা উৎকীর্ণ করেছেন।

এছাড়া বাওয়ালী গ্রামে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি নবরত্ন মন্দির নির্মিত হয়। নির্মাতা তদানীন্তন ভূস্বামী মানিকচন্দ্র। অলংকৃত না হলেও মন্দিরটিতে স্থাপত্য গাম্ভীর্য্য আছে। রত্নগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট এবং বেশ সতর্কতার সঙ্গে তৈরী। প্রথমতলের রত্নগুলি রথযুক্ত। গণ্ডী অপেক্ষা বাড় কিছু বড়, তবে গণ্ডীর পরিকল্পনায় শিল্পী রেখর সুললিত বঙ্কিম ভঙ্গিটির উপর সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। দ্বিতলের রত্নগুলি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু গঠনে প্রথম তলার রত্নের অনুরূপ। কেন্দ্রের রত্নটি আয়তনে বৃহত্তম।

চব্বিশ পরগনার শিল্পশৈলীও বাংলার অন্যান্য জেলার মত ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবিত। শিল্পী নূতনত্বকে সব সময় আহ্বান করে থাকে, তাকে তার শিল্পে স্থান দেয়। চলতি সমাজ ব্যবস্থাও শিল্পে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তাই ইউরোপীয়দের আগমনে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, তাদের প্রতিকৃতি পর্য্যন্তও বহু শিল্পীরা শিল্পে অবতারণা করেছেন—এমন কি শেষ পর্য্যন্ত তাদের শিল্পরীতিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। নবগঠিত মন্দিরের কথা বাদ দিলেও প্রাচীন প্রথায় ইউরোপীয় যে সমস্ত মন্দিরগুলি অধুনা সংস্কার হচ্ছে —তাও ইউরোপীয় ধাঁচে হবার জন্য তাদের নিজেদের অস্তিত্ব এমনকি অলংকরণ সজ্জা বহুলাংশে হারিয়ে গেছে। দক্ষিণেশ্বর ও টিটাগরের মন্দির দেখলে বেশ কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। যে সময়ে বাংলার স্থপতিরা, ভাস্করেরা অবলুপ্তির পথে, অর্থাৎ অর্থ-নৈতিক চাপে জর্জরিত হ'য়ে ভিন্ন জীবিকার আশ্রয় নিয়েছে সেই সময়ে এই দু'টি বিশাল মন্দির নির্মিত হয়েছে। প্রথমটি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। মন্দির দু'টির গঠন-প্রকৃতি অতীব সুন্দর। অর্থ ব্যয় যেমন হয়েছে, তেমনি শিল্পীরাও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সৃষ্টিকে সার্থক করে তোলার জন্য। বৃটিশ যুগের শেষ ভাগে

চব্বিশ পরগনায় যে কয়েকটি আটচালার মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তার মধ্যে আগড়পাড়ার গঙ্গাতীরে গিরিবালা দাসী প্রতিষ্ঠিত ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। চূণ-বালির কারুকার্য্যের চমৎকার দৃষ্টান্ত। এই পর্য্যায়ে পোড়ামাটির ব্যবহার কমতে সুরু করে এবং চূণ-বালির ব্যবহার আরম্ভ হয়। এতে মনে হয় ইউরোপীয় প্রভাব খুব সুস্পষ্ট, যদিও ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে চূণ-বালির ব্যবহার অজানা ছিল না। বিচিত্র ফুলপাতার সঙ্গে ফেস্টুন ইত্যাদির ব্যবহারে মন্দিরটি বিশেষ আকর্ষণীয়। জনৈকা রমণী অর্ধ উন্মুক্ত দ্বারপথে কারো জন্য অপেক্ষমানা। "ফ্রেঞ্চডোর", "সানলাইট" ইত্যাদি উপস্থাপনায় এবং রমণীর পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে ইউরোপীয় প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এছাড়া প্রবেশ পথে হরপার্বতী এবং অনন্তশয্যায় বিষ্ণুর চূণ-সুড়কীর অলংকরণ উল্লেখযোগ্য।

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় মহেশপুর গ্রামে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের কাঠের থামগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে, কেননা মূল মন্দিরটির অস্তিত্ব আজ নেই বললেই চলে। বর্তমানে থামগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় সাতফুট। এগুলির দৈর্ঘ্য আরও বড় ছিল বলে মনে হয়। আবহাওয়া ও কীটের আক্রমণে এগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত, ফলে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের বিলুপ্তি ঘটেছে। কয়েকটি স্তম্ভের গায়ে লতা-পাতা-ফুল ইত্যাদির বহু নক্‌সা, জীবজন্তু ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বিভিন্ন দৃশ্যগুলি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাঠের প্যানেলগুলিতে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে।

কিছুদিন পূর্বে আশুতোষ মিউজিয়ামের (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) তত্ত্বাবধানে দেগঙ্গার কাছে চন্দ্রকেতুগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকার্য্যের ফলে বাঙলার ও বাঙালীর ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ সংগৃহীত হয়েছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে সমস্ত পুরাবস্তু ঐ স্থান থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার বেশীর ভাগই মৌর্য্য-গুপ্ত সময়ের। একশত রৌপ্যমুদ্রা—যা নাকি প্রাচীন ভারতের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যম

ছিল, এই খননকার্য্যের ফলে তা উদ্ধার হয়েছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব দুই শতক থেকে খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতকের ব্রাহ্মী ভাষা মুদ্রিত টেরাকোটা, শীলমোহর, জাহাজ ছাপাঙ্কিত তাম্রলিপি, রোমীয় প্রভাবিত পান-পাত্র, গ্রীসীয় প্রভাবান্বিত (Hallenistic) টেরাকোটা মূর্ত্তি, মৌর্য্য-যুগীয় কিছু এবং শুঙ্গ ও কুষাণযুগীয় সুপ্রচুর পঞ্চচূড়া যক্ষিণী মৃৎফলক, গুপ্তযুগীয় স্বর্ণমুদ্রা প্রভৃতি এই খননকার্য্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব দুই শতকের পাওয়া একটি সূর্য্যরথ টেরাকোটা আমাদের সব-চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পশ্চিম ভারতের ভোজ-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। খণা-মিহিরের ঢিবির খননকার্য্যের ফলে একটি বুদ্ধ মূর্ত্তিও উদ্ধার হয়েছে। বুদ্ধমূর্তি আসীন এবং আবক্ষ লাল বেলে-পাথর মূর্তি। সম্ভবতঃ, খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে মথুরা শিল্পী কর্তৃক নির্মিত। খাস-বালান্দার অদূরে ভাঙ্গড়ে খ্রীষ্টাব্দ দশম-একাদশ শতাব্দীর পাওয়া কষ্টিপাথরের মঞ্জুশ্রী মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইছাপুরে নদীয়ার রাজা রাঘবের সহায়তায়, ঢাকার আসান বক্স নামে এক মুসলমান গোবিন্দজীউর মন্দির নির্মাণ করেন—নবরত্ন মন্দিরসহ জোড়বাংলা মন্দির ও দোলমঞ্চ। বর্তমানে নবরত্নের মধ্যে একটিও অবশিষ্ট নেই, তবে নীচের দেওয়াল সুগঠিত। এই জীর্ণ, ভাঙ্গা মন্দিরের দেওয়ালে সুন্দর পোড়ামাটির শিল্পকার্য্যগুলি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরাভ্যন্তরে গোবিন্দজীউ একক, রাধিকা নেই।

বারাসাত থানার অন্তর্গত সাইবানা গ্রামে নন্দদুলাল জীউর মন্দির ঠিক কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও খড়দহে শ্যামসুন্দরের মন্দিরের সমসাময়িক, সম্ভবতঃ, সেটা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে। মন্দিরটি সমতল ছাদবিশিষ্ট, পূর্বমুখী, মেঝে শ্বেতপাথরের। রাধিকামূর্তি ধাতুময়ী এবং কৃষ্ণমূর্তিটি কষ্টিপাথরের। নাটমন্দিরসহ মূল মন্দিরটি প্রাচীর বেষ্টিত। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে ইটের তৈরী আটচালা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। বারাসাত-হাসনাবাদের অন্তর্গত হাড়োয়া গ্রাম। এরই অদূরে

খাসবালান্দা। অনেকের অনুমান, বৌদ্ধযুগে এখানেই ছিল বালান্দা-বিহার। গাঁয়ের মাঝ বরাবর উঁচু ঢিবির উপর লাল মসজিদের ধ্বসে-পড়া বিরাট ইমারত। দু'মিটার চওড়া লাল ইটের দেওয়াল আর মিহিদানার বেলেপাথরের খিলানকাটা স্তম্ভে গড়া লাল মসজিদের-একটা অংশ অতীত আভিজাত্যের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। মিনারের গায়ে ইটের শতদল পদ্ম, ছোট ছোট ফুলকাটা বৃত্তলহরী আর সুষম অলংকারিত নক্সা। কারো কারো মতে পাথরের স্তম্ভগুলি গুপ্তযুগের কোন বিধ্বস্ত হিন্দু দেউলের আর ইটের ইমারত সুলতানী আমলের। পুরাকীর্তিটি ইসলামী স্থাপত্যকলা আর হিন্দুমন্দির অলংকরণরীতির এক দুর্লভ সংমিশ্রণের নিদর্শন। কয়েক বছর আগে ঢিবির খননকার্য্যের ফলে কিছু পাথরের ভাঙা দেবদেবী মূর্তি উদ্ধার হয়েছিল বলে প্রকাশ। আর আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রাচীন-কালের পোড়ামাটির পুতুল, পাথরের মূর্তি, সীলমোহর, পুঁতিদানা, মুদ্রা ও আরও নানা বেসাতি। সংস্কার ও সংস্করণের অভাবে লাল মসজিদ আজ ধ্বংসের শেষ পর্য্যায়ে। বারাসাত মহকুমায় বেড়াচাঁপা গ্রামে একটি ছোট পোড়ামাটির মন্দির উদ্ধার করা হয়েছে। মন্দিরটির গড়ন অভিনব ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দু'টি গোল থামের উপর ঘণ্টার মত মন্দিরশিখর, তিন স্তরে ক্রমশঃ ছোট হয়ে উপরে উঠে গেছে। মূল শিখরের দু'পাশে গোলথামে ভর করে আছে ঢালু ছাউনী। খুব সম্ভবতঃ, নিদর্শনটি খেলনা গাড়ির উপরের অঙ্গ। স্থাপত্যরীতি দেখে মনে হয় একটি বৌদ্ধ স্থাপত্য। এমন কি প্যাগোডার প্রোটোটাইপ হওয়াও বিচিত্র নয়। খুদে মন্দিরটির নীচের অংশে বিচিত্র পাগড়ি পরা এক মূর্তির ভাঙ্গামুণ্ড। মন্দিরের পিছনে আবছা দু'একটি ব্রাহ্মী অক্ষর। এ ধরনের হরফ চার পাঁচ খ্রীষ্টাব্দে চালু ছিল।

বহুড় একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। রায়মঙ্গল কাব্যে বহুক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। এই অঞ্চলে খননকার্য্যের ফলে কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। বহুড় গ্রামে শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির উল্লেখযোগ্য;

কারণ ফ্রেসকো দ্বারা সুসজ্জিত। ফ্রেসকো মন্দিরের সংখ্যা এদেশে খুবই কম। এই মন্দিরের ফ্রেসকোগুলি এখনও অম্লান এবং চিত্রগুলির শিল্পকার্য্য প্রশংসনীয়। মন্দিরটি সম্পূর্ণ পাথরের এবং সুদূর জয়পুর থেকে পাথর সংগৃহীত হয়েছিল। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী :এবং সমতল ছাদবিশিষ্ট। সম্ভবতঃ, ১৮২১ সালে শ্যামসুন্দরের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি পশ্চিম-ভারতীয় স্থাপত্যরীতি অনুসারে নির্মিত। খিলানের ও স্তম্ভের ব্যবহারও যথেষ্ট হয়েছে। মন্দিরের প্রবেশ পথের দু'পাশে পুষ্পিত বৃক্ষশাখা ও পদ্মের ব্যবহার করা হয়েছে। খিলানের শীর্ষে ও দু'পাশেও এই একই মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, পরশুরাম, রাম ও কল্কি। বিষ্ণু বিষয়ক দু'টি মোটিফ দেওয়ালের শীর্ষে স্থান পেয়েছে। অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণু, বিষ্ণুর পদতলে লক্ষ্মী এবং নাভিদেশ থেকে ব্রহ্মা উত্থিত। তাছাড়া রাধার মানভঞ্জন, কালিকৃষ্ণ, কংসবধ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা, ফ্রেসকোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চৈতন্যদেবের ষড়ভুজ মূর্ত্তি এবং তাঁর পাশে দণ্ডায়মান রাজা প্রতাপরুদ্র ও সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম। মন্দিরের ডানদিকের দেওয়ালে প্রাসাদ উদ্যানে উপবিষ্টা অন্যমনস্কা রাধা। উদ্যান সংলগ্ন প্রাসাদের একপাশ থেকে কৃষ্ণ গোপনে রাধার দিকে চেয়ে আছেন। আয়নায় রাধা ও কৃষ্ণের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটু হেলিয়ে আয়না ধরে থাকার উদ্দেশ্য—কৃষ্ণের উপস্থিতি সম্বন্ধে রাধাকে সজাগ করিয়ে দেওয়া। পশ্চিমদিকের দেওয়ালে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ও যমুনা নদী। দেওয়ালের মাঝখানে রাসমণ্ডলে বংশীবাদনরত কৃষ্ণ ও পাশে রাধা ও একজন সখী। প্রবেশ পথের উপরে বৃষোপরি হরপার্ব্বতী, পাশে নন্দী ও ভৃঙ্গী। দ্বিতীয় প্রবেশপথে রাসলীলা, তৃতীয়টিতে গণেশ, চতুর্থটিতে চৈতন্যলীলা এবং পঞ্চমটিতে রাধাকৃষ্ণ আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ। মন্দিরের দেওয়ালে ভেনেসিয়ান জানালা দেখা যায়।

জয়নগরে দ্বাদশ শিব মন্দিরের গায়ে সুন্দর পোড়ামাটির অলংকরণ

ছিল এবং তাতে নরনারীর মৈথুনদৃশ্য স্থান পেয়েছিল। হাণ্টার সাহেব এগুলিকে Indecent Sculptures বলে উল্লেখ করেছেন (Statistical Accounts of Bengal)। মন্দির সংলগ্ন দোলমঞ্চের গঠনে আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির ছাপ পড়লেও মঞ্চটি আধুনিক নয়।

সোনারপুরে ভবানীশ্বর শিবমন্দির আটচালা এবং পূর্বমুখী। ১৭১১ শকাব্দে নির্মিত। এর দেওয়ালের গায়ে অনেক ফুল, লতাপাতা, রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি ইত্যাদির পোড়ামাটির শিল্পকার্য্য দেখা যায়। চূণ-বালির প্রলেপে কিছুটা হৃতশ্রী।

মেদিনীপুর

কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত মেদিনীপুর।

অরণ্য সমৃদ্ধ মেদিনীপুর ইতিহাসের পাতায় বিপ্লবী মেদিনীপুর হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই জেলার বুকের উপর দিয়ে বিপ্লব ও বিদ্রোহের ঝড় বয়ে গেছে। মেদিনীপুরের উত্তরে রাঢ় অঞ্চলের পাথুরে শক্ত জমি, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে সমতল সরস মাটি, দক্ষিণ সীমা দিয়ে সুবর্ণনদী প্রবাহিত। পূর্ব সীমানা চিহ্নিত করে রূপনারায়ণ নদী হুগলী নদীতে এসে মিশেছে। এ ছাড়া মেদিনীপুরের নিজস্ব নদী শীলাবতী, কংসাবতী, কালিঘাই আর রসুলপুরের নদী।

উড়িষ্যার সঙ্গে মেদিনীপুরের যোগসূত্র অনেকদিনের। এই জেলার অধিকার নিয়েও সংঘর্ষ বেঁধেছে বহুবার। এককালে উড়িষ্যা রাজ্য দামোদর নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উড়িষ্যার হিন্দুরাজা হরিচন্দন মুকুন্দ ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর নামেই ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ ঘাট। বাংলার সুলতান সুলেমান কররাণীর পুত্র দায়ুদ খাঁ শুধু মেদিনীপুর অঞ্চল নয়, উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ পর্য্যন্ত দখল করেছিলেন। মুঘলদের সঙ্গে দায়ুদ খাঁর যুদ্ধ হওয়ার সময় আকবরের সেনাপতি টোডরমল মেদিনীপুর দখল করেন। নবাব আলিবর্দ্দীর সময় মারাঠা বর্গীদের বাংলাদেশ বার বার আক্রমণে প্রপীড়িত হয়। শান্তি স্থাপনের জন্য নবাব আলিবর্দ্দী তাদের সঙ্গে এক স্থায়ী সন্ধি স্থাপন করলেন। ফলে উড়িষ্যার সুবাটিকে রঘুজী ভোঁসলের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। বাংলার সীমানা সূচিত হয় সুবর্ণনদী আর সেই সময় থেকেই মেদিনী-পুর পশ্চিমবাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই জেলার নামকরণ নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। তবে মনে হয় মেদিনীকরের (মেদিনীকোষ অভিধান রচয়িতা) নাম অনুসারে এই জেলার নাম হয় মেদিনীপুর।

মেদিনীপুরের পরবর্ত্তী ইতিহাস সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। ১৭৬০

খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশেমের সময় ইংরাজরা চট্টগ্রাম, বর্ধমান সমেত মেদিনী-পুরের জমিদারী গ্রহণ করে এবং অন্যায়ভাবে খাজনা আদায় করে। খাজনা জর্জ্জরিত সাধারণ মানুষের জীবন উত্তপ্ত হয়ে ওঠার ফলে স্থানে স্থানে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহের মধ্যে চূয়াড় বিদ্রোহ ইতিহাসের পাতায় এক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল। অনেকে চোর, ডাকাত, ঠ্যাঙ্গাড়েকে চূয়াড় আখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু ঘটনাটা ঠিক নয়। এরা ছিল পরাক্রমশালী জাতি। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এদের চিরদিনই সমাজে হীন করে রাখার চেষ্টা করেছিল এবং ইংরাজ রাজত্বের সুযোগে এই সমস্ত হিন্দুরা নানা-প্রকারে ইংরাজদের এই সমস্ত চূয়াড়দের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিল। ফলে চূয়াড়রা ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাইক বিদ্রোহ, চূয়াড় বিদ্রোহের সঙ্গে যোগ দিলে বিদ্রোহের আকার ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায়। এই দুই বিদ্রোহের পরিণতি ঘটল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর কাছে বাংলাদেশ বিশেষ করে মেদিনীপুর কোনদিন মাথা নত করেনি, তাই স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের নাম সর্বাগ্রে দেখা যায়। অগ্নিশিশুদের রক্তে মেদিনীপুর আজও রঞ্জিত, আজও সকলে তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

প্রাচীনকাল থেকেই মেদিনীপুরের মাটিতে মানুষের বসবাস ছিল। মেদিনীপুরের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতালই প্রধান। পরবর্ত্তীকালে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে দুটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা মেদিনীপুরে প্লাবিত হয়েছিল। এছাড়া মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতির ধারা তো ছিলই। টুসু উৎসব ও ভাওয়াইয়া গানে আমাদের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

একদা মেদিনীপুরে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং পাশাপাশি অবস্থান করতেও দেখা যায়। চন্দ্রকোণা গ্রামে ধর্ম পূজার ধূম দেখলে তাই মনে হয়। ধর্মরাজ কুর্মমূর্ত্তি। অনেক

অঞ্চলে ধর্মঠাকুর ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল এবং শিবের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল। চন্দ্রকোণার দেবালয়গুলিতে বাঙালী শিল্পীরা উড়িষ্যার নির্মাণ রীতিকে অনুসরণ করেছিল, অবশ্য তার কারণও রয়েছে। প্রথমতঃ, এই জেলা উড়িষ্যার খুব নিকটবর্ত্তী এবং দ্বিতীয়তঃ, উড়িষ্যার সঙ্গে তার যোগও অনেক দিনের। ফলে উড়িষ্যার আড়ম্বরপূর্ণ শিল্পশৈলীর প্রভাব যে মেদিনীপুরে আসতে বাধ্য তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। এই জেলা উড়িষ্যার শিল্পশৈলী রীতির অনুসরণ করেছে ঠিকই, তবে তারা বাংলার নিজস্বরূপকে কোন সময়ই ত্যাগ করে নি। তারা বাংলার চারচালা ও আটচালা রীতিকে বজায় রেখে উড়িষ্যার রেখ দেউলের পঞ্চরত্নটি গ্রহণ করেছিল। গড়বেতার কানেশ্বর ও দাঁতনের শ্যামলেশ্বর মন্দিরে উড়িষ্যার স্থাপত্যের ছাপ আছে। দাঁতনের পূর্ব নাম দন্তপুর। বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ থেকে এক দন্ত এনে এই স্থানে প্রোথিত করেন তাঁরই এক শিষ্য। সেই সময় থেকে এইস্থান দন্তপুর বলে আখ্যাত হয় বলে অনেকে অনুমান করেন। চন্দ্রকোণার লালজীর মন্দিরটি পঞ্চরত্নের তবে মেদিনীপুর শহরে নাড়াদোল-রাজ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বিষ্ণুপুরী স্থাপত্যের প্রভাব আছে।

সদর মহকুমায় এক প্রাচীন পাথরের দুর্গের সন্ধান মেলে। ঠিক কোন্ সময়ে এটা নির্মাণ করা হয়েছিল তা বলা শক্ত। মনে হয় রাজা মেদিনীকর কর্ত্তৃক মেদিনীপুর নগর প্রতিষ্ঠা করবার সময় নির্মাণ করেছিলেন। পরে মুসলমান কর্ত্তৃক এই নগর অধিকার করলে দুর্গটি তাদের হস্তগত হয় এবং তার মধ্যে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার নবাব আলিবর্দ্দী থেকে আরম্ভ করে মীরকাসেম পর্য্যন্ত এই দুর্গে অবস্থান করেন। মারাঠারা এই দুর্গ একবার অধিকার করে নেয় এবং পরবর্ত্তীকালে দুর্গটি ইংরাজ সেনানিবাস ছিল। কথিত আছে মহাভারতে বর্ণিত বিরাট রাজার গো-গৃহ ছিল এই মেদিনীপুরে। আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুরে যে দুটি দুর্গের উল্লেখ দেখা যায় এই দুর্গটি

তার অন্যতম (IASB Vol. XII 1916, P. 46-56)। শহরের মধ্যে সিপাহী বাজারের সাধল ও চন্দন সাহিদের মসজিদ উল্লেখযোগ্য। সাধলে পারস্য ভাষায় যে লিপি আছে তা থেকে জানা যায় যে সম্রাট শাহজাহানের সময় এটি নির্মিত হয়েছিল। জনশ্রুতি অনুযায়ী চন্দন সাহিদের মসজিদ ঔরঙ্গজেব কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। সমসাময়িক মসজিদের মধ্যে নরমপুরের ইদগারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শহরের স্বদাগঞ্জে জগন্নাথদেবের মন্দির উড়িষ্যার স্থাপত্যরীতিতে তৈরি। ইটের তৈরি এই মন্দিরের সামনে জগমোহন সংযোজিত। মন্দিরের মাথায় দুটি বৃহৎ পিতলেব কলস, তার উপর বিষ্ণুচক্র ও পতাকাদণ্ড স্থাপিত। মন্দিরের দেওয়ালে মৈথুনধর্মী ও সাহেবদের তামাক সেবনের দৃশ্য পোড়ামাটি শিল্পের অতুলনীয় সম্পদ। জগমোহনের দেওয়ালও বিভিন্ন পোড়ামাটির অলংকরণে পূর্ণ ছিল কিন্তু চূণ-বালির প্রলেপে সে সৌন্দর্য্য হতশ্রী। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের দরজায় খোদিত দশাবতারসহ অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি দর্শনীয় শিল্পকর্ম। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরের অভ্যন্তরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া সিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দির খুব প্রাচীন না হলেও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া হনুমানজীর মন্দির, দুর্গামন্দির, রামমন্দির, দুর্গাদেবীর মন্দির, দ্বাদশ শিবালয় বিখ্যাত। মন্দিরের গায়ে কিছু কিছু অলংকরণ দেখা যায়। কোন কোন মন্দিরে সামাজিক চিত্রও কিছু পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। আর আছে পীর হজরৎ মুরসেদ আলির দরগা ও পিয়ার্স সাহেবের সমাধি। আকবরের সভাসদ আবুলফজলের আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুরের উল্লেখ আছে প্রকাণ্ড নগরী হিসাবে। চৈতন্যদেবও উড়িষ্যার পথে মেদিনীপুরে এসেছিলেন।

প্রাচীন ভারতে তাম্রলিপ্ত বন্দর শহর হিসাবে বিশ্বজোড়া নাম করেছিল। এর অনেক নাম ছিল। যেমন—তাম্রলিপ্তি, তমোলিপ্তি, দামলিপ্তি, বিষ্ণুগৃহ, বেলাকুল ইত্যাদি। বর্তমানে তমলুক নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। মহাভারতেও তাম্রলিপ্ত রাজ্যের উল্লেখ আছে।

রাজা তাম্রধ্বজ এর রাজা। ইনি পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া আটক করে রেখেছিলেন বলে তাদের সঙ্গে তাম্রধ্বজের তুমুল যুদ্ধ হয় এবং অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে সখ্য স্থাপন করেন। তাম্রধ্বজ প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণার্জ্জুন মূর্ত্তি আজও তমলুকে জিষ্ণুহরি নামে পূজিত হয়ে থাকেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০৭ অব্দে তাম্রলিপ্ত ছিল সামুদ্রিক বন্দর এবং এখান থেকেই বিজয় সিংহ, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র লঙ্কায় যাত্রা করেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতি পোঁছে দেওয়ার জন্য। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে এখান থেকেই যাতায়াত চলত। তখন তাম্রলিপ্ত ছিল মৌর্য্যশাসনাধীন। পরে গুপ্তরাজাদের হস্তগত হয় এবং সেই সময় থেকেই এর প্রতিপত্তি বর্ধিত হয়। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ গঙ্গাদেব মেদিনীপুর জয় করলে তাম্রলিপ্তের দুর্দ্দিন আরম্ভ হয়। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে এখানে এসেছিলেন এবং হর্ষবর্ধনের সময় হিউ-য়েন-সাঙ তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্তে অশোকস্তম্ভের উল্লেখ করেন, যার উচ্চতা ছিল প্রায় একশো ফুট। পৌরাণিক যুগেও তাম্রলিপ্তির নাম পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে লেখা গ্রীক্ জ্যোতির্ব্বিদ টলেমীর গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের নাম পাওয়া যায়। অনেকে বলেন জৈনধর্মের তাম্রলিপ্তি শাখার নাম থেকে তাম্রলিপ্তের নামকরণ হয়েছে। তমলুকে বর্গাভীমাদেবীর মন্দির (আলোকচিত্র ২৫) একটি প্রাচীন কীর্ত্তি। শিল্পনৈপুণ্যে এতই অপূর্ব্ব যে মন্দিরটি মানুষের তৈরি বলে মনে হয় না, যেন বিশ্বকর্মা নিপুণ হাতে নির্মাণ করেছিলেন। ৬০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মন্দিরটি বহু দূর থেকে দেখা যায়। সম্রাট অশোক যে স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন তারই উপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। মন্দিরের বাহিরের গঠন প্রণালী বৌদ্ধবিহারের অনুরূপ এবং বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়। ছাদ দেখে মনে হয় এক বিরাট সাদা পাথর কুঁদে তৈরি হয়েছে। অনেকের মতে বৌদ্ধবিহার পরবর্ত্তী-কালে হিন্দুমন্দিরে পরিণত হয়েছিল।

তমলুকের পর বন্দর হিসাবে হিজলী যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছিল এবং সেই সময় সুমাত্রা, মালাক্কা, জাভা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। হিজলীর অধিপতি ছিলেন রাজা হরিদাস। গৌড়ের সুলতান সেকন্দর শাহ দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে হরিদাসের সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। ফলে হরিদাসের সঙ্গে সেকন্দর শাহের যুদ্ধ বাধে এবং এই যুদ্ধে সেকন্দর শাহ পরাস্ত হন।

রাজা খড়্গসিংহ নির্মিত খড়্গপুরে খড়্গেশ্বর শিবমন্দির। অন্যদের মতে বিষ্ণুপুররাজ খড়্গমল্ল দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটি মাঝারি ধরনের এবং উড়িষ্যার রেখদেউল স্থাপত্যরীতিতে গঠিত। খড়্গপুরের অদূরেই অযোধ্যাগড় রাজবংশ পতনের সঙ্গে সঙ্গে হতশ্রী। এই গড়ের মধ্যে জোড়বাংলা বিশিষ্ট সিংহবাহিনী মন্দির ও পঞ্চরত্ন শ্যামসুন্দরজীউ-এর মন্দির উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে নারায়ণগড় গড়ের জন্য বিখ্যাত। এই গড়ে চারটি দরজা ছিল (১) যমদুয়ার—গভীর জলে পরিপূর্ণ এবং রাজার ছাড়পত্র নিয়ে এই দরজা দিয়ে উড়িষ্যা যাওয়া যেত। (২) সিদ্ধেশ্বর দরজা—সিদ্ধেশ্বর শিবের নামকরণে নামাঙ্কিত। (৩) মেটে দুয়ার—মাটির তৈরি এবং চতুর্থ দুয়ারের চিহ্নের কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে এই দরজা কালিঘাই নদীর কোন এক স্থানে অবস্থিত ছিল। এই গড়ের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গন্ধর্ব পাল। নারায়ণগড়ের কাছেই কসবা গ্রামে একটি সুন্দর মসজিদ দেখা যায়। এই মসজিদের শিলা-লিখন থেকে জানা যায় যে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাংলার তৎকালীন শাসনকর্তা শাহসুজা কর্তৃক নির্মিত হয়। এই মসজিদ তিন গম্বুজবিশিষ্ট, তার মধ্যে একটির দশা অতি শোচনীয়। খড়্গপুর স্টেশনের অদূরেই পীরসাহেবের সমাধি—বেশ দর্শনীয় বস্তু।

শালবনীর অন্তর্গত কর্ণগড় অতীব প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে সিংহবংশীয় রাজার রাজধানী ছিল এবং রাজা মহাবীর সিংহ কর্তৃক নির্মিত। এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অধুনা বিদ্যমান। কিংবদন্তী, কর্ণ-

গড়ে দাতা কর্ণের বাড়ী ছিল এবং ভোজরাজার রাজধানী। কেউ কেউ মনে করেন যে উৎকলাধিপতি কর্ণকেশরী এখানে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম'-এ কর্ণকেশরীর উল্লেখ আছে। এই গড় দুই মাইলব্যাপী বিস্তৃত এবং অভ্যন্তরে বিশাল সরোবর ও পাথর নির্মিত প্রাসাদ এখানকার দর্শনীয় বস্তু। গড়ের দক্ষিণে অনাদিলিঙ্গ খণ্ডেশ্বর শিব ও মহামায়ার মন্দির অবস্থিত। পাথর নির্মিত এই মন্দির দু'টি সুদৃঢ় ও নির্মাণ কৌশল অত্যন্ত সুন্দর। মন্দির দু'টির সামনে দু'টি জগমোহন—উড়িষ্যার রেখ দেউল স্থাপত্য-রীতিতে গঠিত। মূল শিবমন্দিরের চূড়ায় বেঁকি, আমলক ও কলস স্থাপিত। বাইরের দেওয়ালে শিবদুর্গাসহ অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত। চারিদিক ঘেরা এই শিবমন্দিরের প্রবেশ পথে ত্রিতল বিশিষ্ট মন্দিরাকারে নির্মিত একটি তোরণদ্বার আছে। কেউ কেউ একে 'যোগীখোপা' বা 'যোগমণ্ডপ' বলে অভিহিত করেন। গড়ের কাছেই চারচালাবিশিষ্ট প্রাচীন ও বৃহৎ এক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। মূলমন্দির এবং উপরিস্থিত চূড়া অটুট থাকলেও চারদিকের চালার অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। মন্দিরের চারদিকের দেওয়াল এক সময় পোড়ামাটির সুন্দর অলংকরণে যে পূর্ণ ছিল তার নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

কেশপুর থানায় রাজা উমাপতি দেবভট্ট কামেশ্বরনাথ জীউর মন্দির নির্মাণ করেন কিন্তু কি কারণে মন্দিরের চূড়া অসমাপ্ত থেকে যায় জানা যায় না। তবে অসমাপ্ত চূড়ার জন্য এর আর এক নাম নেড়াদেউল। গৌড়ের ইতিহাসে ঐতিহাসিক রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বলেছেন যে এই নেড়া কথাটার অর্থ রাঢ়া শব্দের অপভ্রংশ, কেননা চন্দ্রকোণা প্রভৃতি পরগনা রাঢ় দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেকে আবার বলেন যে এই মন্দিরটি রাঢ় দেশের শেষ সীমায় অবস্থিত এবং উড়িষ্যা থেকে পৃথক করার জন্য রাঢ়া দেউল নামে পরিচিত। "West of Barada a monument is drawn to make the frontier between

West Bengal and Orissa"—Prof. Blockman's notes in Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. I, P.376).

গড়বেতায় বগড়ীর অন্যতম নরপতি তেজচন্দ্র বিখ্যাত রায়কোটা দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। বর্ত্তমানে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ। দুর্গের প্রবেশপথ লালদরজা, রাউতা দরজা, পেশা দরজা ও হনুমান দরজা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দুর্গের উত্তর প্রান্তে সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির গড়বেতার অন্যতম প্রাচীন কীর্তি। এর নির্মাণকাল সঠিক নিরূপিত করা না গেলেও বগড়ীরাজ গজপতি সিংহ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে হয়। সর্ব্বমঙ্গলাদেবীর মন্দিরটি রেখদেউল স্থাপত্যরীতিতে গঠিত। মন্দিরটি সুউচ্চ এবং উত্তরমুখী। মন্দির সংলগ্ন জগমোহন ইট দ্বারা নির্মিত। বিনয় ঘোষের মতে মন্দিরটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উড়িষ্যার রাজাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরের অদূরে কামেশ্বর শিবমন্দির। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী ও মাঝারি ধরনের। মাকড়া পাথর নির্মিত সমতল ছাদবিশিষ্ট চারটি কোণ পিরামিডের আকারে উপরে উঠে চূড়ার সৃষ্টি করেছে এবং চূড়ার শীর্ষে ঘটসহ পদ্মস্থাপিত। এই স্তম্ভের উপর তোরণ নির্মাণ হয়েছিল। গড়বেতায় নির্মিত অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে গোয়ালতোড়ে কারুকার্য্যখচিত এক সুন্দর মন্দিরের সন্ধান মেলে। রাজা যাদবচরণ সিংহ কর্ত্তৃক বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়।

ডেবরা থানার অন্তর্গত কেদারকুণ্ডে চপলেশ্বর শিবমন্দির উড়িষ্যার রেখদেউল স্থাপত্যশৈলী প্রভাবিত। মন্দির পশ্চিমমুখী এবং মাকড়া পাথরের তৈরি। সম্ভবতঃ, যুগোলকিশোর রায় নামে এক জমিদার এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দির সংলগ্ন চৌবাচ্ছা কেদারকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ।

ঝাড়গ্রাম রাজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন সাবিত্রীদেবী। সাবিত্রী-দেবীর বর্ত্তমান মন্দিরটি আধুনিককালে তৈরি হলেও অনেক আগে থেকেই এই দেবীর পূজা হয়ে আসছে। এই মন্দিরের মধ্যে অনেকগুলি পাথরের দেবমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন :—

(১) চতুর্মুখ লিঙ্গমূর্ত্তি। এ ধরনের মূর্ত্তি বাংলাদেশে একান্ত দুর্লভ। (২) সর্পফণার ছত্রসহ দ্বাদশভুজা মূর্ত্তি। মনে হয় লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির নিম্নাঙ্গ ভাঙা। (৩) একটি ছোট মনসা মূর্ত্তি, কোলে শিশুসহ। মনে হয়, এগুলি গুপ্তযুগের মুখলিঙ্গ মূর্ত্তি। পালযুগেরও চতুর্মুখলিঙ্গ মূর্ত্তি পাওয়া গেছে।

শিলদা রাজবংশের গড়বাড়ি ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। বিরাট এলাকা নিয়ে রাজবাড়ী আর তারই মধ্যে একাধিক দেবালয় ১৮২০ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। শিলদার ভৈরব হলেন এ অঞ্চলের বিখ্যাত দেবতা। মন্দিরটি পাথরের দেউল ছিল। অজস্র পোড়ামাটির হাতিঘোড়া ইতস্ততঃ ছড়ানো। শিলদার রাজারা যে শৈবধর্মাবলম্বী ছিলেন তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ভৈরব মন্দির। কুকাই গ্রামের কাছেই কুরুড়বেড়া নামে যে প্রাচীন দুর্গের নিদর্শন পাওয়া যায় তার গায়ের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে উড়িষ্যার রাজা কপিলেশ্বরদেব এই সেনানিবাস তৈরি করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। এই দুর্গ থেকেই উড়িষ্যার রাজারা বারে বারে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছে। দুর্গের প্রাচীর প্রায় ১০ ফুট উঁচু এবং প্রস্থ ৩ ফুট। ভিতরে প্রায় ৮ ফুট চওড়া খিলানযুক্ত প্রকোষ্ঠ সারি, চারদিক বেষ্টিত। আগাগোড়া ঝামাপাথরে তৈরি। চত্বরের মধ্যে মন্দির এবং মসজিদের পাশাপাশি অবস্থান বাংলাদেশে বড় একটা দেখা যায় না। মন্দিরের নির্মাণকাল পঞ্চদশ শতাব্দী—রাজা কপিলেশ্বর-দেবের সময়ে এবং মসজিদটি ঔরঙ্গজেবের সময়ে মহম্মদ তাহীর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই অঞ্চলের মন্দিরগুলি যে উড়িষ্যার রাজাদের আমলে তাঁদের অমাত্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কেশিয়াড়ীতে আর একটি প্রাচীন ও প্রখ্যাত দক্ষিণমুখী সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির দেখা যায়। মাকড়া পাথরে উড়িষ্যার রেখদেউল স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত। সম্মুখে জগমোহন ও তৎসংলগ্ন বারোদুয়ারী (বারোটি স্তম্ভবিশিষ্ট) নাটমন্দির। মূল মন্দিরের গায়ে দুটি মিথুনদৃশ্য—

মিথুনদৃশ্য—মানুষ ও সিংহমুখাকৃতি খোদিত আছে। সম্ভবতঃ ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। কেশিয়াড়ীর কাছেই কুরুসবেড়া দুর্গের মধ্যে একই প্রাঙ্গণে হিন্দুমন্দির ও মুসলমান মসজিদের অভূতপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহম্মদ তাদির কর্ত্তৃক ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল এবং মসজিদ দেখে মনে হয় হিন্দু উপকরণ নিয়েই এর গঠন। কেশিয়াড়ীর একাংশে মোগল কাছারী ছিল এবং একসময় বহু মোগল সেইখানে বসবাস করত। তাঁদের নির্মিত মসজিদ এবং গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান।

এগরার হট্টনগরে উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা গজপতি মুকুন্দদেব মহাদেব হট্টেশ্বর শিবমন্দির (আলোকচিত্র-৩০) স্থাপন করেন। তবে নির্মাণকর্ত্তা সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। যাই হোক, এই মন্দিরেও অন্যান্য মন্দিরের মত উড়িষ্যার স্থাপত্যরীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মন্দির পশ্চিমমুখী ও ইটের তৈরি। সম্মুখে জগমোহন ও তৎসংলগ্ন বারোদুয়ারী নাটমন্দির। মূল মন্দিরের চূড়ায় বেঁকি, আমলক ও পর পর তিনটি কলস তার উপর পতাকাদণ্ড। মূল-মন্দিরের প্রবেশদ্বারে কালো পাথরের উপর খোদিত বিষ্ণুর পাদপদ্ম। সামনে পদ্ম ও কূর্মমূর্ত্তি, বামে গদা ও শঙ্খ এবং দক্ষিণে চক্র খোদিত। এ ছাড়াও হাতীর পিঠে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত এক পুরুষ দ্বারপালরূপে পরিগণিত।

মহিষাদলে রাজার সুরম্য অট্টালিকা আছে এবং বর্ত্তমানের কৃষ্টি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই রাজপরিবারের দান অপরিসীম। মহিষা-দলের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন, এই দ্বীপের আকার মহিষের ন্যায় আবার কেউ বলেন এই স্থানে মাহিষ্য জাতির বসবাস ছিল। মহিষ অর্থে ম্লেচ্ছ (বিশ্বকোষ অনুযায়ী) এবং তাদের বাসস্থানের জন্য মহিষাদলের নামকরণ হয়েছে। এই অঞ্চলের রামজীউর মন্দির গঠনপ্রণালী বিচিত্র এবং অতীব প্রশংসনীয়। মন্দিরের

দেওয়াল বিচিত্র অলংকরণে শোভিত। রামজীউর মন্দিরের খোদিত লিপি এইরূপ—

"শুভমস্তু সকাব্দা ১৭১০ মতরস দস
দিগৃষি চন্দ্রসয্যেত্ত সাকেভূস্মুতবাসরে
ইন্দ্বংশে ঘটসমাক্ষ্যা বেদীন্তমাস্থে তৈযৌ তথা
ভূমিপানন্দলালস্য পত্নী শ্রীজানকীমুদা
দদৌ শ্রীরামচন্দ্রায় মন্দিরঞ্চেদমুক্তমং ॥"

চৌহানবংশীয় রাজাদের আমলে চন্দ্রকোণার পশ্চিমে রামগড় ও লালগড় নামে দুটি দুর্গ নির্মিত হয় এবং ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে রামগড়ে রঘুনাথজীউর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। লালগড়ে গিরিধারীজীউর বা লালজীর নবরত্ন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। লালাজীর মন্দির বাংলার শিল্পপদ্ধতি অনুযায়ী নির্মিত হয় কিন্তু রঘুনাথজীউর মন্দির সম্পূর্ণ উড়িষ্যার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন।

এ ছাড়াও মেদিনীপুরে অসংখ্য গড়, অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে যাদের অনেকগুলি অতীত দিনের স্মৃতি বহন করে চলেছে, আবার এমন অনেক কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার নামকরণ মনে হয় ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম থেকেই হয়েছে। অনেকে মনে করেন, বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীরের অন্যতম পুত্র বীর বাঁকুড়া যে অঞ্চলে রাজত্ব করতেন, সেইখানকার নাম হয় বাঁকুড়া।

আদি অস্ট্রীক আর দ্রাবিড়জাতির মিলনক্ষেত্র এই বাঁকুড়া। বর্ত্তমানে ধীবর, ডোম, বাউরী, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির বাস এই অঞ্চলে বেশী। ব্রিটিশ আমলে বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের প্রতাপ ক্রমশঃ কমে আসে। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা যখন যুদ্ধে যেতেন, তখন তাঁর সেনাবাহিনীর একটা রূপ আমাদের চোখে পড়ে ছড়ার মধ্যে—

আগে ডোম, বাগে ডোম, ঘোড়া ডোম সাজে।
ঢাল মেঘর, ঘাঘর বাজে॥

বীর হাম্বীর প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তবে বাঁকুড়া জেলা প্রাচীনকাল থেকেই বিষ্ণুর উপাসক; তার প্রমাণ শুশুনিয়া শিলালিপিতে পাওয়া যায়। যদিও বাঁকুড়া থেকে বাসুদেব, সূর্য্য ও ব্রহ্মার মূর্তি পাওয়া যায়, তবে শিবপূজার প্রচলন সুপ্রচুর ছিল।

উত্তর ও দক্ষিণ বাংলায় প্রথমে আর্য্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল। পশ্চিম বাংলার রাঢ়ে, যে অঞ্চলে বাঁকুড়া অন্তর্গত, আর্য্যসভ্যতা অনেক পরে এসেছিল। অঞ্চল ছিল গভীর অরণ্যে ঢাকা। মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকরা এই অঞ্চলে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। বিষ্ণুপুরের মন্দিরে পোড়ামাটির ছাঁচে ঢালা অশ্বারোহী আর ধনুর্ব্বাণ-ধারী মল্লবীরদের চিত্র প্রাচীন বাংলার শৌর্য্যময় অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মল্লরাজাদের প্রতাপে স্বয়ং দিল্লীর বাদশাহ পর্য্যন্ত ভীত ছিলেন। বাংলাদেশের সীমান্তে প্রহরীর মত বিষ্ণুপুর রাজ্য পশ্চিমের আক্রমণকারীকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ঠেকিয়ে রেখেছিল।

বাঁকুড়া জেলার সীমানা এখন যেভাবে চিহ্নিত সেই নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে স্বতন্ত্র কোনও ধর্মমত, লোকসংস্কৃতি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যরীতি যে আপন বৈশিষ্ট্যে একদা বিকশিত হয়েছিল একথা কখনই বলা যায় না। বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চলের ও তারও পশ্চিমে সিনভূম-মালভূম-ঝাড়খণ্ড এলাকার এবং দক্ষিণ পশ্চিমের উড়িষ্যা রাজ্যের সভ্যতা সংস্কৃতির স্রোত আবহমানকাল প্রবাহিত হয়েছে এই ভূভাগের উপর দিয়ে। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গ ও ভাগীরথীর ওপর অনেক উন্নততর আর্য্যসভ্যতার অনুপ্রবেশও এ অঞ্চলে অনেক শতাব্দীর। বাঁকুড়া জেলার সন্নিহিত পশ্চিমের বিস্তীর্ণ বনভূমিতে অনার্য্য জাতিরা বাস করে এসেছে চিরকাল, আর পূর্ব ও দক্ষিণে বঙ্গ ও কলিঙ্গকে কেন্দ্র করে আর্য্য সভ্যতার বিকাশ যে কত দিনের তা সঠিক-ভাবে বলা যায় না। বিপরীতধর্মী এই দুই কৃষ্টির সংহতি-সমন্বয়ের ক্ষেত্র হল মধ্যবর্ত্তী রাঢ় প্রদেশ। সেই রাঢ়ের প্রাণকেন্দ্র হল বাঁকুড়া। উত্তর রাঢ়ের বীরভূম, দক্ষিণ রাঢ়ের মেদিনীপুর, পশ্চিম রাঢ়ের ছোটনাগপুর সন্নিহিত অরণ্য পর্বতাঞ্চল এবং পূর্ব রাঢ়ের ভাগীরথী অভিমুখী ক্রমনিম্ন সমভূমি যে মধ্যরাঢ়ের বাঁকুড়াতে যে তাদের সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিফলিত করবে তাতে আর সন্দেহ কি। ফলে বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্ত্তি যে ধ্যানধারণার ফলস্বরূপ—তার উদ্ভব ও পুষ্টি হয়েছে বহুযুগের বিভিন্ন কৃষ্টির সমন্বয়ে। এই সংস্কৃতিতে আর্য্য সভ্যতার ছাপ যেমন সুস্পষ্ট তেমনি অনার্য্য সভ্যতার ছাপ কিছু কম নয়। সভ্যতা বিকাশের আদিকাল থেকে বাঁকুড়া অঞ্চলের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। তার সভ্যতার উন্মেষকালেই জৈনধর্মের প্রাণ-তরঙ্গ বাংলাদেশে লাগে এবং সম্ভবতঃ অষ্টম নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত এ ধর্মের প্রভাব ছিল ; অবশ্য তার পরেই এ ধর্মের বিলুপ্তি ঘটে। এর প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে এটুকু বলা যায় যে পালবংশীয় রাজারা ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী ছিলেন এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী থেকে সারা দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। পরবর্ত্তী

সেন রাজারাও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যার ফলে বৌদ্ধধর্ম হীনবল হয়ে পড়ে।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস প্রধানতঃ জৈনধর্মের বিকাশ ও অবনতির ইতিহাস। তার পরে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ভূভাগের ইতিহাসও খুবই অস্পষ্ট। খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের প্রায় শেষার্দ্ধে মল্ল রাজবংশ একচ্ছত্রভাবে নিজে রাজত্ব শাসন করবার সুযোগ পেয়ে বহুবিধ কৃষ্টিমূলক ও জনহিতকর কাজে নিজেদের নিয়োগ করেছিলেন। পাল ও সেন যুগের পরে বাংলাদেশে যা কিছু মহৎ ও বৃহৎ স্থাপত্য কীর্তি রচিত হয়েছে তার অনেকগুলির জন্য মল্লরাজারাই দায়ী। ইটের বদলে ব্যয়বহুল পাথরের ব্যবহার এ রাজবংশ যেমন চালু করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে আর কোন গোষ্ঠী তেমনটি করেছেন কিনা সন্দেহ। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে, কি পৌরাণিক কি লৌকিক দেবতাদের জন্য সমতল ছাদের দালান-মন্দিরের যে ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় তা যে আর্য্য ও আর্য্যোত্তর ধর্মসমন্বয়ের প্রত্যক্ষ ফল এমন মনে করা অসমীচীন হবে না। এ সব অনাড়ম্বর দেবালয়ের দৃষ্টান্ত কাছে পিঠে থাকার ফলে অন্য শিলার মন্দিরাদিও আকার প্রকারে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে নি, যদিও উপকরণগত বা অন্য কারণও তাদের নির্মাণ প্রকরণকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত করেছে। ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রেও এসব অকুলীন দেবদেবীমূর্ত্তি কিছু কম সমাদৃত হয় নি। আর্য্য-অনার্য্য ধর্মচিন্তার এহেন মিশ্রণ ছাড়াও এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম যুগে যুগে কিছু বিবর্ত্তিত হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তিগুলি নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব ছাড়াও বাংলাদেশের নিজস্ব মন্দির স্থাপত্যশৈলী দ্বারা অনেকখানি অনুপ্রাণিত হয়েছে। মুসলমানী আমলের আগে ছাদ ধারণের জন্য মন্দিরগুলির দেওয়াল কিছুদূর পর্য্যন্ত তুলে ধাপে ধাপে শীর্ষ বিন্দুতে মিলিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি বাঁকুড়া তথা ভারতবর্ষের অন্যত্র অনুসৃত হয়েছে। তবে মুসলীম পরবর্ত্তীকালে এই রীতির পরিবর্ত্তন

ঘটলেও একেবারে মুছে যায় নি তার প্রমাণ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজারা দাবী করেন যে তাঁদের রাজবংশের উৎপত্তিকাল সেই সময়, যখন দিল্লীতে হিন্দু রাজারা সমাসীন এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের নামগন্ধও ছিল না। বস্তুতঃ বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে অন্ততঃ কমপক্ষে পাঁচ শতাব্দীকাল ধরে এ ভূভাগে মল্লরাজবংশ প্রভুত্ব করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিষ্ণুপুরের নৃপতিরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় বহু শতাব্দীকাল রাজত্ব করেছেন দুর্দণ্ড প্রতাপে। মুসলমান আমলের শেষভাগে যখন মুঘলশক্তি প্রায় সর্বব্যাপী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে তখন কোন কোন মুঘল সেনাবাহিনী কখনও কখনও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রবেশ করেই পণ দাবী করেছে কিন্তু বর্ধমান ও বীরভূমের আধুনিককালের দুটি রাজবংশের উপরে মুর্শিদাবাদের সুবাদারেরা যে পরিমাণ যথেচ্ছ কর্তৃত্ব করতে পেরেছেন, বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের উপর তা কখনই করতে পারেন নি। মুসলমান শাসনের অবসানে বর্ধমান রাজের ক্ষমতাবৃদ্ধি বিষ্ণুপুর রাজবংশের পতনের কারণ। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদ বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করেন। পরে মারাঠাদের অত্যাচারে প্রাচীন বিষ্ণুপুর রাজবংশের বিনাশ হয়। এই রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য, ধর্মানুশীলন, সঙ্গীতসাধনা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য চর্চায় বাঁকুড়া শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। পাল ও সেন যুগের পরে বাংলাদেশে কিছু স্থাপত্যকীর্তি রচিত হয়েছে তা অনেকাংশে মল্লরাজাদেরই কৃতিত্ব। মন্দিরে পাথরের ব্যবহার এ রাজবংশ যতটা করতে পেরেছেন, পশ্চিমবঙ্গে আর কোন গোষ্ঠী তেমনটি করেছেন কিনা সন্দেহ।

হিন্দু মন্দিরের একরত্ন স্থাপত্য শিল্পটিও এ রাজবংশের অবদান। বাঁকুড়া জেলায় ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মও যে যুগে যুগে বিবর্তিত হয়েছে তা

পর্য্যালোচনা করলে বোঝা যায়। বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত শুশুনিয়া পাহাড়ের রাজা চন্দ্রবর্মার বিখ্যাত শিলালিপির দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই এ এলাকায় বিষ্ণু পূজা সুপ্রচলিত ছিল। বাঁকুড়া জেলার ইতস্ততঃ প্রাপ্ত বহু বাসুদেব-মূর্তি থেকে মনে হয় যে জৈনধর্মের প্রতাপের কালেও হিন্দু উপাসনার ধারা মৃত ছিলনা। অপরদিকে এ অঞ্চলে বুদ্ধ মূর্তি খুব কমই পাওয়া যায় এবং তার ফলে মনে হয় পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা এই অঞ্চল খুব কমই ভোগ করেছিল। খ্রীষ্টীয় বারো শতক নাগাদ জৈনধর্ম লোপ পায় এবং খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক নাগাদ শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠার মাঝে চার পাঁচ শতাব্দী ধরে এখানে যে শিব, বিষ্ণু ও শক্তির আরাধনা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। চৈতন্যযুগে বাসুদেব ভক্তির ধারা রাধাকৃষ্ণের উপাসনায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে। এই শতকে বীর মল্লরাজ হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন; এবং মল্লভূমের সর্বত্র বহু মন্দির নির্মিত হয়। ধর্মের গতি পরিবর্তনের প্রভাব যে ধর্মীয় দেবালয়গুলিতে পড়বে তা বলা বাহুল্য।

বাঁকুড়া জেলায় বহিরাগত মন্দির-স্থাপত্য-শৈলীর প্রভাব যে পড়েনি এমন নয় বরং অন্যান্য জেলা অপেক্ষা এখানে বেশী পড়েছে। রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে এ অঞ্চলকে বার বার উড়িষ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতে হয়েছে। ফলে উড়িষ্যা রীতি সহজেই ছাড়পত্র পেয়েছে এই ভূখণ্ডে। তবুও বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যশৈলীর ধারা—"চালা-শিল্প" বহুল প্রচলিত ছিল এমন নজীর আজও বর্তমান। দোচালাশ্রেণীর মন্দির যে একদা বাঁকুড়ায় কিছু কিছু তৈরী হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। তবে অত্যন্ত প্রাচীন এবং কম পোক্ত হওয়ার জন্য বিনষ্ট হয়েছে। চারচালা মন্দির বাঁকুড়া জেলায় বর্তমানে দু'একটি ছাড়া আর নেই বললেই চলে। মল্লরাজ হাম্বীরের পর বাঁকুড়ায় যত দেবালয় নির্মিত হয়েছে তার অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের। রামায়ণ ও মহাভারতের অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা তারা

ইতিপূর্বেই করেছেন। কিন্তু মুসলীম আমলেও, বিশেষ করে তাদের এই সময়কার ধর্ম সহিষ্ণুতার ফলে অসংখ্য রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা মন্দিরের গায়ে অবতারণা করেছেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত, কংসবধ, পুতনাবধ, কালীয়দমন, ননীচুরি, গোষ্ঠলীলা, বকাসুরবধ, গোপীদের সঙ্গে জলকেলী, নৌকাবিলাস ইত্যাদি ভাস্কর্য্যেরই বেশী ব্যবহার হয়েছে। তবে বাসুদেব উপাসনার ধারা যে একেবারে বিলুপ্ত হয় নি তার প্রমাণ হিসাবে বাঁকুড়ার বহু মন্দিরে বিষ্ণুর দশাবতার মূর্তিও যথেষ্ট দেখা যায়। বাঁকুড়ায় বৈষ্ণব, শাক্ত, শিব সবগুলিই চর্চার বস্তু ছিল। তাই কৃষ্ণ ও শিবের মন্দিরে দশমহাবিদ্যা, মহিষমর্দ্দিনী বা কালীর মূর্তি ব্যবহারে কোন বাধা পড়ে নি। রাম-সীতার আরাধনা সেরকম জনপ্রিয় না হলেও টেরাকোটায় রামায়ণের বিভিন্ন চিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। এ ছাড়া পুরাণ ও উপপুরাণের অসংখ্য কাহিনী দশাবতারের প্রয়োগ, দিকপালদের মূর্তি বিভিন্ন মন্দিরে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এতে যে শুধু শিল্পীদের কারিগরি পটুতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় তা নয়, তৎকালীন ধর্মীয় উদারতার পরিচয় বহন করে। টেরাকোটাগুলি আকারে খুব বড় নয় যার ফলে বিরাট বিরাট দৃশ্য পর পর ছোট ছোট টালিতে সাজাতে হোত এবং পলেস্তারা লাগানো দেওয়ালের গায়ে বসানো হোত। নির্ভুলভাবে সাজানোর জন্য সাংস্কৃতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হোত।

রাণীবাঁধ থানার অন্তর্গত অম্বিকানগর দেবী অম্বিকা ও তাঁর ভৈরব শিবের পাশাপাশি দু'টি পাথরের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। অম্বিকার আদি মন্দিরে শুধু ভিত্তি বেদীটি অবশিষ্ট আছে, তার উপরে বর্তমান ইটের আধুনিক মন্দির। ভিত্তি বেদীটির আয়তন দেখে মনে হয় আদি মন্দিরটি আকারে বেশ বড় ছিল। বিগ্রহটি সম্ভবতঃ পাথরের তৈরী। কোন সন তারিখ উৎকীর্ণ না থাকায় কবে নির্মিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

শিবলিঙ্গের জন্য নির্মিত ভগ্ন-শিখর পাথরের জীর্ণ দেউল মন্দিরটি

মুসলীম পূর্বকালের বলে মনে হয়। উচ্চতা প্রায় ১৫ ফুট। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গের পাশে পাথরের এক ঋষভনাথের মূর্তি থেকে অনুমান করা যায় যে এই প্রাচীন মন্দিরটি জৈন থেকে হিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এহেন নজীর বাঁকুড়া জেলায় প্রচুর আছে। পরেশনাথ, চিৎগিরি, বড়জোড়া, চিয়াদা ও কেন্দুয়াতে বহু জৈন নিদর্শনের কথা জানা যায়।

বিষ্ণুপুর দুর্গের ভিতর অধিকাংশ দেবালয় আজ দেবতাশূন্য। তার-মধ্যে পাশাপাশি একজোড়া করে চারটি রেখদেউল এবং দুর্গের বাইরে রাসমঞ্চ বলে পরিচিত পিরামিডতুল্য গৃহটি উল্লেখযোগ্য। বেগলার সাহেব লিখেছেন, "The very curious pyramidal structure known as the Rasmancha" (A.S.I., vol, VIII, 1878). পিরামিডের নীচে সারবন্দী বাংলা দোচালা ও চারচালা ঘর রূপায়িত করা অলঙ্কাররূপে। দুর্গের ভিতরের এই দেউল বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূমের দেউলাকার দেবালয়ের যে সমসাময়িক তাদের অস্তিত্ব থেকে জানা যায়। দেবালয়গুলি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৈরি বলে মনে হয়। বাংলা দেবালয়ের নিজস্ব গড়নবৈচিত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রেখে বিষ্ণুপুর দুর্গের দেবালয়গুলি বাঙালী স্থপতি ও সূত্রধরের অপূর্ব্ব নৈপুণ্য ও স্বকীয়তার নিদর্শনস্বরূপ আজও দাঁড়িয়ে আছে। বাংলার দেবালয় স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিষ্ণুপুর দুর্গের ভিতরেই রচিত হয়ে আছে—নির্মাণকালের দিক থেকে নয়, গড়নের দিক থেকে। হাম্বীরপুত্র রঘুনাথ সিংহ বিষ্ণুপুর দুর্গের সবচেয়ে সুন্দর দেবালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের মন্দির। তারমধ্যে শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এবং পঞ্চরত্ন মন্দিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বিষ্ণুপুর দুর্গের মধ্যে আর একটি ভগ্ন জোড়বাংলা মন্দিরের দেখা পাওয়া যায়। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজের নিদর্শন দু'চারটি রয়েছে। এছাড়া রয়েছে রাধাশ্যামের মন্দির, কালাচাঁদের মন্দির এবং মদনমোহনের মন্দির। বিষ্ণুপুরের অদূরে অযোধ্যা গ্রামে ইটের

তৈরী বারোটি শিবমন্দির পাশাপাশি স্থাপিত। পঞ্চরথ দেউলরীতির এ দেবালয় উচ্চতায় ২৫ ফুট ও প্রস্থে ১০ ফুটের বেশী হবে না। এরই কাছাকাছি গিরিগোবর্দ্ধনের মন্দির নির্মাণরীতির এক অভিনব নিদর্শন। দেবগৃহের চালা প্রচলিত কোন পদ্ধতিতে তৈরি না করে বড় বড় শিলাখণ্ডের আকারে বিন্যস্ত। বিগ্রহটি শ্রীকৃষ্ণের। এছাড়া সতেরো চূড়াযুক্ত আটকোণা রাসমঞ্চটি উল্লেখযোগ্য।

আকুইগ্রামে পঞ্চরত্ন রাধাকান্ত জীউর ইটের মন্দিরটি নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। উচ্চতায় ৩৫ ফুট ও প্রস্থে ২২ ফুটের মত। এই দেবালয়ের গায়ে অসংখ্য টেরাকোটা অলংকরণ আছে। সামাজিক, পৌরাণিক, রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কারিগরি দক্ষতা ও বৈচিত্র্যের তুলনা বাঁকুড়া জেলায় বিরল। এই মন্দিরের পরিচয় মেলে পাথরের খোদিত একটি ফলকের লিপি থেকে—

> "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জিউ.........
> অশীতিতম শকাব্দেশ্রীল শ্রীরাধাকা-তস্য
> শ্রীমন্দিরারম্ভ ইতি। সুভমস্তু সকাব্দা।
> ১৬৮৩ মাহ মাঘ ১৭ রোজ মন্দির আরম্ভ।
> মহারাজা শ্রীযুত তিলোকচন্দ্র রায়স্য অধিকার
> পরিচায়ক শ্রীকানুরামদাস সাকিম আকুই
> তস্য জায়া শ্রীমতি চাঁপা দাসি শ্রীশ্রীচরণে
> অর্পণ করিলেন। কারিগর শ্রীইশ্বরি......
> সাকিম বল্যাড়া সংপূর্ণ সকাব্দা ১৬৮৬॥"

আটবাইচণ্ডীর প্রধান দ্রষ্টব্য মুসলীমপূর্ব যুগে নির্মিত বাস্থলী, চণ্ডী ও শিবের তিনটি মন্দির। মন্দিরগুলি বর্ত্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। চণ্ডীকে অষ্টভুজা মনে করে গ্রামের নামকরণ হয়। অষ্টবাহুচণ্ডী তারই অপভ্রংশ আটবাইচণ্ডী। দ্বারকেশ্বর নদীর উত্তর তীরে এক্তেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির (আলোকচিত্র-৩১)। বাংলাদেশে এক্তেশ্বর মন্দিরের

মত এত সুন্দর আর দ্বিতীয় মন্দির আছে কিনা সন্দেহ। বেগলার সাহেব বলেছেন: "The temple is remarkable in its way; the mouldings of the basement are the boldest and finest of any I have seen, though quite plain. The temple was built of laterite...." (Report of a tour through the Bengal Provinces, A. S. I., 1872-73). পশ্চিমমুখী এই শিবমন্দির প্রাচীরবেষ্টিত এবং প্রবেশ পথের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম দিকে তোরণ দ্বারই ছিল প্রধান। তোরণের দু'পাশে দ্বারপাল, উপরে শিবদুর্গা এবং দেওয়ালে চুণ-বালির তৈরি আঠারোটি দেবমূর্ত্তি দেখা যায়। তোরণসংলগ্ন নহবৎখানা। পাথরের তৈরি এই মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট এবং প্রস্থে ১৮ ফুট। তবে এর শিখর বর্ত্তমানে ভগ্নপ্রাপ্ত হলেও মূলমন্দির বেশ সুগঠিত। এরকম বিশাল স্তম্ভের মত মন্দির বাংলাদেশে সত্যই চোখে পড়ে না। এক্তেশ্বর মন্দির বাংলামন্দির নয়। রেখদেউলের প্রতিটি অংশের বর্ধিতরূপ তার মধ্যে স্পষ্ট—কেবল শিখরশূণ্য বলে রূপটি অর্ধসমাপ্ত হয়েছে। মন্দিরের গায়ে কোন কারুকার্য্য নেই। কিন্তু ছোট ছোট দেউলের মণ্ডিতরূপের নক্সা আছে। এক্তেশ্বর মন্দিরটি বিস্ময়কর। কারণ, মন্দিরের এরূপ ভারী ও নিরেট গড়ন আর কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের গা-থেকে খোদাইকরা শিখামন্দিরের মত এক্তেশ্বরের মন্দির। (বিনয় ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃঃ ১১৫।) সত্য সত্যই এই প্রাচীন মন্দিরটি শুধু বাঁকুড়ায় নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের দেবালয়গুলির মধ্যে এক বিরল মন্দির নির্মাণ পদ্ধতির নিদর্শন। বিশেষ কোন স্থাপত্য রীতির মধ্যে পড়ে না—আদিতে পীড়া দেউল শৈলীর প্রমাণ এই মন্দিরের দেওয়ালে আজও বিদ্যমান। কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকার জন্য বয়স নির্ণয় করা কষ্টকর, তবে এটি যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

ভেদুয়াসোলের কিছু পূর্বে শ্যামসুন্দরের মন্দির। ইটের তৈরী

মন্দিরটি স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত। উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট এবং প্রস্থে ১৭ ফুট এই নবরথ মন্দিরের দেওয়ালগুলি ও শিখর সমান্তরালভাবে খাঁজকাটা এবং দীর্ঘায়ত পিরামিডের ন্যায় উন্নত। সম্মুখের জগমোহন বিলুপ্তপ্রায় ; তার ভিত্তিটুকু শুধুমাত্র অনুমান করা যায়। দেওয়ালে জ্যামিতিক নক্সা ও টেরাকোটা অলংকরণ নিবদ্ধ আছে।

কাদাসোলে পঞ্চরত্ন বিষ্ণুমন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি না থাকার জন্য সঠিকভাবে নির্মাণকাল নির্ণয় করা যায় না। এই দেবালয়ের পোড়ামাটির অলংকরণগুলি তিন খিলানযুক্ত সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ ও খুবই সজীব। খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের তৈরী বলে মনে হয়। সামনের দুপাশে ও কার্নিসের নীচ পর্য্যন্ত দু'সারি মূর্ত্তি নিবদ্ধ। নানা সামাজিক দৃশ্য, কৃষ্ণলীলা ও দশাবতারের প্রকাশের জন্য বিখ্যাত।

কৃষ্ণনগর খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে নির্মিত ইটের তৈরী কয়েকটি অলংকৃত মন্দির এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। মন্দির "টেরাকোটা" মিহি চূণের পলস্তারায় ঢাকা এক ভিন্ন জাতীয় অলংকরণ।

কোতলপুর গ্রামে ছোটবড় ছয় সাতটি মন্দির আছে। সামনের দেওয়ালের দু'পাশে ও কার্নিসের নীচে ভিন্ন ভিন্ন খোপে অলংকরণ নিবদ্ধ। পাথরের ভাস্কর্য্যগুলি ইটের ইমারতে অভিনব তো বটেই, কারিগরি দক্ষতায়ও উচ্চশ্রেণীর। এগুলির বিষয়বস্তু—কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, সামাজিক দৃশ্য প্রভৃতির। গিরিগোবর্ধন মন্দিরে যথেষ্ট সংখ্যায় সামাজিক, পৌরাণিক, কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ ঘটিত টেরাকোটা অলংকরণ থাকলেও সেগুলি বেশ নূতন ধরনের। এই মন্দিরের পোড়ামাটির সজ্জা সাধারণশ্রেণীর হলেও সামনের দু'পাশের দেওয়ালে নিবদ্ধ চূণ-বালির দ্বারপাল, মোহন্ত, ইন্দ্র, ষড়ভুজ, কৃষ্ণ, কালী, কৃষ্ণকালী, বৃষবাহনা পার্বতী প্রভৃতির অতিকায় মূর্ত্তিগুলি অভিনব। আঠারো বা উনিশ শতকের প্রথমে নির্মিত বলে মনে হয়।

গোকুলনগরে ল্যাটেরাইট নির্মিত, পূর্বমুখী, পঞ্চরত্ন গোকুল চাঁদের মন্দির (আলোকচিত্র-৩২) বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত হলেও

বিভিন্ন কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, আয়তনে এটি সর্ববৃহৎ। দ্বিতীয়তঃ, চারিদিকে তিনখিলানযুক্ত বারান্দা ছাড়াও গর্ভগৃহের চারিদিকে এক প্রদক্ষিণ পথ খুবই অভিনব। তৃতীয়তঃ, পূর্ব ও দক্ষিণের দেওয়ালে নিবদ্ধ দশাবতার প্রভৃতির বহুসংখ্যক ভাস্কর্য্য খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের অন্যান্য পাথরের মন্দিরের বড় ত্রুটি এতে দেখা যায় না। চারিটি দালানযুক্ত প্রদক্ষিণপথের ছাদ ভল্ট-এর ওপর এবং গর্ভগৃহ ও প্রধান চূড়াটির ছাদকোণে লহরাযুক্ত গম্বুজের উপর ন্যস্ত। এই মন্দিরটি প্রথম রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। গোকুলচাঁদের বিগ্রহ অনেকদিন আগেই অন্তর্হিত হয়েছে। অন্যান্য পুরাবস্তুর মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কালো পাথরের যে বৃহৎ অনন্ত মূর্ত্তিটি এখান থেকে উদ্ধার করে সংগ্রহশালায় রেখেছেন, তার তুল্য উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্য এ জেলায় বিরল। এই মন্দিরের সন্নিকটে সবুজ ক্লোরাইটের বরাহমূর্ত্তি পাওয়া গেছে। হাত-পা ভাঙ্গা হলেও ভাস্কর্য্যে অতীব উচ্চাঙ্গের খোদাইকরা অলংকরণগুলি এখনও সজীব।

বড়জোড়া থানার অন্তর্গত পূর্বগেরিয়া গ্রামে উড়িষ্যার খিচিং স্থাপত্যশৈলীর হুবহু অনুকরণে নির্মিত পাথরের দক্ষিণমুখী যে দেউলটি বাঁকুড়া জেলার এক বিশিষ্ট পুরাকীর্ত্তি তাতে সন্দেহ নেই। ল্যাটেরাইট পাথরের নির্মিত এবং অলংকরণের জন্য বেলেপাথর ব্যবহৃত হয়েছে। দেওয়ালে ও খিলানের বিন্যাস পঞ্চরথ চূড়ায় নিবদ্ধ। চারিদিকে চারটি লম্বমান সিংহমূর্ত্তি, শীর্ষে ছোট বেঁকি, আমলক, কলস। চারচালা পদ্ধতিতে গর্ভগৃহের ছাদ নির্মিত। সতেরো শতকে বা তারও পরে এটি নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়, এবং তা হয়েছিল সম্পূর্ণ মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। টেরাকোটা শিল্পে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, অনন্ত বিষ্ণু, দিক্‌পাল প্রভৃতি কিছু পৌরাণিক মূর্ত্তি থাকলেও অধিকাংশই কৃষ্ণলীলা বিষয়ক, এবং তাতে মনে হয় এ অঞ্চল শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত ছিল।

জয়কৃষ্ণপুরে যত ছোট ছোট মন্দির নির্মিত হয়েছিল এমনটি আর

কোথাও হয়নি বলে মনে হয়। ইট ও কোন কোন ক্ষেত্রে মাকড়া পাথরের নির্মিত দেউল, একরত্ন, পঞ্চরত্ন, দালান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জয়রামবাটি সারদামণির মর্মর মূর্ত্তিটির জন্য প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলে বিখ্যাত লৌকিক দেবী সিংহবাহিনী অধিষ্ঠাতা। আদি মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য বর্ত্তমানে মন্দিরের বিগ্রহ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বিগ্রহ দুর্গার ধ্যানে উপাসিতা।

জামকুঁড়ি নামে খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষ দিকে মল্লরাজ দামোদর সিং এক দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু আজ আর তার কোন অস্তিত্ব নেই। এই গ্রাম থেকে অনেকগুলি পাথরের বাসুদেব ও তীর্থংকর মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। জয়রামবাটির অদূরে জিবটা গ্রাম পুরাকীর্ত্তির জন্য বিখ্যাত।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রায় পরিবারের প্রচেষ্টায় নির্মিত দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন দামোদর শালগ্রাম মন্দির। ইটের তৈরী উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট হবে। কৃষ্ণলীলা, লঙ্কাযুদ্ধ দশাবতার, পৌরাণিক কাহিনী ও দেবদেবী সম্পর্কিত পোড়ামাটির অলংকরণগুলি শুধু সামনের দেওয়ালেই নিবদ্ধ।

ডিহর গ্রামে ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর দুটি শিব মন্দির, বাঁকুড়া জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্ত্তি। রাজা পৃথ্বীমল্ল কর্তৃক ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মন্দির দু'টি নির্মিত। মোটামুটি এই একই সময় সুলতান সিকন্দর শাহ পাণ্ডুয়ায় (মালদহ) বিশাল আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। এতে অনুমিত হয় যে অন্ততঃ সেই সময় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে হিন্দু রাজাদের পক্ষে কিছু কিছু বড় স্থাপত্য কীর্ত্তিতে হাত দেওয়ায় বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। মন্দির দু'টি রেখদেউল পদ্ধতিতে তৈরী হয়েছিল বলে মনে হয়। বর্ত্তমানে এর চূড়া দু'টি ধ্বংসপ্রাপ্ত। দেওয়ালে বেণুকৃষ্ণের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য নির্মাণকাল নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। ষোল শতকের শেষে বীর হাম্বীরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের ফলে মল্লভূমে কৃষ্ণপূজার বিশেষ প্রচলন হলেও তার আগে এ অঞ্চলে

কৃষ্ণভক্তি ও ভাগবত পাঠ প্রভৃতি সমাদৃত ছিল। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বলেন যে মন্দিরে এই মূর্ত্তি এগারো শতকের আগে আসা কিছুতেই সম্ভব নয়।

বাঁকুড়া জেলায় পাথরের তৈরী আটচালা মন্দির খুব কমই নির্মিত হয়েছিল। তেজপাল, সিমলাপাল, বালসী প্রভৃতি স্থানে দু'একটি এরূপ মন্দিরের দর্শন মেলে। সম্ভবতঃ, এগুলি ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বীরসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। এই সমস্ত গ্রাম থেকে যে তিনটি পাথরের মূর্ত্তি পাওয়া যায়, পুরাকীর্ত্তির দিক থেকে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি কুবেরের, দ্বিতীয়টি লোকেশ্বর বিষ্ণুর এবং তৃতীয়টি অষ্টভুজ দুই নটরাজের। সেনযুগীয় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকের বলে মনে হয়। অনুরূপ মূর্তি ধরাপাট গ্রামে দেখা যায়। তবে এ তিনটি মূর্ত্তি মন্দিরের গায়ে নিবদ্ধ। পূর্বদিকে বাসুদেব, উত্তর দিকে আদিনাথ পশ্চিমদিকে পরেশনাথের মূর্ত্তি। জৈনমূর্ত্তি দেখে একথাই মনে হয় যে এই মন্দিরের কাছাকাছি কোথাও জৈনধর্মের কেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টীয় বারো শতকের মাঝামাঝি নাগাদ এ অঞ্চল থেকে জৈনধর্মের বিলুপ্তি ঘটেছিল। অতএব মন্দিরটি এই সময়কার বা এর আগে নির্মিত হয়েছিল। জৈনধর্মের অবনতির পর হয়ত এই দেবালয়কে কেন্দ্র করে বাসুদেব উপাসনার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ, শেষেরটির মত আশ্চর্য্যজনক ভাস্কর্য্য বাংলাদেশে বড় একটা নেই।

নাগছত্রধারী (মনসা) পার্শ্বনাথ মূর্ত্তির পিছনে প্রস্তরপট খোদাই করে গদা চক্রধারী অতিরিক্ত দুটি হাত ও লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রথাগত দুটি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। পার্শ্বনাথকে বলপূর্বক বাসুদেবে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং বিষ্ণুপূজার উপাসনার কেন্দ্র করা হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ধরনের ধর্মান্তরিত দেবালয়ের প্রমাণ বাঁকুড়ায় সুপ্রচুর।

পাথন্না বা পুষ্করণা গ্রাম পুরাবস্তুর জন্য উল্লিখিত। মহারাজা

চন্দ্রবর্মন এই অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন। পাখন্না গ্রামের ঢিপি খননকার্য্যের ফলে বিবিধ ছাপযুক্ত মুদ্রা, তামার মুদ্রা, পোড়ামাটির প্রাচীন তৈজসপত্র, বহু টেরাকোটা মূর্ত্তি, নানারকম পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। এই সব ব্যাপারে গবেষণা করে বলা চলে যে এই গ্রামের আদিবসতি মৌর্য্যযুগ বা তারও আগে। একই সঙ্গে যেমন মৌর্য্য বা সুঙ্গযুগের পোড়ামাটির যক্ষিণীমূর্ত্তি পাওয়া যায়, তেমনি আবার পালবংশের কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্ত্তিও দেখা যায়।

পাত্রসায়ের পুরাকীর্ত্তির মধ্যে কালঞ্জয় শিবের মন্দিরটিই প্রধান। সাবেক এক রেখদেউল চারদিকে ঢালু ছাদের প্রদক্ষিণ দালান পরে যুক্ত হওয়ায় এটিকে এখন অনেকটা একরত্ন মন্দিরের মত দেখায়। প্রতিষ্ঠা লিপির অভাবে আকারে প্রকারে সৌধটির নির্মাণকাল খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বলে অনুমান করা যায়। পাত্রসায়ের কয়েকটি পাথরের দেবালয়ে টেরাকোটা অলংকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমটি এক পঞ্চরত্ন দেউল শিবমন্দির, সামনের খিলানশীর্ষে হরপার্ব্বতীর এক বৃহৎ টেরাকোটা মূর্ত্তি, দ্বিতীয়টি পাথরের আটচালা রামরঘুবীর মন্দির, খিলানশীর্ষে কৃষ্ণলীলা, রামরাজা, গণেশজননী ছাড়াও দশাবতার, পৌরাণিক দেবদেবী ও বহু সামাজিক দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। তৃতীয়টি তিন খিলানযুক্ত বারান্দা ও ঢেউখেলানো ছাদের এক অদ্ভুত দালান মন্দির। বিগ্রহ কালীর।

বাহুলাড়া সাধারণ লোকের কাছে বোলাড়া বলে পরিচিত। লাঢ়া বা রাঢ়া হোল রাঢ়দেশ। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে। এই লাড়, লাড়ম্, লাড় নামই বোলাড়া বা বাহুলাড়া নামের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়। দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরটি দূর থেকে দেখা যায়। এই জেলার শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ববৃহৎ না হলেও সুন্দরতম ইটের মন্দির বাহুলাড়ার শিবমন্দির (আলোকচিত্র-৩৩)। বাংলাদেশে রেখ-দেউলের যে কয়েকটি নিদর্শন আছে তারমধ্যে এই দেউলটি সবচেয়ে

জমকালো। সন বা তারিখ উৎকীর্ণ না থাকার জন্য নির্ণয়কাল সঠিক ভাবে বলা যায় না। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের বিভিন্ন মত। কেউ বলেন, খ্রীষ্টীয় শাসনকালের থেকে বেশী প্রাচীন নয়। আবার কেউ বলেন, খ্রীষ্টীয় দশম শতকের। আবার কারো মতে, একাদশ শতকের এবং মূল মন্দিরটি আদিতে জৈনদের ছিল, পরে হিন্দুদের হয়েছে। এ নমুনা অবশ্য বাঁকুড়ায় নতুন কিছু নয়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে মন্দিরটি পালযুগের তৈরি এবং ভুবনেশ্বরের রেখ দেউলের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বজায় রেখে এই সিদ্ধেশ্বর মন্দির আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দুঃখের বিষয়, শিখর শীর্ষে আমলক ও কলসটি ভেঙে পড়েছে। এই মন্দির সম্বন্ধে নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখেছেন 'The Siddhesvara temple of Bahulara in the Bankura district is probably the first specimen of a brick built Rekha temple of the mediaeval period now standing in Bengal.' (Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures, p. XVI) বাহুলাড়ার এই মন্দির দেখে মনে হয় উত্তর ভারতীয় শিখরযুক্ত নাগর দেবালয়ের একটি প্রধান বিশিষ্ট ধারার বিকাশ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলে উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের এই সীমানার মধ্যে হয়েছিল। দ্রাবিড় ও বেসর দেবালয়ের গঠনরীতির সঙ্গে উত্তর ভারতীয় নাগররীতির মিলন, মিশ্রণ ও লেনদেনও এই অঞ্চলে রয়েছে। রেখ-দেউল তারই এক বিশেষ প্রকাশভঙ্গি। জাঙ্ঘ ও গণ্ডী অংশের বিভাজক হিসাবে কয়েক প্রস্থ ইটের তৈরি কার্ণিসের ব্যবহার করা হয়েছে এবং গণ্ডী অংশের পগগুলির কিনারা তীক্ষ্ণ সমকোণ হিসাবে না রেখে রূপান্তরিত করা হয়েছে মোলায়েম গোলাকৃতিতে, গণ্ডীর সর্ব্বাংশে অতি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক অলংকরণ বাহুলাড় মন্দিরের দর্শনীয় বিশেষত্ব। অঙ্গশিখরের জন্য ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এটিকে খাজুরাহের মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বেগলারের মতে, তিনি এত সুন্দর মন্দির বাংলাদেশে কোথাও দেখেন নি। ঐতিহাসিক

সরসীকুমার সরস্বতী বলেছেন মন্দিরটির শিখর দেশ অধুনা ভগ্ন এবং অলংকরণগুলিও জীর্ণ হয়েছে কালের কশাঘাতে। তবুও বর্হিবিন্যাসের মনোহারিত্বে, আকৃতির রম্যতায় ও অলংকরণের বাহুল্যবর্জ্জিত সরলতায় এই ইটের মন্দিরটিকে সামগ্রিকভাবে সর্ব্বভারতীয় মন্দির স্থাপত্য-কলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যেতে পারে। 'The temple is of brick, plastered; the ornamentation is carefully cut in the brick and the plaster made to correspond to it. There are, however, ornaments on the plaster alone, but none inconsistent with the brick ornamentation below. I conclude, therefore, that the plaster formed a part of the original design. The mouldings of the basement are to a great extent gone, a close approximation can be made to what it was; some portions are, however, not recoverable. The present entrance is not the original old one, but is a modern accretion behind which the real old doorway, with its full triangular opening of overlapping courses, is hidden. This old opening is still to be seen internally; it consists of a rectangular opening 41 courses of bricks in height, over which rises the triangular portion in a series of corbels, each 5 courses in depth; the width of the opening is 4 feet 10 inches. There is no dividing still, and from the facade of the temple it is evident that the cell, with its attached portico in the thickness of the wall itself, stood alone without ans adjuncts in front.

There are, however, the remains of Mahamandapa which was added on in recent times; but it is widely different in construction and in material to the old temple and is probably not so old as the British rule in India. The object of worship inside is named Siddheswar, being a large lingam, apparently in Situ. I conclude, therefore, that the temple was originally Saivaic. Besides, the lingam, therefore, are inside a naked Jain standing figure, a ten armed female and a Ganesa ; the Jain figure is clear proof of the existence of the Jain religion in these parts in old times, though I can not point to the precise temple a spot which was devoted to this sect. The temple had subordinate temples disposed round it in the usual manner ; there were seven round the three sides and four corners and one in front, the last being most probably a temple to Nandi, the vahana of Siva. The whole group was enclosed within a square brick enclosure ; subordinate temples and walls are equally in ruins now, forming isolated and long mounds respectively' (Beglar—Reports of the Archaeological Survey of India, Vol. VIII. District Handbook, Bankura 1951). এই অঞ্চলে খননকার্য্যের ফলে্ পার্শ্বনাথের পাথরের একটি মূর্ত্তি এবং কতকগুলি ছোট ছোট জৈনস্তূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। চৈত্য-অলিন্দ, জ্যামিতিক নকসা, ফুল লতাপাতার অনুকৃতি, দোলানো মালা ও তার মধ্যে নৃত্যরত মূর্ত্তি প্রভৃতি অগণিত সূক্ষ্ম অলংকরণের অতি ব্যাপক ব্যবহার বাহুলাড়ার মন্দিরের

সবচেয়ে দর্শনীয় বিষয়। উত্তর ভারতের "নাগর শৈলীর" দেবালয়গুলির মত আড়ম্বরপূর্ণ বা উড়িষ্যা রীতির শিখর অঞ্চলের মত বিশালকায় কোন সৌধ নির্মাণে অক্ষম হলেও বাঙ্গালী স্থপতি ও ভাস্করদের নির্মিত এহেন ইটের মন্দির আকৃতিতে ভারসাম্য ও অলংকরণের লাবণ্য ও স্নিগ্ধতায় অধিকতর দক্ষতার পরিচায়ক।

মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর পুরাবস্তুর জন্য বিখ্যাত। এত পুরাকীর্ত্তির ছড়াছড়ি বাংলাদেশে আর কোথাও দেখা যায় না। বিষ্ণুপুরে উল্লেখযোগ্য মন্দিরের সংখ্যা তিরিশের নীচে হবে না, তবে সবগুলির আলোচনা না করে মোটামুটি কয়েকটির সম্বন্ধে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হোল। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিকে দেউল, চালা, রত্ন প্রভৃতি স্থাপত্যগত পৃথক পৃথক পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়। দেউল পর্য্যায়ের সৌধগুলির মধ্যে মল্লেশ্বর শিবের মন্দির উল্লেখযোগ্য। এটি ল্যাটেরাইট পাথরে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথ সিংহ কর্ত্তৃক নির্মিত বলে অনুমিত।

রত্নমন্দিরের মধ্যে মদনমোহন, কালাচাঁদ, রাধাগোবিন্দ, নন্দলাল ও রাধামাধব মন্দির। রত্নমন্দির বিষ্ণুপুর জেলায় বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। ইট ও মাকড়া পাথরে তৈরি কালাচাঁদ মন্দিরের গায়ে পৌরাণিক দেবদেবী, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। অষ্টকোণাকৃতি নবরত্নবিশিষ্ট মন্দিরের চূড়ায় পদ্ম, আমলক, ঘট ও ধ্বজা। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত রাধামাধব মন্দির। ভিত্তিবেদীর সমান্তরাল দুটি সারিতে পশু পক্ষী ও পৌরাণিক ভাস্কর্য্য। দু'পাশের দেওয়াল ও কার্নিসের নীচে খোপের মধ্যে দু'সারি করে মূর্তি ও ভাস্কর্য্য। খিলানশীর্ষে ও থামের গায়েও নানাবিধ সজ্জার ছড়াছড়ি। বিষয়—প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, পদ্ম প্রভৃতি। এই অঞ্চলে একরত্ন মন্দির সবই পাথরের, দুই একটি ইটের ছাড়া—তার মধ্যে মদনমোহন মন্দির উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে মদনমোহনের মূর্ত্তি চুরি যাওয়ায় রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি উপাসিত হচ্ছে। কালাচাঁদের অনুসৃত এই মন্দিরে পোড়ামাটি সজ্জার

বিন্যাস। একদিকে পশুপক্ষী, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী রূপায়িত, অপরদিকে স্থান পেয়েছে প্রধানতঃ যুদ্ধ দৃশ্য। থামের গায়ে কীর্ত্তন ও বাজিয়ের দল ও খিলানশীর্ষে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ও মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী। সত্য সত্যই, মদনমোহন ও জোড়বাংলা মন্দিরের গায়ে ইটের উপর যে সকল দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ আছে তা শিল্প সমাজে বিশেষ সমৃদ্ধ। জোড়বাংলার গায়ে একটি সুন্দর নৌযুদ্ধের চিত্র আছে। মদনমোহন মন্দিরের চারিদিকে ইটের সুউচ্চ প্রাচীর। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং বারান্দাবিশিষ্ট। বিষ্ণুপুরে ইটের মন্দিরগুলির মধ্যে এই মন্দিরটিই অন্যতম বলে বিবেচিত। ভিতের চারিদিকে হাঁসের সারি, বাদ্য ও নৃত্যরত মূর্ত্তি, রামায়ণ কাহিনী, দশাবতার ও ড্রাগন মূর্ত্তি দ্বারা অলংকৃত। সম্মুখে নাট মন্দিরটির দেওয়ালে পোড়ামাটির কাজ আছে।

মল্লরাজাদের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের কদর কমেছে। যে বিষ্ণুপুর তখন গুপ্ত বৃন্দাবন নামে খ্যাত ছিল, যেখানে সুন্দর সুন্দর মন্দিরাদি শোভা পেত, তা আজ কালের প্রভাবে, অযত্নে, অনাদরে ক্ষত বিক্ষত, জীর্ণ। পোড়ামাটির অলংকরণে অলংকৃত এই সমস্ত মন্দির অধিকাংশই বিগ্রহহীন। ১০৬৪ মল্লাব্দে মল্লরাজ চৈতন সিংহ কর্ত্তৃক রাধাশ্যাম-জীউর মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরটি মাকড়া পাথরের এবং চারচালা-রীতিতে গঠিত। গম্বুজাকৃতি রত্নশিখরটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দক্ষিণমুখী মন্দিরটির দেওয়ালে অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ও গণেশাদি দেবতা, হাতী, ঘোড়া, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি পশুপাখী, নরনারী, প্রভৃতি পোড়ামাটির মূর্ত্তিদ্বারা সুন্দরভাবে অলংকৃত। যাহার-জোড়া গ্রামে মহামায়া মন্দিরটিও অতি প্রাচীন। মূলমন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও বাংলা ১৩১২ সনে পুনর্নির্মিত হয়। মাকড়া পাথরের তৈরি এই মন্দিরটি চারচালা ধরণের। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবী মহামায়া আসীনা। চারহাতে চারটি আয়ুধ। মহামায়ার মন্দিরে এক দুর্বোধ্য শিলালিপি আছে যার পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নি। একরত্ন

মন্দিরের সংখ্যা বাঁকুড়ায় তথা বিষ্ণুপুরে সর্বাধিক হলেও পঞ্চরত্ন মন্দিরের সংখ্যা খুব একটা কম ছিল না। ইটের শ্যামরায়, পাথরের মদনগোপাল মন্দিরের উল্লেখ না করে পারা যায় না। অজস্র অলংকরণ ছাড়াও স্থাপত্যের দিক দিয়েও মন্দির দুটি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্যামরায়ের মন্দিরের যাবতীয় খিলান, ভল্ট, গম্বুজের তলদেশও যেভাবে অলংকরণে ঢেকে দেওয়া হয়েছে সারা পশ্চিমবঙ্গে তার কোন তুলনা নেই। দেওয়ালে কৃষ্ণলীলা অগ্রাধিকার পেলেও, সামাজিক, পৌরাণিক, রামায়ণ, মহাভারত থেকে আহৃত দৃশ্যাবলী, শাক্ত বা শিব উপাসনার সঙ্গে সম্পর্কিত, জ্যামিতিক নক্‌সা ও ফুলকারি ভাস্কর্য্য অজস্র ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া নবরত্ন, দোচালা, জোড়বাংলা মন্দির কদাচ দু'একটা চোখে পড়ে। মালিয়াড়া গ্রামের নবরত্ন মন্দিরটি বর্ত্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও, এককালে যে বহুল অংলকৃত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মন্দিরটি সতরো শতকের বলে অনুমিত। তখন মল্লরাজসিংহাসনে আসীন ছিলেন বীর হাম্বীর ও প্রথম বীরসিংহ এবং সেই সময় মল্লভূমিতে কৃষ্ণ উপাসনার প্রবল জোয়ার এসেছিল। মুনিনগর গ্রামে বীরসিংহ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের গর্ভগৃহ ও জগমোহন দুটির উপরই দেউল শিখর। এহেন নির্মাণরীতি পশ্চিমবঙ্গে কেন, উত্তর পূর্ব ভারতেও বিরল।

মেট্যালা গ্রামে পঞ্চরত্নবিশিষ্ট লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরটি ইটের তৈরী হলেও স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের দিক থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম ছাড়া অন্য তিনদিকের দেওয়ালই অলংকৃত, তবে সজ্জার প্রাচুর্য্য পূর্ব্বের দেওয়ালেই বেশী। পোড়ামাটির উল্লিখিত ফুলপাতা, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, লংকাযুদ্ধ, পৌরাণিক কাহিনী, সামাজিক দৃশ্য প্রভৃতি খোদিত। আনুমানিক এগারো শতকের একটি মন্দিরকে সূর্য্যমন্দির বলে অনেক পুরাতত্ত্ববিদ মনে করেন, কেননা কিছুদিন পূর্বে এই মন্দিরের অদূরেই একটি সূর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল এবং এই স্থান নাকি একসময় সূর্য্য উপাসনার প্রাচীন কেন্দ্র ছিল। সাবরাকোণ গ্রামে

মাকড়া পাথর নির্মিত একটি মন্দির ডেঙ্গোরাম·কৃষ্ণজীউর নামে প্রসিদ্ধ। মন্দিরের চারিদিকে ইটের প্রাচীর। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং আটচালা প্রকৃতির। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ৯৪৩ মল্লাব্দে বিষ্ণুপুররাজ বীরসিংহ কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্মিত। মন্দিরের চূড়ায় শতদল পদ্ম, আমলক, কলস এবং ধ্বজা প্রতিষ্ঠিত।

এ ছাড়া বাঁকুড়ার অন্যান্য গ্রামে অসংখ্য মন্দির দেখা যায়। কোথাও শিব মন্দির, কেথাও চণ্ডী, রামসীতা রাধাকৃষ্ণের বা বিষ্ণুর। অনেক গ্রামে জৈন মন্দিরের চিহ্নও পাওয়া যায়। এত বৈচিত্র্যময় মন্দির পশ্চিমবাংলায় আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। তাই শুধু উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলির কথাই উল্লেখ করা হোল।

বীরভূম

বীরভূম জেলার নামকরণ নিয়ে নানা মতপার্থক্য আছে। জেলাটিতে প্রধানতঃ সাওঁতাল আর মুণ্ডা জাতির বাস। তাদের ভাষায় "বীর" শব্দের অর্থ জঙ্গল। এইভাবে বীরদের ভূমি বীরভূম কথাটি চালু হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, সিউরীর ছ'মাইল পশ্চিমে রাজা বীরসিংহের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ ছিল। জনশ্রুতি অনুযায়ী, এই বীরসিংহ জরাসন্ধের বংশধর এবং তাঁর নাম থেকেই জেলার নাম হয়েছে বীরভূম।

ত্রয়োদশ শতকে যখন বাংলাদেশের দিকে দিকে মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হয় তখনই রাজনগরের হিন্দু নরপতি রাজধানী ত্যাগ করে সিউরীর কাছে বীরসিংহপুর বা বীরপুরে চলে আসেন। বিষ্ণুপুরের হিন্দু সামন্ত রাজারা আর রাজনগরের শাসনকর্তা সুবাদারের কাছে হাজিরা দিতে কোনদিনই যান নি, এমনকি রাজস্বও কোনদিন জমা দেন নি। তাঁরা প্রায় স্বাধীন রাজা ছিলেন। পাশাপাশি রাজ্য হলেও এই দুই সামন্ত রাজার মধ্যে কোন বিরোধ তো ছিলই না বরং যেদিন দুর্দ্ধর্ষ মারাঠা বর্গীরদল বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিল সেদিনও এই দুই সামন্ত প্রহরী রাজ্য একযোগে তাদের বাধা দিয়েছিল। যতদিন গৌড়ের সিংহাসনে ধর্মপাল বা দেবপাল ছিলেন ততদিন বাঙালী ছিল অপরাজেয়। যেদিন মহীপালের পুত্র নয়নপাল রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলেন, সেদিন তাঁকে দুর্বল মনে করে পশ্চিম ভারতের কলচুরীরাজ কর্ণদেব বাংলা আক্রমণ করলেন কিন্তু জয়লাভে বঞ্চিত হয়ে কেবল কতকগুলি বৌদ্ধ মঠ ও বিহার ধ্বংস করলেন।

উত্তর বা পূর্ব বাংলার মত রাঢ় অঞ্চল শীঘ্র মুসলমান আধিপত্য মেনে নেয় নি। তার কারণ উত্তর ও পূর্ব বাংলায় ছিল বৌদ্ধ প্রাধান্য। সেই অঞ্চলের বহু লোক পীর ফকির এবং আউলিয়াদের প্রচারে আর হিন্দুধর্মের প্রতি বিরাগবশতঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু

পশ্চিম বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ধর্মঠাকুরের মধ্য দিয়ে হিন্দুসমাজের মধ্যে আশ্রয় লাভ করে। আর পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে হিন্দু সমাজের অত্যাচারিত নিম্নবর্ণদের ধর্মান্তরিত হওয়ার পথে বাধা দেন। মৌর্য্য-শুঙ্গ যুগে বীরভূম অঞ্চলের যদিও কোন উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না, তবুও মৌর্য্যযুগে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা এবং কুষাণ ও গুপ্তযুগের প্রচলিত কিছু কিছু মুদ্রা এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছিল। পালপর্বে বীরভূম অঞ্চল যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। মহীপালের দীঘি আজও বীরভূমে বিদ্যমান। চেদীরাজ কর্ণের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ যথেষ্ট ছিল। সেনপর্বের প্রারম্ভ থেকে বীরভূমে সেনরাজগণের আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস জানা যায় এবং এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক প্রমাণাদিও যথেষ্ট আছে। ১৪৫০ সালে নাসিরুদ্দিন মেহমুদ, এবং ১৪৬০ সালে বারবক শাহের রাজত্বকালে বীরভূমে কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়। শাহজাহান এবং ১৬৫৪ সালে তাঁর পুত্র সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নির্মিত কয়েকটি মসজিদের উল্লেখ শিলালিপিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবাংলার পশ্চিম সীমানায় এই বীরভূম জেলা। উত্তরে রাজমহলের পর্বতশ্রেণী, পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার অনুর্বর ভূভাগ, পূর্বে মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণপূর্ব সীমানায় বর্ধমান জেলা। কোন অঞ্চলের প্রাকৃতিক গঠন সেই স্থানের ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, অর্থনৈতিক কাঠামো বা জনজীবনের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। বীরভূমের নদীগুলিই বীরভূমের সংস্কৃতির উৎস। এখানকার তৎকালীন বাসিন্দারা তাদের আবাসগুলি বাঁশ ও কাদা দিয়ে তৈরি করেছিল। "মামা-ভাগিনা পাহাড়"-এ পাথরের ছড়াছড়ি, তত্রাচ ওই অঞ্চলে পাথরের নির্মিত মন্দিরের সংখ্যা অপ্রচুর। বীরভূমে বাংলার মন্দিরসমূহের এ পর্য্যন্ত যে নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলির অধিকাংশই সাধারণ পল্লীবাসী এবং ভূম্যধিকারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তবে কিছু কিছু মন্দির যে রাজপুরুষগণের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল তা

ঐ সমস্ত মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের বহুল প্রচার ও প্রসারের ফলে বীরভূমের শক্তি-সাধকগণ তাঁদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শক্তিপীঠগুলির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেও শাক্ত ও বৈষ্ণবদের সমন্বয় এখানে ঘটেছিল তার প্রমাণস্বরূপ আমরা বীরচন্দ্রপুরে এবং বোলপুরের মুলুকগ্রামে শ্রীশ্রীরামকানাই ঠাকুরের শ্রীপাটের উল্লেখ করতে পারি। যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই সমস্ত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে রাজকোষ থেকে অর্থ প্রদত্ত হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে সুউচ্চ কয়েকটি ইটের মন্দির উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারী বা উচ্চ জমিদারশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই নির্মিত হয়েছিল। দেওয়ান রামনাথ ভাদুড়ী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডীরবনের ভাণ্ডীশ্বর শিবমন্দির, এবং চেকার রামজীবন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলেশ্বর শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ মন্দির জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও বীরভূমের মন্দির-স্থাপত্য এবং তার অলংকরণ বাংলার মন্দির-স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন। সমাজ বিবর্তনের এবং বাঙলীর মনের সুস্পষ্ট চিত্র এখানে রূপায়িত। "পটভূমির প্রসারে, কল্পনার, চিন্তার এবং শিল্পসৃষ্টির দক্ষতায় বাংলার মন্দির-শিল্পকে সমসাময়িক যুগের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম দলিল বলে অভিহিত করা চলে। বাংলার মন্দির বাঙালীর জাতীয় তীর্থ। বাঙালীর হৃদয়ের পরিচয় দিতে, তার স্পর্শশীলতার, তার আনন্দ বেদনার এবং সর্বোপরি তার আধ্যাত্মিক অনুভূতির ইঙ্গিতে বাংলার দেবদেউলগুলি একান্তই অপ্রতিদ্বন্দ্বী।" (কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় —বাংলার দেবদেউল, অমৃত, পৌষ ১৩৭২, পৃঃ ৬০৬-৬১১)। বীরভূমের কিছু কিছু রেখদেউল উত্তর ভারতের নাগররীতির অনুকরণে নির্মিত—যেমন কবিলাসপুর মহল্লায় এবং পাঁচড়ায় এই ধরণের মন্দির দেখা যায়। তবে তারও মধ্যে এক সম্পূর্ণ নূতন স্থাপত্যরীতি অনুসৃত হয়েছে। মন্দিরের ভিত্তিবেদীর উপর থেকে শিখরগুলি কৌণিক রেখায় অবলম্বনপূর্বক উদ্গত এবং বাড় ও গণ্ডীর মধ্যে কোন লক্ষনীয়

বিভেদ নেই। এই জেলায় কুটিরাকৃতি চারচালারীতি বাংলার একান্ত নিজস্ব। মন্দিরের সংখ্যা বহুল। শ্রীপুর, উচকরণ, রামনগর, ছিনপাই, বানেশ্বরী, ভেদরাথী এবং আরও অনেক গ্রামে এই ধরণের মন্দিরের ছড়াছড়ি। আটচালা, নবরত্ন, পঞ্চরত্ন, এমনকি ত্রয়োদশ রত্ন মন্দিরের সংখ্যাও কিছুমাত্র কম নয়। আটকোণাকৃতি দেউল, জোড়বাংলা, একবাংলা রীতিও বীরভূমে অনুসৃত। বীরভূমের মন্দিরগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবীর মধ্যে দু'একটি ছাড়া সর্বত্রই শিবলিঙ্গ। কিন্তু মন্দিরের গায়ে রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী ইত্যাদি বর্ণিত। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত উপাখ্যানেরও কিছু কিছু চিত্র উৎকীর্ণ দেখা যায়। জনসমক্ষে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকাংশ মন্দিরের গায়ে রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীও কোন কোন স্থানে রূপায়িত। উৎসব, পূজাপার্বন যুদ্ধযাত্রা, শিকার ইত্যাদি দৃশ্যের অবতারণা নেহাৎ কিছু কম নয়। বুদ্ধদেবের চারপাশে, বৌদ্ধস্তূপের চারপাশে বুদ্ধদেবের জীবন কথা ব্যক্ত। এই সমস্ত জীবন কথা বা কাহিনী নিরক্ষর জনসাধারণকে কিছুটা জ্ঞানের আলো পরিবেশন করতে যে সমর্থ হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঘটনাপরম্পরা চিত্রের মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত। ফলে জনসাধারণকে কাহিনীগুলি উপলব্ধি করতে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি।

আকালীপুরে মহারাজা নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত সর্পাসীনা, সর্পাভরণে ভূষিতা বরাভয়দায়িনী দ্বিভুজা জগন্মাতা শ্রীশ্রীগুহ্যকালিকা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মূর্তিটি কালো পাথরে নির্মিত, দক্ষিণাভিমুখী এবং তান্ত্রিক উপাসনা পদ্ধতি অনুযায়ী যন্ত্র বা মণ্ডলের উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরি এবং প্রদক্ষিণ পথের চারদিক দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের চৌকাঠ বেসাল্ট পাথরের দ্বারা নির্মিত। আকালীপুরের কাছেই ষষ্ঠীতলায় কয়েকটি পাথরের ভাঙা মূর্তি পাওয়া যায়। এরমধ্যে কীর্তিমুখের ভাঙা মুর্তিটিই উল্লেখযোগ্য।

আর আছে বিষ্ণু এবং উমা-মহেশ্বরের মূর্তি। আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীর শিল্প শৈলী অনুসরণে এই মূর্তিগুলি নির্মিত।

ইটের তৈরি আঙ্গোরার শিবমন্দির। পোড়ামাটির অলংকরণ মন্দিরের শোভাবর্ধন করেছে। একটি মাত্র দরজাবিশিষ্ট এই মন্দিরটি দেউলরীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিখর সপ্তরথ এবং খাঁজকাটা, এবং ছাদ ধাপপদ্ধতিতে নির্মিত। আনুমানিক দেড়শো বছর আগে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। গর্ভগৃহের প্রবেশপথের উপরে বৃষবাহন শিব ও ষড়ভুজ কৃষ্ণ (যা সচরাচর চোখে পড়ে না) এবং দুই পাশে পৌরাণিক মূর্তিগুলির শিল্পশৈলী আধুনিক ও স্থূল প্রকৃতির।

আদিত্যপুরের (বোলপুর) দেউলটি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৩৯ শকাব্দ) নির্মিত হয়। নিম্নলিখিত শিলালিপি থেকে এর নির্মাণকাল নির্দ্ধারণ করা হয়।

শ্রীশ্রী ঈশ্বর মনু শকাব্দ ১৭৩৯ সাল
শ্রীঈশ্বর রুদ্রায়ণ আচার্য্য।

প্রবেশপথের উপর মৃৎফলকে সিংহাসনে উপবিষ্ট রামসীতার প্রতিমূর্তি উৎকীর্ণ। পাশে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান দণ্ডায়মান। দরজার দুপাশে এবং উপরে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ, গণিত এবং দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী রূপায়িত। দক্ষিণে খিলানের পাশে থামের পাথরের মধ্যে গণেশের উপবিষ্ট মূর্তি দেখা যায়। গণেশের পাশে ইঁদুরের পরিবর্তে ময়ূর ও পাখীর প্রতিকৃতি।

একদা বর্গী আক্রমণে যে ইটাণ্ডা গ্রাম বিদ্ধস্ত হয়েছিল, সেইখানে একটা ভাঙা জোড়া বাংলারীতির কালীমন্দির দেখা যায়। সম্ভবতঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটির গায়ে পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে ইউরোপীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। মন্দিরটি দক্ষিণদুয়ারী, স্তম্ভের গায়ে কুচকাওয়াজরত সৈন্যদল, শুম্ভ-নিশুম্ভদলনী চণ্ডী, কালভৈরব শিব, মহিষাসুরমর্দিনী, কালী ইত্যাদির প্রতিকৃতি এবং শিকারের দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ। মৃৎফলকে খোদিত বিষয়বস্তুর মধ্যে

কৃষ্ণলীলার দৃশ্যাবলী, প্রবেশ পথের উপরিভাগে ও পাশে পৌরাণিক ঘটনাসমূহ প্রতিফলিত। বাইরের গায়ে ইউরোপীয় সৈন্য ও উর্দি পরিহিত দ্বারপালগণ। এই গ্রামে আর একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। সেখানে রামসীতা এবং দশাবতারগণের প্রতিকৃতি দেখা যায়। ইলামবাজারে অষ্টকোণাকৃতি মন্দিরের মৃৎফলকের উপর সুন্দর অলংকরণ দৃষ্টিগোচর হয়। মন্দিরের গায়ে লম্বালম্বিভাবে দশমহাবিদ্যা ও দশাবতারগণের প্রতিকৃতি সম্বলিত ফলকসমূহ সন্নিবেশিত। ইউরোপায় নরনারীগণের প্রতিকৃতিও মন্দিরের ভিত্তির গায়ে খোদিত আছে। লতাপাতা দ্বারা শোভিত নকলদ্বার রূপায়ণ এই মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উষ্ট্রারোহী, বাঘ, ময়ুর, ইত্যাদির প্রতিকৃতি দ্বারা মন্দিরগাত্র সুশোভিত। এই গ্রামেই লক্ষীজনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দির যা ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খিলানের উপর রাসমণ্ডল; গিরিগোবর্ধনধারণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, সিংহাসনে উপবিষ্টা রামসীতা ইত্যাদির প্রতিকৃতি ও দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ। তার উপরিভাগে মথুরায় গমনোদ্যত কৃষ্ণবলরাম এবং সংকীর্তনের দৃশ্যাবলী রূপায়িত। অনতিদূরে "দেউল" এর প্রবেশ পথের উপরে রামসীতা, গোষ্ঠলীলা, বিষ্ণুর অনন্তশয্যা ইত্যাদি প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। হাতীর উপর সিংহ তার উপর অশ্বের এক অদ্ভুত প্রতিকৃতি এখানে দেখা যায় যা পশ্চিমবাংলার অন্যান্য মন্দিরে একান্তই দুর্লভ। অনেকটা গজব্যাল মূর্ত্তির অনুকরণে নির্মিত। উত্তর দিকে বৃহৎ আকৃতির মহিষাসুরমর্দ্দিনী, দক্ষিণে এক জোড়া সিংহের উপর জগদ্ধাত্রীর প্রতিকৃতি দর্শনীয়। নন্দী-ভৃঙ্গিসহ শিব ও কলসধৃতা নারী মূর্ত্তিও উৎকীর্ণ।

উচকরণপুরে চাঁদবাবার মন্দিরটি আনুমানিক ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। পূর্বে মন্দিরের গায়ে অলংকারাদি ছিল বলে জানা যায়, যদিও বর্তমানে সংস্কারের ফলে তার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। তবে দরজার উপর (কাষ্ঠনির্মিত) খোদিত অলংকরণগুলি অতীব মনোরম। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পশৈলী অনুসারে নির্মিত। এ ছাড়া,

ঐ একই সময়ে আরও চারটি চারচালা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। রামায়ণ কাহিনীর বিভিন্ন পর্ব, দশাবতার, কৃষ্ণলীলাসমূহ শিব-পার্বতীর প্রতিকৃতি মন্দিরের গায়ে প্রতিফলিত। মন্দিরের চালের সূক্ষ্ম কার্ণিসের গায়ে বক্রভাবে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার কাহিনী রূপায়ণ—এই মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ। সচরাচর এই ধরণের কারুকার্য্য নজরে পড়ে না।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালীন আবাসস্থলরূপে কোটাসুর বিখ্যাত। রাজা মদনের নামানুসারে মদনেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। চারচালা-বিশিষ্ট মন্দির নাটমণ্ডপ সংলগ্ন। মন্দির প্রাঙ্গণেএকটি বিষ্ণু ও অপরটি সূর্য্য মূর্ত্তি দেখা যায়, আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর।

বীরভূমের সর্বোচ্চ মন্দির হিসাবে ডাবুকেশ্বর (আলোকচিত্র—৩৪) মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠাফলক অনুযায়ী এটি ১২৮৭ বঙ্গাব্দে নির্মিত হয়। মন্দির নির্মাণকালে ছুটি বিষ্ণু মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল বলে শোনা যায়। তবে বর্তমানে তাদের অস্তিত্ব জানা যায় না।

মুর্শিদাবাদ সীমানার কাছে সাঁইথিয়া ষ্টেশনের কাছে কলেশ্বর গ্রাম। কেকার রাজা রামজীবন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলেশনাথ শিব-মন্দির (আলোক চিত্র ৩৫) বিখ্যাত। মন্দিরটি নবরত্ন কিন্তু আটচালা রীতি অনুযায়ী নির্মিত। কালক্রমে মন্দিরের সামনের দালান ও দালানের উপরে চারচালা মন্দিরের নানা প্রতিকৃতি সন্নিবেশিত হয়। বর্তমানে সংস্কারের ফলে মন্দিরের গায়ের অলংকরণ প্রায় বিলুপ্ত। মন্দিরের কাছেই কিছু পাথরের মূর্ত্তি দেখা যায় এবং আনুমানিক দশম-একাদশ শতকের নির্মিত বলেই মনে হয়।

গণপুর যে এককালে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল তা তার অসংখ্য মন্দির স্থাপনার মধ্যেই বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ মন্দিরের গায়ে এবং দোলমঞ্চে ফুলপাথরের ফলকের উপর উৎকীর্ণ সুন্দর সুন্দর অলংকরণ। এত অসংখ্য মন্দিরের সমাবেশ বীরভূম জেলার অন্যান্য গ্রামে দেখা যায় না। ন্যূনপক্ষে চৌদ্দটি চারচালা শিবমন্দির

গ্রামের শোভাবর্ধন করছে। বেশীর ভাগ মন্দিরে সন তারিখ উৎকীর্ণ না থাকায় এদের নির্মাণকাল বলা যায় না। তবে কয়েকটি যে ১৭৬৭ থেকে ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল তা তাদের ফলক থেকেই পাওয়া যায়। প্রধান ঘটনাবলীর মধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ, মহিষাসুরমর্দিনী, বিষ্ণুর অনন্তশয্যা, ভাগীরথীর গঙ্গা আনয়ন, কার্ত্তিক-গণেশসহ বিভিন্ন দেবদেবী, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন অংশ, যোদ্ধা ইত্যাদির প্রতিকৃতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। অন্যান্য প্রতিকৃতির মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও কৃষ্ণের রক্ষা, সমুদ্রমন্থন, ফুলপাতা ও জ্যামিতিক নক্শা উল্লেখযোগ্য। এমনকি এই জেলার দৈনন্দিন জীবনও মন্দির গাত্রে প্রতিভাত। গ্রামের উত্তরে একটি আটচালা বিষ্ণুমন্দির এই ব্যাপারে উল্লেখ্য। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ এর নির্মাণকাল। আয়তনে বৃহৎ এবং দৃশ্যাবলীর জন্য দর্শনীয়। অন্যান্য মন্দিরে যে দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, এই মন্দিরে সেই একই দৃশ্যাবলী দেখা যায়। ঘুরিষার রঘুনাথজীর চারচালা মন্দিরটি বীরভূমের প্রাচীন মন্দির। আনুমানিক ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। বর্গীর আক্রমণে মন্দিরের মূর্ত্তি অপহৃত হয় এবং বর্তমানে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

"রঘুত্তম আচার্য্য বিচিত্র মন্দিরম্
রঘুত্তম প্রীতি সমৃদ্ধি বর্দ্ধনম
হরাস্ত কাম্রাস্র তিথি প্রবর্ত্তিতে
শাকে বিনির্মিতং নমায় শিল্পীনা"।

মন্দিরের পূর্বে দরজার উপরে বৃষারূঢ় শিবকালী, ছিন্নমস্তা, প্রভৃতি দশমহাবিদ্যারূপে বর্ণিতা দেবদেবী। উত্তরে রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্যাবলী উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সরস্বতী, লক্ষ্মী, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, মনসা, হর-পার্ব্বতী, দুর্গা, বলরাম, কালীয়দমনরত কৃষ্ণ, গোচারণে কৃষ্ণ প্রভৃতির প্রতিকৃতি সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন মন্দিরটি এই ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে

পারে। এখানে সংকীর্তনরত শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রতিকৃতির অবতারণা করা হয়েছে। পাশাপাশি ইউরোপীয় সৈন্যদল এবং ইউরোপীয় বেশবাসে সজ্জিতা মহিলার চিত্র দর্শনীয়। এই গ্রামে পালযুগীয় ভাঙা দুর্গামূর্ত্তি ও জৈন তীর্থংকরের মূর্ত্তি পাওয়া যায়।

নান্নুর বাঙালীর জনজীবনে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এই নান্নুরেই চণ্ডীদাসের জন্ম। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে তিনজন চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায় যেমন—দ্বিজচণ্ডীদাস, বড়ুচণ্ডীদাস এবং দীনচণ্ডীদাস। তবে দ্বিজচণ্ডীদাস যে এক সময়ে নান্নুরে বসবাস করতেন সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত, কিন্তু অপর দু'জন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এই নান্নুরে দ্বিজচণ্ডীদাসের প্রেমলীলা সম্বন্ধীয় অনেক তথ্য পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের বাসস্থান ছাড়া নান্নুরে অনেকগুলি শিব মন্দির ও একটি বাশুলি মন্দির আছে। বাশুলি মন্দির সমতল ছাদবিশিষ্ট দালান মন্দির। অলংকরণের মধ্যে কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ থাকতে দেখা যায়। ঢিবির উপর কতকগুলি পাথরের ভাঙা মূর্ত্তি দেখা যায় এবং তা আনুমানিক দশম একাদশ শতাব্দীর। এদের মধ্যে বিষ্ণু ও সূর্য্য মূর্ত্তিটি উল্লেখযোগ্য। বাশুলি মন্দিরে যে মূর্ত্তিটি আছে তার দু'হাতে বীণা এবং অপর দু'হাতে পুষ্প ও অক্ষমালা। ললিতাসনে উপবিষ্টা দেবীর পদতলে অমৃতঘট এবং পদ্মাসনের নীচে এক ভক্তের প্রতিকৃতি। মূর্ত্তিটি দেবী বাগীশ্বরীর মূর্ত্তি বলে অনুমিত। চণ্ডীদাস তন্ত্রসাধনা করার জন্য এক সময় এই জেলায় তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। নান্নুরে যেখানে বাশুলি মন্দিরাদি আছে এবং যে স্থানটি কবি চণ্ডীদাসের ধর্মসাধনার স্মৃতিবিজড়িত সে স্থানটি দেখতে ঠিক স্তূপের মত। স্তূপটি দৈর্ঘ্যে ৫৫০ ফুট এবং উচ্চতায় প্রায় ১৭ ফুট। এই স্তূপটি খুঁড়ে কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটির একদিকে যোদ্ধার মূর্তি অন্যদিকে পদ্মাসনা কোন দেবী মূর্তি এবং এই মুদ্রা গুপ্তযুগীয় বলে মনে হয়। স্তূপের নিম্নতম স্তর, ইট

মৃৎপাত্র এবং স্বর্ণ মুদ্রার এই সব নিদর্শন থেকে একথা বলা যায় যে নানুর অঞ্চলে দেড় হাজার বছর আগে এক সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল।

চারকল গ্রামে অনেকগুলি ইটের তৈরি ভাঙা নবরত্ন মন্দির চোখে পড়ে। গর্ভগৃহের ছাদ, চারি দেওয়াল সংলগ্ন খিলান ও কেন্দ্রীয় গম্বুজের উপর রক্ষিত। মন্দিরগুলি পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত, পৌরাণিক, কৃষ্ণবিষয়ক ও সামাজিক দৃশ্যাবলী উল্লেখযোগ্য।

অজয়নদীর তীরে কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলী গীতগোবিন্দ রচয়িতা কবি জয়দেবের আবাসস্থল। এই স্থানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই গ্রামেই আবার কুলেশ্বর শিবমন্দির বর্ত্তমান। আধুনিককালের এই মন্দিরে অষ্টদল পদ্মাঙ্কিত এক পাষাণখণ্ড আছে। কথিত আছে, কবি জয়দেব অজয় নদীর ধারে কদম্বখাণ্ডীর ঘাটে রাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হন এবং কেন্দুবিল্ব গ্রামের এক মন্দিরে তা স্থাপন করেন। কিন্তু বৃন্দাবন যাত্রাকালে তা সঙ্গে করে নিয়ে যান, ফলে মন্দির শূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যে সুবিখ্যাত নবরত্ন মন্দির আজও প্রসিদ্ধ হয়ে আছে তা হচ্ছে শ্রীরাধাবিনোদ মন্দির (আলোকচিত্র-৩৭)। এই বিগ্রহ পূর্ব্বে শ্যামরূপার গড়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিংবদন্তী অনুযায়ী বিনোদ নামে এক রাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে এই গড় জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়লে বর্দ্ধমানের রাজা এই বিগ্রহ সেখান থেকে নিয়ে এসে শূন্য মন্দিরে স্থাপন করেন। বর্ত্তমান মন্দির বর্দ্ধমানের মহারাণী নৈরাণীদেবী ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের সামনে মৃৎফলকের উপর সুন্দর অলংকরণ আছে। বাম পাশের প্রবেশ তোরণের উপর শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বায়ু, যম, ইন্দ্র প্রভৃতির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। অন্য খিলানগুলিতে রামায়ণের ঘটনাবলীই বেশী। এছাড়া সাধু-সন্ত ইত্যাদির প্রতিকৃতিও দৃষ্টিগোচর হয়। রাধাবিনোদের মন্দির জয়দেবের বাসগৃহের ভিটের উপর তৈরি বলে জনশ্রুতি আছে। মন্দিরের গড়ন

বাংলাদেশের নবরত্ন মন্দিরের মতন এবং মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কারুকার্য্যের অপূর্ব নিদর্শন আছে। পোড়ামাটির অলংকরণের মধ্যে বিষ্ণুর দশাবতার ছাড়া রাম-রাবণের যুদ্ধের কাহিনীদৃশ্যই প্রধান। রাধাকৃষ্ণের কোন কাহিনীর অলংকরণ মন্দিরের কোথাও নেই, এটাই আশ্চর্য্য। মন্দিরের গায়ে দশভূজা মহিষমর্দিনী ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিও খোদিত আছে। বাংলা নবরত্ন মন্দিরের মধ্যে রাধাবিনোদের মন্দির একটি প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে তার প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য যথেষ্ট। রিপোর্টে বলা হয়েছে। 'The existing temple here is supposed to have been erected in the 17th century on the site of the poet's house, and apart from its historical interest, is of no mean value from the architectural point of view. It is an example, of Nava-ratna or the nine-towered type of temple, in which one central tower is surrounded by two sets of corner towers at two different levels......... The facade of the temple is richly decorated with brick tiles representing the various incarnations of Visnu and scenes from the Ramayana including the war between the monkeys and the demons".

(Archaeological Survey of India, Annual Report, 1923-24, P-23)

জয়দেব-কেঁদুলীর মেলার মত এত বড় মেলা পশ্চিমবঙ্গে খুব কমই হয়। মন্দিরের পিছনে একটি পিতলের রথের অবস্থিতি দর্শনীয়। রথের গায়ে বিভিন্ন প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। তারাপুর বর্তমানে তারাপীঠ নামেই প্রসিদ্ধ। এই তারাপীঠ নিয়ে অনেক কিংবদন্তী আছে। কেউ বলেন, বশিষ্ঠ মুনি চীনদেশে তারা সাধনা করে ফিরে তারাপুরে সিদ্ধিলাভ করেন। আবার কেউ বলেন, জয়দেব নামে এক বণিক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই দেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। তবে আজকে যে মন্দির দেখা যায় তা

রামজীবন কর্তৃক নির্মিত হয় ১২২৫ বঙ্গাব্দে। বর্তমানে তারাপীঠ তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এইস্থানেই বামাচরণ "বামাক্ষ্যপা" নামে প্রসিদ্ধ হন। তারাপীঠের বর্তমান এই মন্দিরটি আটচালাবিশিষ্ট উত্তরমুখী মন্দির। মন্দিরের সামনে ফুলপাথরের উপর সুন্দর অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের নির্মাণকাল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ। চারচালার উপর চারকোণে চারটি চূড়া বিন্যস্ত এবং প্রবেশ পথের খিলানের উপর দেবী মহিষাসুরমর্দিনীর প্রতিকৃতি। বামদিকে কুরুক্ষেত্রের সুন্দর দৃশ্যাবলী, ভীষ্মের শরশয্যা, অশ্বথামা-হতকাহিনীর উপাখ্যান। দক্ষিণে রামরাবণের যুদ্ধ। আরও যে সমস্ত কাহিনী বর্ণিত আছে তার মধ্যে কৃষ্ণলীলা, রামায়ণের অন্যান্য ঘটনাবলী, মনসাদেবী, শিকার, শোভাযাত্রা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মন্দির চত্বরে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দুটি বিষ্ণুর প্রস্তরমূর্তি আজও পূজিত হয়।

দুবরাজপুরে "মামা-ভাগিনা পাহাড়ে"র পাদদেশে পাহাড়েশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত, তবে এতে কোন স্থাপত্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। এই গ্রামে অনেকগুলি ইটের তৈরি শিবমন্দির চোখে পড়ে। তন্মধ্যে ত্রয়োদশরত্ন সমন্বিত শিব মন্দিরটি দর্শনীয়। প্রবেশ-পথের খিলানের উপর শিবের কৈলাস আক্রমণের ঘটনাবলী উৎকীর্ণ। বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতিও ক্ষোদিত। এছাড়া আছে বিভিন্ন দেবদেবী, অবতার, সামাজিক ও পৌরাণিক দৃশ্য।

"নলাহাট্টাং নলা পাতো যোগেশো ভৈরবস্তথা। তত্রমা কালিকা দেবী সর্বসিদ্ধি প্রদায়িকা॥" এই নলহাটীতেই দেবী ললাটেশ্বরী মন্দির অবস্থিত। বিষ্ণুচক্রে কর্তিত সতীর দেহাংশের নলা বা নূলো বা নলক, পাঠান্তরে লম্বা অস্থি, পতিত হওয়ায় এই স্থানের নাম নলহাটী। মন্দিরস্থিত দেবী কালিকা ও ভৈরব যোগেশ বিরাজমান। অপরদিকে নলরাজের গড়ের নামানুসারে নলহাটী। এই অঞ্চলও বর্গীর অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পায়নি। তবে নবাব সৈন্যের হস্তক্ষেপে তারা এই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এইস্থানে নাথসম্প্রদায়ভুক্ত

সন্ন্যাসীদের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং নাথ পাহাড় এখনও তাদের পরিচয় বহন করে।

বীরভূমের সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও প্রাচীনতম আটচালা মন্দির সিউড়ীর দক্ষিণে সোনাতোড় পাড়ায় অবস্থিত। রাধা-দামোদর মন্দিররূপে অভিহিত। মন্দিরটি মাকড়া পাথরের ভিত্তি বেদীর উপর ইটের তৈরি আটচালা মন্দির। মন্দিরের গায়ে প্রধান প্রবেশপথের উপরে এবং পাশে ফুলপাথরের ফলকের উপর অলংকরণ আছে। দ্বারের খিলানের উপর বামপাশে কালীয়দমন, নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণ, মধ্যে রাসমণ্ডল, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, রাধাকৃষ্ণ, সংকীর্তনের দৃশ্য, দক্ষিণে অনন্তশয্যায় বিষ্ণু, বাহনোপরি ব্রহ্মা, বায়ু, ইন্দ্র, কার্ত্তিক এবং গণেশ ইত্যাদির এবং স্তম্ভের গায়ে আরও বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে নির্মিত বলে অনুমান করা হয়।

মহম্মদ বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে ওসমান নামে এক মুসলমান লাভপুরে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁর বংশধর মহম্মদ ফাজেল বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি এখানে এক গড় নির্মাণ করেন এবং তার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান বলে জানা যায়। এই লাভপুরে ফুল্লরা মহাপীঠ প্রতিষ্ঠিত। মন্দির সম্মুখে নাট মন্দির। মন্দিরটির কোন স্থাপত্য সৌন্দর্য্য নেই। সতীর ওষ্ঠ এখানে পতিত হয়। দেবীর নাম ফুল্লরা ও ভৈরবের নাম বিশ্বনাথ। প্রাণতোষিণীতন্ত্রে দেবীর নাম চামুণ্ডা আবার কোন কোন গ্রন্থে তাঁকে মহানন্দা ও ভৈরবকে মহানন্দরূপে অভিহিত করা হয়। বৃহন্নীলতন্ত্রে তিনি ভীমকালী নামে পরিচিতা। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রেও এই পীঠের উল্লেখ আছে।

"অট্টহাস্যে চোষ্ঠপাতো দেবী মা ফুল্লরা স্মৃতা।
বিশ্বেশো ভৈরবস্তত্র সর্বাভিষ্ট প্রদায়কঃ॥"

মন্দির প্রাঙ্গণে আরেকটি আটচালা মন্দির আছে। মন্দিরের

প্রবেশপথের উপর সিংহাসনে উপবিষ্ট রামসীতার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। দুই পাশে কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ।

রামনগরে যে দুটি আটচালা মন্দির অবস্থিত, তার মধ্যে ছোটটি অলংকার সমৃদ্ধ। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল। প্রবেশপথের ওপরে রাম রাবণের যুদ্ধের দৃশ্যাবলী। চারচালা রথোপরি দণ্ডায়মান দুই বার যোদ্ধা, বানরসেনা ও রাক্ষসগণ যুদ্ধে ব্যাপৃত দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু অতি অল্প পরিসরের মধ্যে সমস্ত ঘটনার অবতারণার ফলে শিল্পশৈলী ভারাক্রান্ত।

প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার দিক থেকে মহিষদল উল্লেখযোগ্য। খনন-কার্য্যের মাধ্যমে যে সমস্ত প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দুটি পর্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বের মধ্যে মাটি, বাঁশ বা কঞ্চির দ্বারা নির্মিত গৃহের ধ্বংসাবশেষ, সাদা অথবা কালো-লাল মিশ্রিত রঙের মৃৎফলক, কোশা-কোশী পাত্র, পাথরের তৈরি অস্ত্র, তামার কুঠার, মাটির মূর্তি, পরিমাপ খণ্ড, অস্থি নির্মিত দ্রব্য, অলংকৃত চিরুণী, চুড়ি এবং পাথরের পুঁতি উল্লেখযোগ্য। এই পর্বে এমন কি দগ্ধ চাউলের সন্ধান মেলে। দ্বিতীয় পর্বেও মৃৎফলকের প্রচলন ছিল, তবে তা স্থূলপ্রকৃতির। লোহা ব্যবহার ছিল কেননা তীরের ফলা, বর্শা, ফলক ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র পাথরের অস্ত্রেরও ব্যবহার ছিল। সঞ্চরণরত হস্তীর দগ্ধ মাটির মূর্ত্তির অংশবিশেষ এই পর্বে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাইকোড় গ্রামের পুরাকীর্ত্তিসমূহ বাংলাদেশের ইতিহাসে যথেষ্ট আলোকপাত করে। পাইকোড়ে দুটি শিলাস্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে—একটি কলচুরীরাজ কর্ণদেবের, অপরটি বিজয় সেনের। দু'টি শিলাস্তম্ভের উপরেই দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে মনে হয়। বিজয়সেনের শিলাস্তম্ভের উপর যে মুণ্ডহীন মূর্তি দেখা যায় তা মনসা মূর্তি বলে অনুমিত হয়। কর্ণদেবের শিলাস্তম্ভের গায়ে খোদাই করা কারুকার্য্য এত সুন্দর যে, কোন সুদক্ষ ভাস্করের কীর্ত্তি বলে মনে হয়। রাজমহল

পাহাড়ের কালো আগ্নেয় পাথরের উপর এই ধরণের কারুকার্য্য যেমন মঙ্গলকলস, পদ্ম, কীর্ত্তিমুখ প্রভৃতি সত্যসত্যই বিস্ময়ের বস্তু। শিলালিপিতে ছয়টি লাইন আছে।

১ম। শ্রীশ্রীগণপতি

২য়। ....

৩য়। ওঁ দেব-দ্বিজ-গুরু (ভজঃ) ন্তরি......দয় ভক্তি নাস্ত

৪র্থ। নেহয়ন..........(শ্রদ্ধ) য়া-স্মিন্ কর্মণি রাজশ্রী কর্ণদেব

৫ম। ওঁ স্বস্তি সমৃদ্ধ রাজ্য-শ্রী-চেদী র (আজ্য) শ্রীকর্ণদেব (স্য) জ্য নন্তর কীর্ত্তি প্রশস্তি (?)

৬ষ্ঠ। শ্রীবিশ্বকর্মা চরণ-প্রসাদাৎ দেবীমূর্ত্তি নৃমিত............... পতিয় শ্রীকার্ত্তি......

অপর শিলালিপিতে আছে—'রাজেন্দ্র শ্রীবিজয়সেন'।

এই স্তম্ভলিপি থেকে তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া যায়। চেদীরাজ বারে বারে গৌড় আক্রমণ করেছে, বিধ্বস্ত করেছে। যুদ্ধবিগ্রহ যেমন চলেছিল তেমনি আবার সন্ধি চুক্তিও হয়েছিল দুই রাজপরিবারের মধ্যে। সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিতে" বর্ণনা করেছেন যে কর্ণদেব দ্বিতীয়বার বঙ্গাভিযানকালে অনুকূল অবস্থা না পেয়ে পালরাজের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন এবং তৃতীয় বিগ্রহ পালদেবের সঙ্গে নিজ কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ দেন। কর্ণদেবের যে স্তম্ভলিপি এখানে পাওয়া যায় তা নিতান্ত ভগ্ন এবং ভূমি মধ্যে প্রোথিত ছিল বলে মনে হয়। স্তম্ভলিপির নিম্নভাগে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও মঙ্গলঘট এবং মধ্যভাগে কীর্তিমুখের প্রতিকৃতি। নরসিংহ অবতারের স্তম্ভটির কথা এখানে উল্লেখ না করে থাকতে পারা যায় না কেননা এটা ভাস্কর্য্যের এক সুন্দর নিদর্শন। স্তম্ভগাত্রে অসুর হিরণ্যকশিপুকে পদাঘাত করতে দেখা যায়। দক্ষিণ দিকে উৎকীর্ণ ভগ্নমূর্তিদ্বয় হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের মূর্তি বলে মনে হয়। প্রধান নরসিংহ মূর্তিটিকে, পদতলে

শায়িত এক মূর্তিকে বামপদ দ্বারা পদাঘাত করতে এবং ক্রোড়ে শায়িত অসুরের পেট বিদীর্ণ করে অস্থিনালী বার করতে দেখা যায়। পাইকোড়ে এক দণ্ডায়মান সূর্য্য মূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তির পাদপীঠে শুধুমাত্র পদ্মপুষ্প খোদিত আছে, পাশে পিঙ্গল ও দণ্ডের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। মূর্তিটি চতুর্ভূজা।

বাংলামন্দির ছাড়াও ছোট ছোট শিব মন্দির অনেক আছে বক্রেশ্বরে। বক্রনাথের মূল মন্দিরটি বৃহৎ কিন্তু বাংলা মন্দির নয়, উড়িষ্যার রেখদেউলের মত; মনে হয়, বাংলাদেশ ও উড়িষ্যার দেবালয়ের একটি মিলন ক্ষেত্র বীরভূমের বক্রেশ্বর। বক্রনাথের দেউলের সুউচ্চ শিখর ও আমলক চারিদিকের পরিবেশকে প্রভাবান্বিত করে রেখেছে। তারই আশেপাশে অসংখ্য বাংলা মন্দিরের অনাড়ম্বর সমাবেশ দেখে মনে হয় যেন বাংলা ও উড়িষ্যার শিল্পীদের শিল্পবিদার লেনদেন কোন সময়ে বক্রেশ্বরেও হয়েছিল। বক্রেশ্বর "গুহ্যতীর্থং পয়ং মহৎ" বলে পুরাণে কথিত। তান্ত্রিক পাঠকদের গুহ্য সাধনার অন্যতম কেন্দ্র বলেই বক্রেশ্বর গুহ্যতীর্থ বলে পরিচিত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, সতীর ভূমধ্যস্থ স্থান আবার কেউ বলেন, সতীর দক্ষিণ বাহু এই স্থানে পতিত হওয়ায় বক্রেশ্বর শ্রেষ্ঠ শক্তিপীঠ রূপে পরিগণিত হয়েছে। বর্ত্তমানে মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত মূর্ত্তিটি অষ্টধাতু নির্মিত মহিষাসুরমর্দ্দিনী। দেবীর নাম বক্রেশ্বরী এবং ভৈরবের নাম বক্রেশ্বর। বীরভূমাধিপতি আসদজমান খাঁয়ের মন্ত্রী দর্পনারায়ণ কর্ত্তৃক ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মূল মন্দিটির রেখদেউল উড়িষ্যার স্থাপত্য রীতি অনুসারে নির্মিত। বক্রেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবন আছে এবং এগুলি বর্ত্তমানে যোগকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড ইত্যাদি হিসাবে পরিগণিত হয়।

বারা একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। বারা, কুমারখাণ্ডা, নগরা, এবং বাণেশ্বর বারা গ্রামের বিস্তৃতি সূচিত করে এবং বারা, নগরা এবং বাণেশ্বর নিয়ে গঠিত ছিল বারণাবত। কেউ বলেন, বাণ রাজার

রাজধানী ; আবার কেউ বলেন, বালা রাজার রাজধানী নাম থেকেই বারা নামের উৎপত্তি। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে বারা খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে কতকগুলি মসজিদ ছাড়াও বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির কথা জানা যায়। হিন্দুদেবী চতুরাননা অষ্টভূজার কথা যেমন উল্লেখ আছে তেমনি আবার বৌদ্ধদেবী বজ্রতারারও উল্লেখ আছে। বারা গ্রামের দেবদেবী মূর্ত্তির বৈচিত্র্য এত বেশী যে হঠাৎ কোন মূর্ত্তিবিশারদের পক্ষেও প্রত্যেক মূর্ত্তির সঠিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে দেবদেবীর মূর্ত্তি যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর সংখ্যা কম নয় কিন্তু বৌদ্ধ দেবদেবীর সংখ্যা অনেক বেশী এবং গুরুত্বও ততোধিক। মূর্ত্তিগুলি বজ্রযানী বৌদ্ধদের। বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি একাধিক পাওয়া গেছে। এই গ্রামে সিংহাসীনা ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তিকে নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন 'ভুবনেশ্বরী-গৌরী,' কেউ বলেন 'সিংহনাদ লোকেশ্বর' আবার কেউ বলেন মঞ্জুবর মূর্ত্তি, অন্যজনে বলেন 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। এই গ্রামে অদ্ভুত আর এক চতুর্মুখ দেবমূর্ত্তি—তিনটি মুখ সামনে একটি পিছনে—পদ্মের উপর বজ্রাসনে উপবিষ্ট। মাথার মুকুটটি চৈত্যের মত হওয়ার জন্য মূর্ত্তিটিকে বৌদ্ধ দেবদেবা মূর্ত্তি বলে অনুমিত হয়। পাল যুগে বারা গ্রাম যে বৌদ্ধ তন্ত্রযানের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বোলপুর শান্তিনিকেতন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর জন্য বিশ্ববিখ্যাত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে-দেবী-মাহাত্ম্যে বর্ণিত সুরথ রাজা কর্ত্তৃক চণ্ডীর লক্ষ বলি প্রদত্ত হওয়ায় স্থানের নাম হয় বলিপুর, পরবর্ত্তীকালে বোলপুর। নিকটের গ্রামে সুপুর, সুরথরাজার রাজধানী বলে কিংবদন্তী আছে। প্রাচীনকালে তন্ত্রের তান্ত্রিক উপাসনার প্রধান কেন্দ্র ছিল।

সুপুর গ্রামে সুরথেশ্বর শিবমন্দির সুরথ রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন মন্দিরের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের অংশবিশেষ এখনও ঢিবির উপর

বিক্ষিপ্ত আছে। বর্ত্তমান মন্দিরটি পুরাতন ধ্বংসস্তূপের উপর সাম্প্রতিক-কালে পুনর্নির্মিত হতে শোনা যায়। প্রস্তর নির্মিত দ্বারের চৌকাট এবং একটি ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি ঐস্থানে আছে। এগুলি খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের শিল্পশৈলী অনুসারে নির্মিত। বর্ত্তমানকালে এই ঢিবি থেকে প্রাচীনকালের কালো-লাল রঙের মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই গ্রামে আরো অনেক ইটের তৈরী মন্দির আছে। অধিকাংশই দেউলরীতির। মন্দিরগুলির অলংকরণে পাশ্চাত্ত্য বেশভূষায় সজ্জিত বিদেশী নরনারীর উপস্থিতি দেখা যায়। অষ্টকোণাকৃতি মন্দিরের আটদিকেই কলসের উপর অলংকরণ আছে—অপর মন্দিরের সম্মুখে শুধু অলংকরণ আছে।

ভদ্রকালীর অধিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ভদ্রপুরের উৎপত্তি। এখানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের কিয়দংশ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ভাণ্ডারবনে মুর্শিদাবাদের দেওয়ান রামনাথ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক প্রাচীন ভাণ্ডীশ্বর শিব মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের গায়ে খোদিত ফলক থেকে জানা যায় মন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত। কিন্তু ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিরচিত "বাংলাদেশের ইতিহাস" (পৃঃ ৪৬৬) এ মন্দিরটিকে মাকড়া পাথরের তৈরি বলে কেন অভিহিত করেছেন, তা জানা যায় না। মন্দিরটির আনুমানিক উচ্চতা ৪০ ফুট এবং অলংকারবিহীন।

মল্লারপুরের প্রধান মন্দির মল্লেশ্বর। এই শিবমন্দিরের চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত এবং প্রধান তোরণ দ্বারের উপর নহবৎখানা প্রতিষ্ঠিত। মন্দির-চত্বর মধ্যে প্রায় পঁচিশটি ভিন্ন রীতির মন্দির দেখা যায়। অধিকাংশ মন্দিরই চারচালা রীতি অনুযায়ী নির্মিত এবং প্রবেশপথের তিনপাশে ফুলপাথরের উপর খোদিত অলংকরণ দেখা যায়। পূর্ব খিলানের উপরে অলংকরণ আছে। কৃষ্ণলীলা, কীর্ত্তনের দৃশ্য, দুর্গা, শিব, ইত্যাদি প্রতিমূর্তি উৎকীর্ণ। শিল্পশৈলী বিচারে ওগুলিকে

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফেলা যায়। এছাড়া আরও কয়েকটি পঞ্চরত্ন, অষ্টকোণাকৃতি মন্দির এই গ্রামে আছে।

মেলগ্রামে যে সমস্ত মন্দির আছে সেগুলির সবগুলিই চারচালা শিব মন্দির এবং পশ্চিমদুয়ারী। মন্দিরের গায়ে সুন্দর সুন্দর অলংকরণ আছে, যেমন রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য, দশাবতার সমূহের প্রতিকৃতি, শক্তিদেবী কালী ইত্যাদির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এগুলির নির্মাণকাল, মন্দিরের কার্ণিসে পাখীর প্রতিকৃতিও লক্ষ্য করা যায়।

এই সময় রাজনগর বীরভূমের রাজধানী ছিল। জনশ্রুতি আছে যে মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে বৈদ্যরাজবংশীয় বীররাজা রাজত্ব করতেন। তিনি নাকি পাঠানদের আধিপত্য বিস্তারে বাধাদান করে দেশকে অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। আসাদুল্লা ও জোনেদ খান এই দু'জন পাঠান সেনানী রাজার শৌর্য্যবীর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর অধীনে সচিব পদে নিযুক্ত হন এবং কালক্রমে রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। তাহলে দেখা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর যুগ থেকেই রাজনগরে মুসলমান শাসনের সূচনা হয় এবং বক্তিয়ার খিলজীর সময় থেকেই এখানে পাঠান ঘাটী স্থাপন করার চেষ্টা শুরু করা হয়। এখানে যেমন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে তেমনি আবার ইতিহাস প্রসিদ্ধ মতিচূড়া মসজিদের (আলোকচিত্র ৩৬) ধ্বংসাবশেষও আছে। আনুমানিক, ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত এই মসজিদের অলংকরণশয্যা দর্শনীয়। ইটের তৈরি এই মসজিদে যেটা সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে ইসলামী অলংকার ও হিন্দুরীতির রূপসজ্জার সংমিশ্রণ। সামনে মৃৎফলকে রজ্জু, পত্রাবলী, মিনার, নকলদ্বার ইত্যাদির রূপায়ণ এবং অলংকরণ হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য শৈলী ও ভাস্কর্য্যের মধ্যে শিল্পরীতির এক ধারা বহমান। (ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন—"বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলীম শিল্পরীতির ধারাবাহিকতা", "এক্ষণ" পত্রিকা, পৃঃ ১৭, পঞ্চম সংখ্যা, ১৩৭৫)

ইংরাজ শাসনের গোড়াপত্তনের সময় বীরভূম জেলার গ্রামে টীপ সাহেবের কুঠি নির্মিত হয় ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে। এর আগে মন্-লি-মিন নামে এক ফরাসী বণিক ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সুরুলে এসে হাজির হন। এই সুরুল গ্রামে অনেকগুলি ইটের তৈরী মন্দির আছে, তার মধ্যে লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের গায়ে কোন সন তারিখ উৎকীর্ণ না থাকার জন্য এই মন্দিরের নির্মাণকাল নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। মন্দিরের গায়ে রামায়ণের ঘটনাবলী—হনুমান কর্তৃক রাক্ষসবাহিনী আক্রমণ, অশোকবনে সীতাদেবী চেড়ীগণ পরিবৃতা, রামের রাজ্যাভিষেক, রামসীতার প্রতি বানরগণের শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইত্যাদি দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। এছাড়া, কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী, পদ্মপুরাণ, পত্রলতা ইত্যাদির প্রয়োগ লক্ষনীয়। এই মন্দিরের গায়েও ইউরোপীয় বেশভূষায় সজ্জিতা নারীমূর্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অপ্সরাগণের অলংকরণ সামাজিক ঘটনাবলী মন্দিরের অলংকরণের মধ্যে স্থান পেয়েছে। এই মন্দিরের মধ্যেই আছে ইটের দেউল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বীণা হাতে শিবের দৃশ্য স্থাপত্যশিল্পে সচরাচর চোখে পড়ে না। শিবের হাতে বীণা প্রদানের অর্থ পরিস্ফুট নয়। যাই হোক, গণেশকে আদরতা পার্বতী, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, প্রভৃতি দৃশ্যের সুন্দরভাবে অবতারণা করা হয়েছে। এই গ্রামে কয়েকটি আটচালা মন্দির আছে। মন্দিরের মধ্যে গণেশের মূর্তি খোদিত। প্রবেশপথের খিলানের উপর যে সামান্য অলংকরণ চোখে পড়ে তা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। দক্ষিণ খিলানের উপর একই রকম অলংকরণ, তবে মন্দিরের মধ্যে একটি পদ্মপুষ্প আছে।

হেতমপুরে গোবিন্দ সায়রের এক কোণে কারুকার্য্যবিশিষ্ট শিব-মন্দির। হেতমপুরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুদেকর
চন্দ্রনাথ শিবচন্দ্র হয় সেয়ী চন্দ্রশেখর

(বীরভূম বিবরণ, পৃঃ ৬০, প্রথম খণ্ড)

অষ্টকোণাকৃতি এই মন্দির পূর্বদুয়ারী। মন্দিরের গায়ে মৃৎফলকে গণেশ-জননী, জগদ্ধাত্রী, গজলক্ষ্মী ও সামাজিক দৃশ্যাবলীর ব্যতীত ইউরোপীয় ভাবধারার শিল্পশৈলীর সার্থক রূপায়ণ। ইউরোপীয় জননায়ক, কবি, রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি এবং এমন কি ইউরোপীয় অলংকার শৈলীও সুন্দরভাবে মৃৎফলকে রূপায়িত। নবরত্ন মন্দির ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে এক অপরূপ স্থাপত্যশিল্প সৃষ্টি করেছে। মন্দিরের কাছেই আরেকটি মন্দির "দেওয়ানজী শিবমন্দির" ইউরোপীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত। পাশাপাশি কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক কথা, সামাজিক চিত্র চমৎকারভাবে পরিবেশিত। এই দুটি মন্দিরের উপর ইউরোপীয় প্রভাব যে ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সারা বীরভূম জেলার অন্যান্য মন্দিরের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয় নি।

ময়ূরেশ্বর থানায় কোটাসুর বা অসুরকোট গ্রাম পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতকালীন আবাসস্থলরূপে প্রসিদ্ধ। গ্রামের মধ্যে এক উঁচু ঢিবির উপর প্রতিষ্ঠিত মদনেশ্বর শিবমন্দির। তারই প্রাঙ্গণে এক বিরাট প্রদীপাকৃতি প্রস্তরখণ্ড কুন্তীর প্রদীপ নামে পরিচিত। এই অঞ্চল আগে একচক্রা নামে অভিহিত ছিল এবং দুর্মদসেন নামে এক ক্ষত্রিয় নরপতির করায়ত্ত ছিল কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে বক নামে এক অসুর দুর্মদসেনের পুত্র মদনকে ধ্বংস করে আধিপত্য বিস্তার করে। সেই থেকে এর নাম হয় কোটাসুর। অসুরকোটএর অপর নাম। মন্দির প্রাঙ্গণে দুটি মূর্তি—একটি সূর্য্য ও অপরটি বিষ্ণুমূর্ত্তি। মূর্তি দুটি আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর শিল্পশৈলী অনুসারে নির্মিত।

পুরাণে বর্ণিত মাণ্ডব্যমুনির আশ্রম এই ঝাড়গ্রামে থাকার জন্য গ্রামটির অনুরূপ নাম হয়েছে। ঝাড়গ্রামে মানপতি নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন এবং কথিত আছে যে দিল্লীশ্বর সুলতান মহম্মদ বীন তুঘলক তাঁর এক আত্মীয় জাফর খাঁকে এই মাণ্ডব্যপুরে অর্থাৎ ঝাড়গ্রামে পাঠান এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে জাফর খাঁ মানপতিকে পরাজিত

ও নিহত করে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জাফর খাঁ এখানকার অনেক মন্দির ধ্বংস করেন এবং পরে তারই ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে অনেক সমাধি ক্ষেত্র।

এছাড়া, বীরভূমে আরও অনেক গ্রাম আছে যেমন খরসোলা, গন্নুটিয়া, গোপালপুর, ছিনপাই, চন্দনপুর, জাজীগ্রাম, জোফলাই, নারায়ণপুর, পারগুণ্ডি, মল্লিকপুর, মহুলা ইত্যাদি, যেখানে বহু মন্দিরাদি আছে। প্রায় সর্বত্রই মন্দিরের গায়ে একই ধরণের দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে।

পুরুলিয়া

পশ্চিমবঙ্গের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তের জেলা পুরুলিয়া। এক সময় ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। একটিমাত্র মহকুমা নিয়ে গঠিত পুরুলিয়া জেলাটি মালভূমে অবস্থিত ছিল। ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত মালভূম জেলা বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৬ সালে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির সীমানা নির্দেশিত হলে পুরুলিয়া আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসে। জেলাটি ছোটনাগপুরের উচ্চভূমির অন্তর্ভুক্ত, তাই সারা জেলায় ছোট ছোট পাহাড়ের সারি দেখা যায়।

পশ্চিম প্রান্তের এই জেলাটির কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসনের সন্ধানও পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরানো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের অভাব নেই। স্মরণাতীত কাল থেকে এই অঞ্চলটি যে অনার্য্য-মানুষের বাসভূমি ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুণ্ডা, কুর্মী, ভূমিজ, হো, ওঁরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীরা আজও জেলাটিতে যথেষ্ট সংখ্যায় বসবাস করছে। এদের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক অবদান কিছু কম নয়। আর্য্য-ব্রাহ্মণ ধর্ম ও সংস্কৃতি জেলাটিতে প্রবেশ করার অনেক আগেই জৈন ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল পুরুলিয়ায়। জৈনগুরু বা তীর্থঙ্করর৷ যাঁরা ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছিলেন, তাঁদের বংশধররা আজও জেলাটিতে শরাক নামে পরিচিত।

শরাকরাই জেলাটির প্রাচীনতম বাসিন্দা। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এদের হাতে তৈরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও পারা, বড়ম প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায়। এদের পর আসে ভূমিজরা।

তারপর এলো আর্য্য ব্রাহ্মণ ধর্মের স্রোত। শরাক ও ভূমিজরা বেশ কিছু বছর শান্তিতে পাশাপাশি বসবাস করার পর এক সময় এই তুই দলের মধ্যে ক্ষমতা বিস্তারের সংঘর্ষ বাধে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে শরাকরা কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং ভূমিজরা সারা জেলায় ক্ষমতা বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মুসলমান আমলে এ অঞ্চলের নাম ছিল ঝাড়খণ্ড। তাঁদের সময় পুরুলিয়া খুব ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও, এর উপর দিয়ে ঝড় যে একেবারে প্রবাহিত হয় নি, এমন নয়। এই ঝাড়খণ্ড পথেই বাংলার সুবাদার আকবরের সেনাপতি মানসিংহ মেদিনীপুরে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সমগ্র বাংলাদেশ ইংরাজ বণিকদের করায়ত্ত হয় কিন্তু প্রায় একশো বছর চেষ্টার পর এই অঞ্চলের স্বাধীন আদিবাসীদের বশ্যতা স্বীকার করাতে বা দমন করতে সক্ষম হয়নি। পুরুলিয়ার উপর দিয়ে অনেক ভাঙাগড়ার স্রোত বয়ে গেছে এবং তারপরে অনেক অনেক পরিবর্তনের উত্তরাধিকারী হয়েছে আজকের এই পুরুলিয়া।

এই আদিবাসীদের অনার্য্য সংস্কৃতির সঙ্গে জৈন, বৌদ্ধ আর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিশ্রণে পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। টুসু উৎসব ও ছউ নৃত্য পুরুলিয়া জেলার একমাত্র লোক সংস্কৃতি। রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনীকে নৃত্যের মাধ্যমে রূপদান করেন মুখোশধারী নর্ত্তক অভিনেতাগণ। পুরুলিয়ার লোক-সংস্কৃতি নানা-ভাবে পুষ্ট হয়েছে বহু শতাব্দী ধরে। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশেছে মুণ্ডারী, ভূমিজ, সাঁওতালদের দ্রাবিড় সংস্কৃতির ধারা। বোধপুর, বড়ম, পারায় জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ যেমন দেখা যায় তেমনি দালমী চাকুলতোড়ে, তেলকুপীতে ভাঙা মন্দিরের ভাস্কর্য্যে জৈনদের পর বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবও পড়েছে।

পুরুলিয়ার কাছে কাঁসাই নদীর তীরে ভাঙা মন্দিরটিতে মিশরীয় ভাস্কর্য্যের চিহ্ন পাওয়া যায়। মন্দিরের ভিতরের মূর্তিটি দেখলে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি বলে মনে হয়। এই নদীর তীরেই বড়ামের তিনটি

বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। এতদিন পূর্বে জৈনমন্দির ছিল বলে প্রমাণিত হয় (আলোকচিত্র—৩৮)।

পারায় অনেকগুলি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এগুলি শরাকদের পূর্ব-পুরুষের কীর্তি। এগুলির মধ্যে নরম পাথরের তৈরি মন্দিরটি ভাস্কর্য্যে অতুলনীয়। রাজা মানসিংহ একবার এই মন্দিরটির সংস্কার করেছিলেন। মন্দিরের কিছু অদূরেই একটি স্তম্ভ দেখা যায়। এই মন্দিরের দেবী নরমাংসভোজী। এই পাথরের পিলারে দেবী মাংস কুটে খেতেন।

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে দালমীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের দুর্গ ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। পুরুলিয়া শহরের পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পাকতীবাগ্রামে জৈন তীর্থঙ্করের সাড়ে সাত ফুট দীর্ঘ উলঙ্গ মূর্তি জৈন স্থাপত্যের এক আশ্চর্য্য নিদর্শন।

বরাকর আর দামোদরের সঙ্গমে পঞ্চকোট বা পাঞ্চেৎ। এখানে পঞ্চকোটের রাজার প্রাসাদ আর দুর্গ ছিল। বারো বর্গমাইলের এই বিশাল দুর্গের পাঁচটি তোরণ আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কেহ কেহ বলেন, ঐ পঞ্চতোরণ থেকেই পঞ্চকোট নামের উৎপত্তি।

সুতরাং দেখা যায়, এই অনুর্বর অঞ্চলে একধারে যেমন গড়ে উঠেছে তার লোক সংস্কৃতির সম্পদ, তেমন তার সর্বত্রই প্রায় ছড়িয়ে আছে দশম-একাদশ শতকের বহু মঠ ও মন্দির। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবাহ ছাড়াও জৈনধর্মের প্রভাব এখানে এত গভীরভাবে বিস্তৃত হয়েছিল যে তাঁর নিদর্শন স্বরূপ এখনও সেই প্রাচীন মন্দিরগুলি কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষয়-ক্ষতির সঙ্গে মোকাবিলা করে। আর কত যে কালের কপোলতলে বিসর্জ্জিত হয়েছে তারও ঠিক-ঠিকানা নেই। এই পাথরের দেশে শুধু পাথরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যই গড়ে উঠে নি, গড়ে উঠেছে দশম-একাদশ শতকের পোড়ামাটির ভাস্কর্য্য সজ্জাসমন্বিত বিরাটকায় ইটের শিখর দেউল যার সাক্ষী আজও রয়েছে পারা ও বড়ামদেউল-ঘাটায়। যদিও সংস্কারের অভাবে এই হাজার হাজার বছরের

ঐশ্বর্য্যময় মন্দিরগুলি ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে। তাছাড়া, দশম শতক থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক পর্য্যন্ত নির্মিত বহু পাথরের মন্দির আর তার অভ্যন্তরস্থ মূর্তিরাজি অবহেলায় অনাদরে ধ্বংস হতে চলেছে। এখনও সুধমাদেউলী, পলসা, পাকবিড়া, বুধপুর, আর্শা, টুইমামা, বাঁদা ও কোশজুড়ি অঞ্চলে যে ক'টি পাথরের মন্দির আছে ও তার আশপাশে যে সব মূর্তি ভাস্কর্য্যের সম্পদ ছড়িয়ে আছে তার প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য অপরিসীম বললেও চলে। এছাড়া, পরবর্তীকালে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে পুরুলিয়া তথা পূর্বতন মালভূমে যে ক'টি পোড়ামাটি সমন্বিত মন্দির দেখা গেছে তার উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। পুরুলিয়া জেলাতে জোড়বাংলার মন্দির মাত্র চারটি স্থানে দেখা যায়, যেমন—ডিমডিহা, গদীবেড়ো, চাকুলতোড় ও গড়পঞ্চকোট। জোড়বাংলার স্থাপত্যে নির্মিত ঝালদা থানার দঙ্গলগ্রামে যে পীরের সমাধি আছে তা একান্ত অভিনব। এছাড়া, পোড়ামাটির অপূর্ব ভাস্কর্য্য সমন্বিত চেলিয়ামার আটচালা এবং আচাকদার চারচালা মন্দিরটি পুরুলিয়া জেলার একান্ত গৌরব।

বর্ধমান

প্রাচীন রাঢ়ভূমির একেবারে মধ্যস্থানে ছিল বর্ধমান। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান রাঢ় দেশে এসেছিলেন বলে জানা যায়। আর যে অঞ্চলে তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন, সেই অঞ্চলের নাম বর্ধমান। সেই থেকেই ঐ নামে বর্ধমান পরিচিতি লাভ করে। আবার কেউ কেউ বলেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ধমান স্বামী বা মহাবীর স্বামী এই দেশের অধিবাসীগণের মধ্যে ধর্ম-প্রচার করতে এসে চুয়াড়দের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিলেন এবং তাঁর নামানুসারে বর্ধমান নামকরণ হয়েছে। রাঢ়ের একটি অংশ পরিচিত হয় বর্ধমানভুক্তি নামে। ভুক্তির অর্থ হোল প্রদেশ। বর্ধমানভুক্তির আদি সীমারেখা ছিল উত্তরে অজয় নদ, পূর্ব ও দক্ষিণে গঙ্গা প্রবাহ, পশ্চিমে অরণ্যরাজি। অবশ্য এক সময় বর্ধমানভুক্তি বলতে প্রায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকেই বোঝাত। বর্ধমানভুক্তির প্রথম ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মহারাজা বিজয় সেনের মল্ল সরুললিপিতে—"সতত ধর্মক্রিয়া মানায়াং শ্রীবর্ধমান ভুক্তৌ।"

আইন-ই-আকবরীতে মহল বর্ধমানের উল্লেখ দেখা যায়। মুর্শিদকুলি খাঁর অথবা ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের পরে সরকার সরিফাবাদ, সেলিমাবাদ ও মান্দারণের এক বিরাট অংশ ছাড়াও সরকার সাতগাঁওয়ের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয় চাক্‌লা বর্ধমান এবং ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই চাক্‌লা বর্ধমান অর্থাৎ বর্ধমান মহারাজার সমস্ত জমিদারী অঞ্চল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ন্যস্ত হয়। এখানকার মাটী লাল-কাঁকর আর লালবালি।

বর্ধমানের উত্তরে অজয় নদী, দক্ষিণে দুরন্ত দামোদর।

বর্ধমানের সংস্কৃতি অতি প্রাচীন। গোপবংশীয় রাজারা একদিন রাঢ় অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। অমরার গড়ে তাদের রাজধানীর

ধ্বংসাবশেষ আজও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁরা ছিলেন শিবের উপাসক। কিন্তু গোপচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। গুপ্তসাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে সকল স্বাধীনরাজ্য গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে গৌড় অন্যতম। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান নিয়ে গঠিত ছিল তখনকার গৌড়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে একজন সামন্ত নৃপতি গৌড়ের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গৌড় রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করবার চেষ্টা করেন। তিনি মহাসামন্ত শশাংক। শশাংকের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। কর্ণসুবর্ণের অবস্থান নিয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। কেউ বলেন, মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটি, কেউ বলেন, হুগলী জেলার মহানদে, আবার কেউ বলেন, বর্ধমানের কার্জন নগরই ছিল কর্ণসুবর্ণ। শশাংক শৈব ছিলেন। অবশ্য বর্ধমানে শিবের পূজাও যেমন হয় তেমনি গ্রামে গ্রামে ধর্মঠাকুরেরও অভাব নেই। মনে হয়, পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়দের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। অনেকে বলেন, এরা বাংলার বাইরে থেকে এসেছিলেন, কিন্তু কথাটি ঠিক নয়, কেননা এরা ছিলেন বাঙ্গালী। প্রথমে এরা ছিলেন সদগোপের মতই কৃষিজীবী, পরে শৌর্য্যবীর্য্যের বিকাশ ঘটেছিল। রাজা রামপালের সামন্তদের মধ্যে এরাই ছিলেন প্রধান। রাঢ়ের সাংস্কৃতিক জীবনে উগ্রক্ষত্রিয় ও সদগোপের দান অপরিসীম। এরা ছিলেন শক্তির উপাসক। বর্ধমান জেলার যে অংশ গোপভূমি সেখানকার সদগোপগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে ইছাই ঘোষ সামন্তপদ থেকে নিজের প্রতিভা ও বাহু-বলে শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল ঢেকুর। বর্ত্তমান শ্যামারূপার গড় কাঁকসার অন্তর্গত অজয়নদীর তীরে। এখনও এই গড়ের ও ইছাই ঘোষের দুর্গের সাক্ষ্য বর্তমান। গৌরাঙ্গপুরে যে রেখদেউলটি আছে, তার নির্মাতা ছিলেন ইছাই ঘোষ। দেউলে প্রাচীন কারুকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ধমানের প্রাচীন ইতিহাসও উপেক্ষিত নয়। মশাগ্রাম থেকে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা

আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে মনে হয়, বাংলা দেশে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব ছিল। এই গ্রামের বলরাম-বিষ্ণু মূর্তিটি এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে। পালযুগ বর্ধমানের সমৃদ্ধির যুগ। অনেকে মনে করেন, পাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল পাল রাঢ়ভূমির সন্তান ছিলেন। সেন আমলের পর যখন বাংলাদেশে মুসলমান এলো, তখন বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ ঘটে চলতে লাগলো এই বর্ধমানের উপর। আজও বর্ধমানে অনেক গ্রামে এদের পূজিত চামুণ্ডা, কিংবা মহিষ-মর্দিনীর মূর্ত্তি দেখা যায়।

ষোড়শ শতকের শেষের দিকে মোগল সেনাপতি টোডরমল পাঠান সুলতান দায়ুদ কররানীকে বাংলাদেশ থেকে উড়িষ্যার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার পথে বর্ধমানে ঘাঁটী তৈরী করেছিলেন। এরপর বর্ধমান শহরের উপর মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নজর পড়ে। জাহাঙ্গীর বিবাহ করতে চেয়েছিলেন পরমাসুন্দরী, জগতের আলো নূরজাহানকে, কিন্তু আকবর বাদশাহ শের আফগান নামক এক মহানায়কের সঙ্গে নূরজাহানের বিবাহ দিয়ে পাঠিয়ে দেন এই বর্ধমানে। আকবরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন জাহাঙ্গীর। বাংলার সুবাদার তখন মানসিংহ। মানসিংহ বাংলাদেশে থাকলে তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ নাও হতে পারে ভেবে কুতুবুদ্দিন খাঁকে মানসিংহের স্থলাভিষিক্ত করলেন। কুতুবুদ্দিন জাহাঙ্গীরের মনের কথা জানতেন তাই শের আফগানের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। কিন্তু সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী শের আফগান কুতুবুদ্দিনকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করতে বাধ্য হলেন, আর এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ দুইজনেই প্রাণ হারালেন। আজও বাঁকানদীর তীরে দু'জনের কবর পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর তখন বর্ধমান থেকে নূরজাহানকে নিয়ে যান দিল্লীতে। জায়গীরদারের পত্নী হলেন ভারত সম্রাজ্ঞী।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বর্ধমানে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং অচিরেই তা দখল করে নেন।

১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব-পৌত্র আজিমুশ্বানকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। বাংলার রাজধানী তখন ঢাকায় থাকা সত্ত্বেও সুবাদার বর্ধমানকে দ্বিতীয় রাজধানী করে তিন বৎসরকাল সেখানে অতিবাহিত করেছিলেন।

আলিবর্দ্দীর সময়ও বর্ধমানের চিত্র চমকপ্রদ। আরামবাগে যখন আলিবর্দ্দী বিশ্রাম করছিলেন তখন শুনলেন বর্গীর দল বাংলার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ব্যস্ত। তিনি অলস হয়ে না বসে থেকে বর্ধমানে ঘাঁটি তৈরি করে তাদের অপেক্ষায় রইলেন। বর্গীরাও বর্ধমানকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরলেন. অনেকদিন যুদ্ধ চললো; অবশেষে, আলিবর্দ্দী তাদের পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেন এবং কাটোয়া পর্য্যন্ত দূরে সরিয়ে দিয়ে তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে আনেন। বর্গীরা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে বর্ধমানের গ্রাম শহর লুঠ ক'রে বিধ্বস্ত করে দেয়। সেই বর্গীদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী আজও বাঙালী জাতির ইতিহাসে জড়িত হয়ে আছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বর্ধমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা-লাভ করতে আরম্ভ করে এবং এরপর বর্ধমানের ইতিহাস মুখ্যতঃ রাজবংশেরই ইতিহাস। চিত্রসেনের আগে অনেকেই বর্ধমানের সিংহাসনে বসেছিলেন কিন্তু চিত্রসেনই সর্বপ্রথম রাজা উপাধি লাভ করেন। দিল্লীর বাদশাহের ফরমান অনুযায়ী মারাঠা আক্রমণে যখন বর্ধমান পর্যুদস্ত তখন বাদশাহ আলমের কাছ থেকে তিলকচাঁদ মহারাজাধিরাজ উপাধি লাভ করে বর্ধমানের সিংহাসনে বসেন। তিনিই চিত্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি বাংলার নবাব ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এমনকি, তিলকচাঁদের পক্ষেও বীরভূমের রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরাজদের বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে জয়লাভ করা সহজ ছিল না। অন্যদিকে মহারাজকে স্বপক্ষে রাখাই ছিল কোম্পানীর অত্যন্ত প্রয়োজন। কোম্পানী বেশ ভাল করেই জানতো যে বর্ধমানের

কুঠিগুলির সচল অবস্থা নির্ভর করে মহারাজার সহানুভূতির উপর। সুতরাং স্বার্থের দিকে চেয়েই মহারাজার বিরাগভাজন হতে চায় নি বা মহারাজাকে গদিচ্যুত করে নি। এরপর বর্ধমানের সিংহাসনে আসেন তেজচাঁদ, প্রতাপচাঁদ, মহতাবচাঁদ (দত্তক পুত্র) এবং পরিশেষে বিজয়চাঁদ (দত্তক পুত্র)।

সম্ভবতঃ, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সভ্যতা ও কৃষ্টি এই অঞ্চলে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। আর্য্য সভ্যতার অনুপ্রবেশ তিনটি ধারায় ছিল —জৈন, বুদ্ধ ও ব্রাহ্মণ। কোন্ কোন্ ধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ঠিক কোন্ কোন্ সময় তা বলা শক্ত তবে জৈনধর্মের অনুপ্রবেশ যে প্রথম ঘটেছিল এমন মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। বরাকরের বেগুনিয়া মন্দিরগুলির একটিতে জৈন প্রভাব লক্ষিত হয়। কারো কারো মতে, কালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বিকার প্রকৃতপক্ষে একজন জৈন দেবতার নাম থেকে উৎপত্তি হয়েছিল। আসানসোলে সালামপুর অঞ্চলে অরাফ উপাধিধারী যে একশ্রেণী লোকের বসবাস, তারা নিজেদের জৈন বলে আজও পরিচয় দেয়। এরপর আসে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই মতবাদ প্রচলিত লৌকিক ধর্ম ও ভাবধারার সঙ্গে মিলে গিয়ে এক নূতন সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটায় যা আজ জনগণের সংস্কৃতি। আনুমানিক, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের বাগদীরাজা বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। হেরুক, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অনুপ্রবেশ করেছিল বটে কিন্তু তা ছিল উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমিত, জনগণ ছিল বৌদ্ধবাদী। ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে আবার শৈবতন্ত্র ও শিবশক্তির আরাধনার প্রসার ছিল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যবর্তী বাসুলী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবী পূজা করত। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ্য মূর্তি বর্তমানে দেখা যায় তা তন্ত্রোক্ত দেবী, যেমন বরাকরের কল্যাণেশ্বরী, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, কেতুগ্রামের বহুলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বহুলা মূর্ত্তিটি কষ্টিপাথরের। বামে কার্ত্তিক ও দক্ষিণে গণেশের অবস্থান লক্ষ্য করা

যায়। প্রবাদ আছে যে চন্দ্রকেতু নামে কোন রাজা এই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

আজ বর্ধমানে নূরজাহান নেই, নেই শের আফগান, নেই তাঁদের প্রাসাদ, ফুলবাগিচা। একদিন ছিল, কিন্তু কালের নির্মম আঘাতে সবই আজ বিলুপ্ত। শুধু জয়পালের আর পীরবহরমের স্মৃতিচিহ্ন সেকালের হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পীরবহরম সুদূর দিল্লী থেকে বর্ধমানে আসেন এবং জয়পালের সৌহার্দ্যলাভ করেন। এছাড়া, এই জেলার বিভিন্নস্থানে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পুরাকীর্ত্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বরাকরে মন্দিরের সংখ্যা চারটি—একই জায়গায় চারটি মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে ৪র্থ মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। রেখবিন্যাস, পগ ইত্যাদি দেখে মনে হয় যে উড়িষ্যার প্রাচীনতম রেখমন্দির পরশুরামের মন্দিরের গঠনপ্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। তবে অনেকে একে আবার দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁদের মতে, বরাকর মন্দিরের উপরে যে আমলক আছে তার খাঁজগুলি কনভেক্স নয়, কনকেভ। অর্থাৎ উড়িষ্যার রেখমন্দিরের আমলকের খাঁজ কনভেক্স বা বহিঃ বর্তুলাকার আর বরাকর মন্দিরের আমলকের খাঁজ কনকেভ বা অন্তঃ বর্তুলাকার। সম্ভবতঃ, মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দ। তবে আরও একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক বেগলারের মতে, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি, সম্ভবতঃ, ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের এবং পুরুলিয়ার তেলকুপি মন্দিরের সঙ্গে বিশেষ মিল আছে। অন্যান্য মন্দিরের একটিতে শায়িত মৎস্যমূর্তি তার উপর পাঁচটি শিবলিঙ্গ। আরেকটিতে শিবলিঙ্গসহ গণেশ ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি।

কল্যাণেশ্বর মন্দির (আলোকচিত্র—৩৯) বরাকর নদীর প্রায় নিকটবর্তী। তিনসারির মন্দির এবং সবগুলিই পূর্বমুখী। মূল মন্দিরটিতে কল্যাণেশ্বরীর বিগ্রহ আছে। কিংবদন্তী আছে যে

পুরোহিতের কন্যাকে দেবী ভক্ষণ করে ফেলায় দেবী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে থাকেন। কল্যাণকোট মন্দিরের গায়ে বাংলায় লিখিত যে লিপি দেখা যায়, তাতে মনে হয়, এই স্থানের নাম ছিল কল্যাণকোট। চুরুলিয়ার দুর্গে রাজা নরোত্তমের নাম শোনা যায়। পাথরের তৈরি ভাঙা দুর্গের চিহ্ন আজও দেখা যায়। নরোত্তম বলে কেউ রাজত্ব করতেন কিনা জানা যায় না, তবে মুসলমান রাজত্বের আগে হয়তো অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, এই দুর্গ প্রথম নির্মাণ করেন পঞ্চকোট রাজগণ। তাঁরা ডিহিমের দুর্গও নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়, তবে তার চিহ্ন বর্তমানে নেই।

অণ্ডালের অনতিদূরে পাণ্ডবেশ্বর। প্রবাদ যে মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসের সময় এইস্থানে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন এবং পাঁচটি শিবমন্দির স্থাপন করেছিলেন। তারমধ্যে একটি শিবমন্দিরের নাম পাণ্ডবেশ্বর। পাণ্ডব কর্তৃক মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি থাকলেও কোন ঐতিহাসিক তথ্য নেই এবং মন্দিরগুলি খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না। নিকটেই প্রকাণ্ড ঢিবি পাণ্ডুরাজার ঢিবি বলেই প্রসিদ্ধ। খননকার্য্যের ফলে তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন মেলে। কিছু নরকংকালও পাওয়া গেছে। দেওয়াল, পোড়া ইটের ভিত্তি প্রস্তর। লাল-কালো রঙের মৃৎপাত্র, ঝুটিওয়ালা ষাঁড়ের প্রতিমূর্তি, তামার বালা এবং একটি শিলমোহর। এগুলি বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এগুলি খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ বৎসর কি তারও আগেকার এবং ভূমধ্য সাগরস্থ ক্রীটদ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে এই অঞ্চলের জলপথে যোগাযোগ ছিল। শেষস্তরে একটা লোহার বর্শা পাওয়া যায় এবং পণ্ডিতগণ মনে করেন পাণ্ডুরাজার ঢিবির সভ্যতা ফিলিষ্টিন ও হিট্টিয় সভ্যতার সমগোত্রীয় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ বৎসরের। এই অঞ্চল ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন মেলে নি। অমরার গড়ের অবস্থান মানকরের কাছেই। সদগোপ

রাজগণের রাজধানী। নগরটি সুরক্ষিত, প্রাকার ও পরিখা পরিবেষ্টিত এবং এদের চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে বর্তমান। সদ্‌গোপ রাজগণের আরাধ্যা দেবী শিবাক্ষ্য মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন ভল্লুপাদ দশম খ্রীষ্টাব্দে। এই সদ্‌গোপের আর একটি শাখা কাঁকসায় রাজত্ব করতেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে কাঁকসায় মুসলমান অধিকার স্থাপিত হয়। সদ্‌গোপ রাজগণের নির্মিত কঙ্কেশ্বরের গড়ের চিহ্ন, শিবমন্দির ও গড়ের সংলগ্ন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অধুনা বর্তমান। রাঢ়েশ্বর বা কলেশ্বর শিবমন্দির অমরায় অবস্থিত। মন্দিরটি অতীব প্রাচীন এবং স্থাপত্যকলা অত্যন্ত মনোরম। অনেকের মতে, রাজা লক্ষ্মণসেনের সময় মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল আবার কেউ বলেন, এটি সদ্‌গোপ রাজগণেরই কীর্তি।

বর্ধমানের ঐতিহ্যপূর্ণ কীর্তিকলাপের মধ্যে শেরআফগান ও কুতুবুদ্দিনের সমাধি (১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ) পীর বাহারণ সাক্‌কার সমাধি, খাজা আনওয়ার সাহেবের সমাধি। এছাড়া, নবাবহাটে ১০৮টি শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য। মহারাণী বিষ্ণুকুমারী ১৭৮৮ সালে মন্দিরগুলি প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্মাণ করেন। আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-ঔস-সানের আদেশে নির্মিত হয় জুম্মা মসজিদ। বর্গীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজপরিবার যে দুর্গ নির্মাণ করেন তা তালিতগড়ের দুর্গ বলেই প্রসিদ্ধ—প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত। বর্ধমানের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থানের মধ্যে আছে রাজপ্রাসাদ, দিলখুসা ও গোলাপবাগ। এই সকল অঞ্চল নব প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত। কয়েকটি পুরাতন রমনীয় জলাশয় আছে। তারমধ্যে বিশালাকায় কৃষ্ণসাগর খনন করেন রাজা কৃষ্ণরাম রায় আর রাণীসাগর করেন রাণী ব্রজকিশোরী। লর্ড কার্জনের সময় মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ যে তোরণ ক'রে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান তা আজ বিজয়চাঁদ তোরণ বলে খ্যাত। বর্ধমানের কাঞ্চননগরের বহু প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি আজও অতীত স্মৃতি বহন করে চলেছে। এখানে জোড়বাংলা পদ্ধতির যে মন্দির আছে তার কারুকার্য্য ও স্থাপত্য অতি উচ্চ পর্য্যায়ের।

কাংগালরূপিনী দেবী ভগবতীর পাথরের নির্মিত প্রাচীন একটি মূর্ত্তি এখানে পাওয়া যায়। ভাস্কর্য্য ও শিল্পচাতুর্য্য অতীব মনোরম।

কুলীনগ্রামে শিবানী মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এই গ্রামে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির নির্মিত হয় খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তাছাড়া, আরও বহু পুরাতন কীর্ত্তির মধ্যে আছে রামানন্দ ঠাকুরের গড়, গোপীনাথের মন্দির, মদনগোপালের মন্দির এবং বিখ্যাত গোপালজীর মন্দির (আলোক চিত্র—৪২)।

ভাগীরথীর তীরে অম্বিকা কালনা যে হিন্দুযুগেও বেশ সমৃদ্ধশালী সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, তার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এখনও আছে। কালনায় মুসলমান যুগের যে কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে তার মধ্যে কয়েকটি মসজিদ ও একটি দুর্গ প্রধান। হিন্দু দেবালয়ের অসংখ্য ভগ্নাবশেষ দিয়ে মসজিদ তৈরি। পাথরের টুক্‌রোর উপর এখনও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদাই করা রয়েছে। কালনার মুসলমানযুগের নিদর্শনগুলি তুর্কী আফগান রাজত্বকালের। শাসপুরে তিনটি পুরাতন মসজিদের অস্তিত্ব দেখা যায়। কালনায় যে বিরাট মসজিদ রয়েছে তার মাথার গম্বুজ ও মিনারগুলি ভেঙে গেছে তবে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। শিলালেখ অনুযায়ী ফিরোজশাহের আমলে ১৫৩৩ সালে তৈরি। মসজিদের নাম 'মসজিদ-ই-জামিয়া'। অম্বিকা কালনায় অম্বিকা দেবীর মন্দির। অনেকের বিশ্বাস, এই মন্দির আদিতে জৈন মন্দির ও এখানে জৈন দেবতা ছিল। মধ্যযুগের স্থাপত্যকলা ও ভাস্কর্য্যের বহু নিদর্শন এই কালনায় রয়েছে। তারমধ্যে মজলিস সাহেবের সমাধি উল্লেখযোগ্য। আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে তৈরি হয়েছিল। কালনার বড় মসজিদও অত্যন্ত প্রাচীন। এছাড়া আছে বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির ইত্যাদি। বহু বৌদ্ধতান্ত্রিক ও অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তিও এখানে দেখা যায়। কালনা খ্যাতিলাভ করে মধ্যযুগে। মনে হয়, ইসলাম ধর্মের প্রভাব পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেই প্রবেশ করেছিল।

ফলে, কালনা একসময় ইসলাম সংস্কৃতির একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল এবং ঐ সময় অনেক মসজিদ ও ইমারৎ নির্মিত হয়। আবার এই সময়ই কালনা বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় পাশাপাশি দুই বিরুদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব। এখানে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং তাঁরা যে প্রভাব স্থাপন করেছিলেন আজও তা ম্লান হয়নি। রাজা চিত্রসেন ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হয় কালনার বিখ্যাত শিবমন্দির। বর্ধমান রাজবংশের আরও বহু কীর্ত্তি আছে কালনায়, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজপ্রাসাদ, লালজীর মন্দির (আলোকচিত্র-৪০), কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির ও জলেশ্বর মন্দির। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কালনাতে নীলচাষের কেন্দ্র করা হয়েছিল।

মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত ক্ষীরগ্রাম হিন্দুদের পীঠস্থান এবং দেবী যোগাদ্দ্যা বিরাজিতা। প্রবাদ আছে যে পুরাকালে পাতালবাসী মহীরাবণ এই দেবীকে পূজা করতেন। দেবীর নাম ছিল ভদ্রকালী পরে হনুমান যখন মহীরাবণকে বধ ক'রে রামলক্ষ্মণকে উদ্ধার করে আনে সেই সঙ্গে ভদ্রকালীর মূর্ত্তিও উদ্ধার ক'রে ক্ষীরগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করে। দেবীর মূর্ত্তি পাথরের তৈরি এবং তন্ত্রভুক্ত। কেন যোগাদ্দ্যা হয়েছে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। যোগাদ্দ্যা মন্দিরের শিলালিপি প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত এবং তা থেকে মন্দিরের নির্মাণকালের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়। তবে মন্দিরের দ্বারসংলগ্ন বেলে পাথরের কাজগুলি যে খ্রীষ্টীয় সাত আট শতকের তা অনেকেই অনুমান করেন। মুসলমান আক্রমণে প্রাচীন মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে পর রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র পুনরায় নির্মিত করেন ১৭৭১—১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং সম্ভবতঃ, প্রাচীন খিলানগুলি ব্যবহৃত হয়। এখানে ক্ষীরকণ্ঠ শিবের অত্যুচ্চ টিবির উপরে অবস্থিত মন্দির বৌদ্ধযুগের স্তূপের সাম্ভাব্য নিদর্শন। বালি পাথরের অনাদিলিঙ্গ শিব দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে সংযোগ সূচনা করে। মঙ্গলকোটে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল সুলতান হুসেন

শাহের মসজিদে রাজা চন্দ্রসেন নাম উৎকীর্ণ থাকতে দেখা যায়। ঐতিহাসিক সত্য এই যে হুসেন শাহের পূর্বে রাজা বিক্রমজিৎ ও চন্দ্রসেন রাজত্ব করতেন। বাদশাহ আরঙ্গজেবের সময় স্থাপিত পীরদানেশ সমাধি, কোরা সাহেবের মসজিদের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। কাটোয়া মুসলমান যুগে এক প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। কাটোয়ার দুর্গ ছিল উল্লেখযোগ্য। নবাব আলিবর্দ্দির বিরুদ্ধে এখানে ভাস্কর পণ্ডিত মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করেছিলেন। মারাঠারা এই দুর্গ একসময় জয় করেছিলেন। তবে বর্তমানে এই দুর্গের চিহ্নও কিছুমাত্র দেখা যায় না। বর্গির হাঙ্গামার সময় একে মুর্শিদাবাদের প্রবেশদ্বার বলে বিবেচিত করা হোত এবং আলিবর্দ্দি খাঁ এইস্থানকে ঘাঁটী হিসাবে ব্যবহার করতেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে কাটোয়াকে কোথাও কোথাও কণ্টকনগর বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কাটোয়াকে বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান বলা হোত। মুর্শিদকুলি খাঁর মসজিদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। অগ্রদ্বীপও বৈষ্ণব সমাজে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এখানকার গোপীনাথ বিগ্রহ বাংলা ভাস্কর্য্যের নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

মন্তেশ্বরের অদূরে পাতুনে পাতুনেশ্বর বা পতঞ্জলীশ্বর, অন্যথায় বক্রেশ্বর শিবমন্দির রয়েছে। কথিত আছে, দার্শনিক পতঞ্জলী নানাস্থান ভ্রমণ ক'রে এখানে উপস্থিত হন এবং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে সাধনা করেন। পাতুনে এক সময় জৈনধর্ম ও বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রতিপত্তি ছিল। এই শিবমন্দিরের কাছে তীর্থংকরের মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। আর আছে, অবলোকিতেশ্বর ও অন্যান্য বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবী মূর্ত্তি ও কূর্মাকার ধর্মঠাকুর। গ্রাম দেবতা হলেন ধর্মরাজ এবং পতঞ্জলী বা পটেশ্বর বা পত্রেশ্বর শিব। পত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে যে সব পাথরের মূর্ত্তি স্তূপীকৃত করা রয়েছে তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল—

১। বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী মূর্তি।

২। অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বর বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ মূর্তি।

৩। ধর্মরাজের নানা আকারের কূর্মমূর্তি।

৪। শিবলিঙ্গ।

মুর্ত্তিগুলি অধিকাংশই পালযুগের শেষে এবং সেনযুগে খোদাই করা হয়েছে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "Eastern Indian school of mediaeval sculpture" গ্রন্থে বলেছেন যে, এই লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্ত্তিগুলি এমন এক সময়ে তৈরি হয়েছিল যখন প্রাচীন ভাগবত বৈষ্ণব মূর্তির সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযানী লোকেশ্বরের মিলন-মিশ্রণ ঘটেছিল। পাতুনের দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে সবচেয়ে সংখ্যা বেশী হোল শিবলিঙ্গের ও কূর্মাকৃতি ধর্মরাজঠাকুরের। ধর্মরাজের এত বিচিত্র কূর্মাকৃতি মূর্ত্তি পশ্চিমবাংলায় আর কোথাও নেই। অনেক স্থানে ধর্মঠাকুর শিবঠাকুরে পরিণত হয়েছেন। দেউলগ্রামে যে মন্দিরের অস্তিত্ব আজ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত প্রাচীন এবং অনেকে এই মন্দিরটিকে পুরুলিয়ার পারার মন্দির, বাঁকুড়ার বাহুলাড়া এবং চব্বিশ পরগণার জটার দেউলের সঙ্গে তুলনা করেন। রাইগ্রামে চূড়ামণি বটুক এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। চূড়ামণি ছিলেন রাজা লক্ষণ সেনের মন্ত্রী। মুসলমান অধিকারের প্রথম দিকে মন্দিরটি বিধ্বস্ত হয়। মন্দিরের শেষ চিহ্ন স্বরূপ আছে এক বিরাট স্তূপ—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইট ও প্রস্তরখণ্ড। আদি বরাহের স্থান অধিকার করে আছে পীর গোরাচাঁদ। মণ্ডল গ্রামে জগৎগৌরী দেবতা বিখ্যাত। ইনিই বিষহরি বা মনসা। জৌগ্রামের মন্দির (আলোক চিত্র—৪১) বর্ধমানের এক বিশিষ্ট পূরাকীর্ত্তি। কোগ্রামে মঙ্গলচণ্ডীর প্রাচীন মূর্তির দর্শন মেলে। তাঁর পাশে আছেন বজ্রাসনে আসীন প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি। এখানে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি ছিল, তা এখন বঙ্গীয় সাহিত্য ভবনে স্থানান্তরিত। কোগ্রাম জৈন, বৌদ্ধ ও তন্ত্রসাধনার কেন্দ্র ছিল বলে মনে হয়। কুরমূনে ঈশানেশ্বর শিবমন্দিরে একটি প্রাচীন ইন্দ্রাণী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বাদশাহ শাহজাহানের নির্মিত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এবং শেরশাহের সময় নির্মিত সের গড়ের চিহ্ন আজও বর্তমান।

হুগলী

ঠিক কোন সময়ে যে হুগলী নামের উৎপত্তি হয়েছিল তা বলা যায় না কারণ হুগলীর সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য আদিকাল থেকে সপ্তগ্রাম নির্ব্বাহ করত। হুগলী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করে ঐতিহাসিকগণ এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রাচীনকালে ভাগীরথী নদীর তীরে বহু হোগলা গাছ জন্মাত এবং সেই থেকেই হুগলী নাম চলে আসছে। প্রাচীন ইংরাজী গ্রন্থাদিতে হুগোলি, গুগলি, গোইলন, হিউগলি, হাগলে, গোইল ইত্যাদি বহু নামের উল্লেখ দেখা যায়।

হুগলী জেলা প্রথমে বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শাসনকার্য্যের সুবিধার্থে বর্ধমান জেলাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। উত্তরাংশ বর্ধমান ও দক্ষিণাংশ হুগলী। হুগলী নামটি পর্ত্তুগীজদের দেওয়া নাম। সপ্তগ্রামের পত্তনের পর হুগলী পর্ত্তুগীজদের যত্নে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হুগলী জেলা দু'টি মহকুমায় বিভক্ত ছিল—হুগলী ও শ্রীরামপুর সদর। জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ) এবং গোঘাট বর্ধমান জেলা ও খানাকুল হাওড়া জেলার মধ্যে ছিল। কিন্তু ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এগুলিকে হুগলীর অধীনে আনা হয়।

বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজস্বরূপ দেখতে হলে হুগলী জেলার প্রাচীন মন্দিরগুলি দেখা আবশ্যক। হুগলী জেলার প্রায় দু'হাজার গ্রামে মোটামুটি ভাবে ৪৮৭টি ছোট, বড়, মাঝারি রকমের যে সব মন্দির আছে, সেগুলি দেখলে বোঝা যায় হুগলী জেলার গ্রামগুলি একসময় কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল।

সপ্তগ্রাম বন্দর থেকে সুদূর সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, বলী প্রভৃতি দেশে বাঙালী বনিকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করত এবং মুসলীম আমলে এই বন্দর প্রধান কর্মস্থল ছিল। এই সময় হুগলী জেলা বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে

ওঠার ফলে পর্তুগীজ দৃষ্টি প্রথমে এদিকে এসে পড়েছিল। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণক প্রথম হুগলীতে ব্যবসা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে কুঠি স্থাপন করেন। তিনি এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেণ্ট হিসাবে এসেছিলেন। তখন দেশে মোগল রাজত্ব। তাদের সঙ্গে জব চার্ণকের বিবাদই ইংরাজ-মোগল সংঘর্ষ অনিবার্য্য করে তোলে। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর রাজপথে এই যুদ্ধ হয় এবং পরবর্তী পর্য্যায়ে হুগলী নদী বা গঙ্গার উপর ইংরাজদের প্রভাব অনেক বেড়ে যায়।

পাথর এ দেশে দুর্লভ বলে হুগলী জেলাতে পাথরের মন্দির একরকম নেই বললেই চলে। সাধারণতঃ, ইটের দ্বারাই হুগলী জেলার সমস্ত মন্দির নির্ম্মিত। ইটের আয়ু খুব বেশীদিন থাকে না বলে খুব প্রাচীন মন্দির সচরাচর চোখে পড়ে না।

হুগলীতেও অন্যান্য জেলার মত চালামন্দির, রত্নমন্দির ইত্যাদি বাংলা মন্দিরশিল্পের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বাংলা মন্দির দুই শ্রেণীর—একবাংলা ও জোড় বাংলা। সেনেটের বিশালক্ষী মন্দির ও গুপ্তিপাড়ার শ্রীগৌরাঙ্গমন্দির জোড়বাংলা মন্দিরের সুন্দর নিদর্শন।

বাঁশবেড়িয়াতে রাণী শঙ্করী প্রতিষ্ঠিত তেরোচূড়াবিশিষ্ট রথমহল হংসেশ্বরী মন্দির (আলোকচিত্র ৪৩) বাংলাদেশে স্থাপত্যশিল্পে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই মন্দির পাথর ও ইট দিয়ে তৈরি। এই ধরনের মন্দির শুধু হুগলী জেলাতেই নয় সারা বাংলায় আর নেই বললেই চলে। এই মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৭০ ফুট। তন্ত্রের ষটচক্রের অনুকরণে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির প্রকাশ রূপে এই দেব মন্দির পরিকল্পিত ও নির্মিত। পাঁচতলাবিশিষ্ট এই মন্দিরটি মানবদেহ মধ্যস্থিত ইড়া, পিঙ্গলা, বজ্রাক্ষ, সুষুম্না ও চিত্রালী প্রভৃতি পাঁচটি নাড়ীর ইঙ্গিত বাহক। মন্দিরটির আটকোণে আটটি, মধ্যস্থলে চারটি এবং সর্বোচ্চ কেন্দ্রস্থলে একটি—মোট তেরোটি চূড়া আছে। মন্দিরের চূড়াগুলি পদ্মকোরকের ন্যায়। বিচিত্র গঠনভঙ্গিমায়, স্থাপত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্যে এই মন্দির বাংলার তথা ভারতের গৌরব। মন্দিরের ভিতরে পঞ্চমুণ্ডি বেদীর উপর

স্থাপিত পদ্মের উপর শায়িত শিবের নাভি থেকে উত্থিত দীর্ঘ মৃণালসহ ফুটন্ত পদ্মের উপর দেবী হংসেশ্বরী বাম পা ভাঁজ করে এবং ডান পা ঝুলিয়ে উপবিষ্টা। শিব ও বেদীর উপর সহস্রদল পদ্মটি শ্বেত পাথর দ্বারা নির্মিত। দেবীমূর্তি দারুময়ী। দেবীর চতুর্ভুজের মধ্যে ডানহাতে যথাক্রমে অভয় ও বরাভয় মুদ্রা ও বামহাতে যথাক্রমে অসি ও মুণ্ডমালা। এ ছাড়া, মন্দিরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। *List of Ancient Monuments in Bengal (1896 A.D.)* এই মন্দিরটির মোটামুটি একটা ধারণা দেয়। "This temple is situated in the district of Hooghly about a mile from the Trishvigha station, E. Rly (Present Adi-Saptagram Rly station) in the village of Bansberia. The image of the Goddess is made of black stone. She represents a form of Kali with her hair unbraided. The God Mahadeva is lying on a Trikonajantra and the Goddess Hanseswari is placed on the lotus that has sprung from the navel of the aforesaid deity. The temple is made of stone and has thirteen minarets. It possesses architectural beauty of high order and it may be considered as one of the finest Hindu temples of Bengal, if not of India. The temple was errected 88 or 90 years ago" (pages 46 – 48). কিন্তু এই বিবরণের মধ্যে কিছু ভুল ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, মন্দিরটি পুরোপুরি পাথরের নয়, ইট পাথরের সমন্বয়ে গঠিত। দ্বিতীয়তঃ, বিগ্রহ পাথরের নয়, নিমকাঠের এবং নীলরঙের। মন্দিরের দরজায় সংস্কৃত শ্লোক লক্ষ্য করা যায়।

" শাকাব্দে রস-বহ্নি-মৈত্রগনিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং
মোক্ষদ্বার চতুর্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী বিরাজিতং।"

ভূপালেন নৃসিংহদেব কৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্মমে ।।

বস্তুতঃ, নৃসিংহদেব মন্দিরটির নির্মাণকার্য্য আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়তলা নির্মাণকালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাঁর স্ত্রী শংকরী দেবী মন্দিরের অসম্পূর্ণ কাজ আরম্ভ করেন এবং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি সম্পূর্ণ করেন।

What did he do? He built a temple, still
It stands and I have seen it, but too ill
Would words of mine describe it. Inside, out
Silent on earth in pinnacled air ashout;
It doth reveal what to the initiate
Figures pure thought. So unto them a gate
Is opened to deliverance. I out side,
Alien but not unmoved untouched abide

"Religious Lyrics of Bengal"
—Thon Alexander Chapman

এই মন্দির সংলগ্ন অনন্ত বাসুদেব মন্দির আর এক অন্যতম প্রাচীন দর্শনীয় বস্তু। অবহেলায় আজ ম্লান, অনাদরে ভগ্নোন্মুখ কিন্তু অপূর্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত হয়ে আজও এই মন্দির আপন মহিমায় মণ্ডিত। সপ্তদশ শতকে বাংলার যে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির কালের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখনও বাংলার পোড়ামাটির ভাস্কর্য্যের বিশ্বজোড়া খ্যাতির সাক্ষ্য বহন করছে, বংশবাটির এই মন্দিরটি বোধ হয় তাদের অন্যতম। চালা মন্দিরের রীতিতে এই মন্দির তৈরী। ছোট ছোট খোদাই করা ইট, একের পর এক সাজিয়ে গড়ে উঠেছে মন্দিরের স্থাপত্যশিল্পের সৌন্দর্য্য। মন্দিরটির চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের চারদিকে প্রশস্ত অলিন্দ। চালের উপর একটি শিখর বহিঃপ্রাকার নির্মিত হয়েছে অপূর্ব সুষমা-মণ্ডিত পোড়ামাটির ইটে। প্রত্যেকটি ইটে রামায়ণ, মহাভারত ও

পুরাণোক্ত বিভিন্ন উপাখ্যানের ইতিহাস। মন্দিরের গায়ে একটি ফলকে নির্মাতা হিসাবে রামেশ্বর ভড়ের নাম পাওয়া যায় (১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)। এছাড়া দক্ষযজ্ঞ, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, দশমহাবিদ্যা, হরধনুভঙ্গ, জনকনন্দিনী সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, বিষ্ণুর দশাবতার ইত্যাদি বহু ঘটনার সমাবেশ, পরপর কয়েকটি ইটে চিত্রিত। মহিষাসুরমর্দ্দিনীতে দেবীর প্রশান্ত হাসি এবং নৃসিংহ অবতারে ছিন্নোদর হিরণ্যকশিপুর বেদনাক্লিষ্ট মুখের ভঙ্গিমা এমন নিখুঁতভাবে চিত্রিত যে অজানা শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করতে হয়। এই মন্দির ভাস্কর্য্যে মধ্যযুগীয় বাংলার সামরিক রীতিনীতি ও কলাকৌশলের মোটামুটি একটা চিত্র দেয়। এই মন্দিরের সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু হ'ল এক বিরাট নৌজাহাজের সমুদ্রযাত্রার চিত্র। জাহাজটি দ্বিতল—স্বশস্ত্র সৈন্যবাহিনী মোতায়েন—সিংহমুখী সেই জলযানের দাঁড় টানছে একজন নাবিক। বাঙালী যে আগে নৌশক্তিতে বলীয়ান ছিল এ কথার সমর্থন বহু পুঁথিতে পাওয়া যায়। সাগরপ্রিয় বাঙালীর এ দুর্ধর্ষ নৌবাচ সেদিন সমস্ত ভারতমহাসাগর তোলপাড় করত। কালিদাস "রঘুবংশে" রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সম্বন্ধে "নৌসাধনোদ্যত্তন" কথাটি প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং বাংলাদেশ যে সেদিন রঘুরাজের সঙ্গে নৌযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল একথা মনে করা অন্যায় নয়। অনন্ত-দেবের মন্দিরের এই ছোট ইটের ফলকটি বাংলার সেই অতীত গৌরবের একটুক্‌রো স্মৃতিচিহ্ন। এই ধরণের বিরাট মন্দিরের মধ্যে বল্লভপুরের বল্লভজীউর মন্দির, গুড়াপে ও চন্দননগরে নন্দদুলালের মন্দির, আঁটপুরে রাধাগোবিন্দজীউর মন্দির, খানাকুলে রাধাবল্লভজীউর মন্দির এবং গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রজীউর মন্দির উল্লেখযোগ্য। বোধ করি বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর বাদ দিলে এত ভাল পোড়ামাটির কাজ সারা বাংলাদেশে আর নেই। জাঙ্গিপাড়ার অন্তর্গত আঁটপুরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দির বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরটি একশো ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এবং দেওয়ালে পোড়ামাটির অষ্টাদশ পুরাণোক্ত সমুদয় দেবদেবীর মূর্ত্তি

এবং পুরাণানুযায়ী কারুকার্য্যমণ্ডিত চিত্রাবলী দেখলে প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য্যশিল্পের এক সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। ইটের কারুকার্য্যখচিত হুগলী জেলার মন্দিরগুলির মধ্যে এটি বৃহত্তম। মন্দিরের মধ্যে সিংহাসনের উপর রাধাকান্ত ও শ্রীরাধার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের প্রবেশপথের বামে ও দেওয়ালে রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, পুরাণ ও তৎকালীন জীবনযাত্রা থেকে আহৃত বহুচিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। ভীষ্মের শরশয্যা, রাধাকৃষ্ণের ভোজনদৃশ্য, রামরাবণের যুদ্ধ, রামলীলা, পুতনাবধ, রক্তবীজের সঙ্গে চণ্ডীর যুদ্ধ, ননীচোরা ও করালবদনা কালী। কালীমূর্ত্তির বৈশিষ্ট এই যে শিল্পী কঠোরভাবে দেবীমূর্ত্তি প্রকরণ অনুসরণ করলেও মাঝে মাঝে তাঁর নিজস্ব অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তাই করালবদনী কালীর ভীষণ মূর্তি হয়েছে স্নেহশীলা জননী। এছাড়া, প্রত্যেকটি প্যানেলে মূর্ত্তিগুলির প্রকাশ ভঙ্গিতে যে সজীবতা, সাবলীলগতি, হাত-পা-দেহ গড়নের অভিব্যক্তি পাহাড়পুর ও ময়নামতী ও সুদূর জাভাদ্বীপের দিয়েং উপত্যকার মৃৎশিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মন্দিরের উত্তরদিকের চিত্রগুলিতে আর্দ্রতা ধরে যাওয়ার জন্য নষ্ট হতে চলেছে। "The Radhagobinda temple in this village is the largest of the terracotta-decorated temples of Hooghly district. It is comperatively late 1780 sak, but the terracottas still show great liveliness. It is an 8 chala with a projecting poarch covered on all three sides with terracottas decorated. The five great battle scenes above the archways include splendid Chandi fighting Demon army. The mythological frieze near the ground level includes scenes from the Mahabharata as well as the usual Krishnalila" (District census handbook, 1961).

গোঘাট থানার অন্তর্গত বালিতে অসংখ্য প্রাচীন দেবমন্দির আছে। বালির মঙ্গলামন্দির উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। মন্দিরে কোন প্রস্তরফলক নেই, যার ফলে এর সঠিক কালনির্ণয় করা সম্ভব নয়। মন্দিরের গঠনশৈলী ও কলানৈপুণ্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের ত্রয়োদশরত্নের মধ্যে কয়েকটি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। মন্দিরের বিভিন্ন দেওয়ালে পোড়ামাটি শিল্পের প্রাচীন নিদর্শন বর্ত্তমান। প্রতিটি মূর্তি ও তার ভঙ্গিমা অপূর্ব শিল্প সুষমায় মণ্ডিত, কিন্তু এই মূর্তিগুলি নোনা লেগে ক্রমশঃই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দুর্গামন্দির জোড় বাংলার মন্দির, এর বিশেষত্ব এই যে মন্দিরের চূড়ায় একটি গম্বুজের উপর ন'টি রত্ন আছে। পোড়ামাটির শিল্পকলার দিক থেকে মন্দিরের গায়ে যে সব নিদর্শন আছে সেগুলি নানা ধরণের। কোনটি ইতিহাস বর্ণিত, আবার কোনটি সমসাময়িক সমাজের বিশেষ কোন বর্ণনা। শিল্প-নৈপুণ্যের দিক থেকে এই চিত্রগুলি অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। আঁটপুরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির হোল রাধাকৃষ্ণের মন্দির। এই ধরণের মন্দির শুধু হুগলী জেলাতেই নয় সারা পশ্চিমবাংলায় এর সংখ্যা অল্প—অনেকটা গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের মত। বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের গায়ে কোন ভাস্কর্য্য নেই কিন্তু আঁটপুরের এই মন্দিরের অসংখ্য প্যানেলে পোড়ামাটির অজস্র কারুকার্য্য—হাতী, হাঁস, ঘোড়ার সারি, যুদ্ধের বিভিন্ন দৃশ্য, বিদেশী বণিক। আবার কৃষ্ণের বাল্যলীলার আলেখ্যে পাশাখেলার দৃশ্য পাশাপাশি সুন্দর-ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে এর নির্মাণকাল। অতীতদিনের অর্থাৎ তিনশো বছর আগেকার গ্রামীণ জীবনযাত্রার চিত্র এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। রাজবলহাটে দামোদর ও রাধাকান্তজীউর মন্দির ভাস্কর্য্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। পোড়ামাটির কারুকার্য্যখচিত অসংখ্য দেবদেবীর চিত্র মন্দিরের গায়ে দেখা যায়। বর্তমানে সংস্কার করার ফলে অনেক জায়গার কারুকার্য্য

নষ্ট হলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুণে স্থাপত্যশিল্পে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই মন্দির প্রাঙ্গণে আরও অনেক দেবদেউল ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে।

শ্রীরামপুরে পুরানো রাধাবল্লভজীউর মন্দির গঙ্গার ধারে অবস্থিত যা পরে হেনরী মার্টনস্ প্যাগোডা বলে খ্যাত। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই আটচালা মন্দির নির্মিত হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে মন্দিরের সম্মুখস্থ বারান্দা ও চাতাল গঙ্গাগর্ভে পতিত হয়। তবে মন্দিরের থামের উপর পোড়ামাটির পদ্মফুলের অলংকরণ সামান্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। এই মন্দির সম্বন্ধে জর্জ স্মিথ বলেছেন, "...... The exquisite tracery of the moulded bricks may be seen but not the few figures that are left the popular Hindu Idols just where the two still perfect arches begin to spring."

গুপ্তিপাড়াতে বহু দেবায়তন আছে। তারমধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির প্রসিদ্ধ। এই মন্দির গুপ্তিপাড়ার মঠ বলে খ্যাত। শেওড়াফুলির রাজা হরিশচন্দ্র রায় কর্তৃক নির্মিত। দেবদেবীর মূর্তি, রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী এবং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁর জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটি দৃশ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। এই মন্দিরটি আটচালা এবং একটি বড় চালাঘরের উপর স্থাপিত একটি ছোট চালা ঘরের আকারে নির্মিত। মন্দিরটি আকারে বৃহত্তম হলেও বর্হিসজ্জা হিসাবে পোড়ামাটির ভাস্কর্য্য চোখে পড়ে না। পোড়ামাটির শিল্পকার্য্য না থাকলেও ভিতরের বারান্দা ও বিগ্রহ কক্ষের দেওয়ালে আঁকা সুন্দর সুন্দর চিত্রগুলি মন্দিরের গৌরব বৃদ্ধি করে। চিত্রাঙ্কনগুলি সমগ্র দেওয়ালব্যাপী ফ্রেস্কো ধরণের আর অন্যান্য চিত্র বর্গাকার প্যানেলে বিভক্ত। চিত্রগুলিতে শিল্পীগণ বিষয়বস্তু নির্বাচনে যে সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা না দেখলে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। মঠের আর দুইটি মন্দির কৃষ্ণচন্দের মন্দির ও চৈতন্যদেবের

মন্দির। চৈতন্যদেবের মন্দির আকবরের রাজত্বকালে বিশ্বেশ্বর রায় কর্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরের স্থাপত্য রীতি জোড় বাংলা ধরণের। এই মন্দিরের গায়ের কারুকার্য্য পরিচ্ছন্ন না হলেও প্রথম পোড়ামাটির চিত্র কেমন হোত তা বোঝা যায়। মন্দিরে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের বিগ্রহ আছে। গুপ্তিপাড়া মঠের চতুর্থ মন্দির হচ্ছে কৃষ্ণচন্দের মন্দির। গুপ্তিপাড়ার শ্রীরামচন্দ্রের শিখরবিশিষ্ট চারচালা মন্দির ছয় ফুট উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের সামনের ও দক্ষিণের দেওয়ালে এবং শিখরের সর্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির অলংকরণের যে বিপুল সমাবেশ করা হয়েছে হুগলী জেলার আর কোন মন্দিরে এরূপ দেখা যায় না। বাংলাদেশে ভদ্রেশ্বর ও গুপ্তিপাড়া ব্যতীত রামসীতার মন্দির আর কোথাও নেই, মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ হচ্ছেন—রাম, সীতা, লক্ষণ ও হনুমান। মূর্তিগুলি সমস্তই কাঠদ্বারা নির্মিত। এই মন্দিরের গায়ে আঁকা রাধাশ্যামের মূর্তি, গরুড়বাহন বিষ্ণু, রাবণের যুদ্ধযাত্রা, প্রভৃতির চিত্রকল্পে ও বৈচিত্র্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মন্দিরের প্রবেশপথের উপর তিনটি খিলানের উপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে যুক্ত শত শত গোপিনী মূর্ত্তি পোড়ামাটির অলংকরণের একটি সুন্দর নিদর্শন। দেওয়ালের উপর দিকে পরিচ্ছন্ন ও বিশিষ্ট ভাস্কর্য্যের দ্বারা রামায়ণের যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত আছে। নীচের দিকে লতাপাতা ও নকশা করা ফ্রেমের মধ্যে সাধারণ নরনারীর নানাভঙ্গির চিত্র দেখা যায়। এরূপ সূক্ষ্ম ও ছন্দময় কারুকার্য্য হুগলী জেলার কোন মন্দিরে নাই। তাই রামচন্দ্রের মন্দির পোড়ামাটির সজ্জার জন্য পশ্চিমবাংলার অন্যতম টেরাকোটা মন্দির বলে পরিগণিত।

ভদ্রেশ্বরের পাইকপাড়া অঞ্চলে রামসীতার নবরত্ন মন্দির আর একটি দর্শনীয় বস্তু। পোড়ামাটির শিল্প যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে এই মন্দির তারই নিদর্শন। এই মন্দিরের বিভিন্ন দেওয়ালে সমস্ত কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী অঙ্কিত আছে।

এছাড়া রামসীতার ইতিহাস বর্ণিত দৃশ্যগুলির অবতারণা এমন সুন্দর-ভাবে করা হয়েছে যা শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। মন্দিরের গায়ে অসংখ্য প্যানেলে এরূপ সহস্রাধিক চিত্র আঁকা ছিল কিন্তু তার প্রায় অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এই ব্যাপারে একটা কথা না বলে পারা যায় না যে সমস্ত পশ্চিম বাংলায় এই রাম-সীতার মন্দির অন্যতম।

শিবমন্দিরের সংখ্যাই হুগলী জেলায় সর্বাধিক। তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের মন্দির সর্বজনবিদিত। কিন্তু একসঙ্গে দ্বাদশ শিব-মন্দির ঠিক দক্ষিণেশ্বরের অনুরূপ হুগলী জেলার একাধিক স্থানে আছে। যেমন, বক্‌সা, কোন্নগর, গোপীনগর, মাকালপুর ও বেলমুড়ি। এছাড়া সিঙ্গুরের সপ্তর্ষিমন্দির, ভগবতীপুরের পঞ্চশিব মন্দির, সোমাপুর, খানাকুল, জনাই, রাজবল্লভহাট, পানসেওনা, হরিপাল, জয়নগর, পুঁইনান, শ্যামপুর, বেড়াবেরী, ভাণ্ডারহাটি, চন্দননগর প্রভৃতি জায়গায় জোড়া বা ত্রয়ী শিবমন্দির দেখা যায়। বক্‌সার দ্বাদশ শিবমন্দির —প্রত্যেকটি ৬০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ভবানী চরণ মিত্র কর্তৃক ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। বক্‌সা গ্রামের রঘুনাথের নবরত্ন মন্দির হুগলীর একটি দর্শনীয় বস্তু, কিন্তু মন্দিরের কারুকার্য্য খচিত ইটের চিত্রগুলি সম্প্রতি সংস্কারের সময় একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। চন্দননগরে দশভুজা মন্দিরও দর্শনযোগ্য। ১৮৩৬ সালে শর্মাবংশ একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বিপর্য্যয়ে মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই মন্দিরের গায়ে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকা ছিল।

পাণ্ডুয়া ঐতিহাসিক স্থান এবং ঐতিহাসিক গৌরবের দিক থেকে সপ্তগ্রামের পরেই পাণ্ডুয়ার স্থান নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। হিন্দু রাজার রাজধানী হলেও পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকগণ কর্ত্তৃক এই অঞ্চল শাসিত হয়েছিল বলে হিন্দুদের কোন মন্দিরের নিদর্শন সচরাচর চোখে পড়ে না। কেননা হিন্দুদের অধিকাংশ মন্দিরই মসজিদে পরিণত হয়েছিল। পাণ্ডুয়া থানার বেড়াগড়ী গ্রামের আটচালা

গোপালজীউর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরে কোন দৃশ্যাবলী অঙ্কিত নেই, তবে নর্তকী, সৈনিক, বাদ্যকর, জমিদারের দরবার, অশ্বা-রোহণ, হাতি, উট, প্রভৃতির চিত্রগুলি সুডৌল মণ্ডপে, গড়নে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মসৃণতার সৌন্দর্য্য দর্শককে মুগ্ধ করে। এই গ্রামে শিবের পঞ্চরত্ন জোড়া মন্দির ছাড়া ছোট বড় পোড়ামাটির অলংকার দেখা যায়।

পোলবা থানার মধ্যে কৃষ্ণপুর গ্রামের আটচালা মন্দির ১৬৮৩ শতকে নির্মিত হয়। মন্দিরে কোন দেবদেবীর বিগ্রহ না থাকলেও মন্দিরের স্থাপত্যরীতি ও দেওয়ালের ভাস্কর্য্যশিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হুগলী জেলার সমস্ত মন্দিরের মধ্যে এটাই একমাত্র মন্দির যা আজও খুব ভালভাবে সংরক্ষিত আছে কেননা অন্যান্য মন্দিরের মত অনাদরে ও হতাদরে পড়ে নেই। বাংলার নিজস্ব ঢঙে কেবল মাটি ও জলের সাহায্যে যে অজ্ঞাত মৃত শিল্পীকুল অসাধারণ ধৈর্য্যের দ্বারা এই শিল্পসম্ভার সৃষ্টি করেছিলেন তাদের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। রামরাবণের যুদ্ধের দৃশ্যাবলী ছাড়াও ইউরোপীয় জাহাজ, সৈন্যদলের মার্চ, শোভাযাত্রা, বাজীকর, লম্ফনকারী অশ্ব প্রভৃতির চিত্রাবলী হুগলী জেলার তৎকালীন জীবনযাত্রার অশংমাত্র।

মহানাদ বাংলার বৌদ্ধযুগে খ্যাতি লাভ করে। তারপর বৌদ্ধ সভ্যতার অবসানে এই অঞ্চলে মহানাদকে কেন্দ্র করে হিন্দু ধর্মাচারের প্রবর্ত্তন হয়েছিল। তাই ধর্মরাজের প্রতিষ্ঠা খ্যাত নাথ পন্থীদের শিবমন্দিরের পাশে সনাতনীদের পাষাণময়ী শক্তি প্রতিমার অধিষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। মহানাদের হিন্দু প্রাধান্যের এটাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই নিদর্শনও বাংলার মুসলমান আগমণের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত। মহানাদের এই প্রস্তরমূর্ত্তি সাক্ষ্যের দ্বারাই এটাই প্রতিপন্ন হয় যে যখন বাংলায় মুসলমানদের আগমন হয়নি তখন এই স্থান হিন্দুদের পূজা অর্চনায় পবিত্র, জ্ঞান, গৌরবে, সম্পদে খ্যাত হয়ে উঠেছিল। মহানাদ চিরকালই রাজধানী বলে খ্যাত। এখানে সিংহবংশীয়

রাজারা কলিযুগের প্রথম থেকে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করে গেছেন। সুপ্রসিদ্ধ রাজা চন্দ্রকেতু সিংহ মহানাদের রাজধানী স্থাপয়িতা এবং তার কীর্ত্তিকলাপেই মহানাদ প্রসিদ্ধ হয়েছে। রাজা চন্দ্রকেতুর বংশধর কোন কোন সময়ে অন্যান্য স্থানে রাজধানী স্থাপন করলেও তারা মহানাদের রাজা বলেই বিদিত হোতেন। অনেকে বলেন, যেস্থানে মহানাদ অবস্থিত কলিযুগের প্রথমে বা দ্বাপরের শেষভাগে ঐ স্থানে সিংহপুর নামে এক রাজ্য ছিল। সিংহরাজাদের পর এক সুবর্ণ-বণিকজাতীয় রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কলিকাতার পোস্তার রাজা নরসিংহ দত্তের পূর্বপুরুষ। মহানাদ পূর্বে বর্ধমান জেলাভুক্ত ছিল, পরে হুগলী হয়েছে। মহানাদের উত্তরাংশ পাণ্ডুয়া থানা ও দক্ষিণাংশ পোলবা থানার অধীন। মহানাদ অতি প্রাচীনকাল থেকেই আর্য্যা-বাসে পরিণত হয়েছিল এবং আর্য্যগণ অর্ণবপোতে আরোহণ পূর্বক উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র অতিক্রম করে নানা দেশে আর্য্য সভ্যতা বিস্তার করেন। অনেকে অনুমান করেন, রাজা শশাঙ্ক এই সিংহ বংশেরই সামন্ত ছিলেন। বুদ্ধদেবের প্রায় ১২০০ বছর পরে শংকরাচার্য্য জন্মগ্রহণ করে বৌদ্ধমত খণ্ডনপূর্বক ভারতে হিন্দুমত স্থাপন করেন। যখন সমস্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবল বন্যা সেদিনও মহানাদ বৈদিকমন্ত্র জপ করে আর্য্য ধর্ম জাগিয়ে রেখে ছিল। মহারাজ চন্দ্রকেতু চারিদিকে দুই মাইল বিস্তৃত গড় খনন করে রাজত্ব করতেন। এখন অনেক স্থান বিধ্বস্ত হলেও গড়পাড়ার সুবিস্তৃত গড় আজও বর্তমান আছে। তাই ঐ স্থানের নাম হয় গড়পাড়া। গড়পাড়া বর্তমানে ঘন অরণ্যে আচ্ছাদিত। বাঁশবেড়িয়ার মত মহানাদেও গঙ্গাসংলগ্ন একটি জীয়তকুণ্ড আছে। পূর্বে কুণ্ডের চারিদিকে অতি উচ্চ প্রাচীর ছিল এবং দ্বারদেশে প্রহরী রক্ষিত থাকত। সেই প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ আজও দেখা যায়। এই কুণ্ডে স্নান করালে নিহত ব্যক্তি প্রাণ ফিরে পেত এবং রুগ্ন ও আহত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করত। কিন্তু কালক্রমে কুণ্ডটি মৃত্তিকা স্তরে ভরাট হয়ে যায়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে

যোগীরাজা জীয়তকুণ্ড পরিষ্কার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নি। রাজা চন্দ্রকেতু নাটবাংলাবিশিষ্ট চারিদিকে প্রদক্ষিণের উপর ছাদ এবং মধ্যস্থলে অতি উচ্চ এক চূড়াবিশিষ্ট দক্ষিণদ্বারী জটেশ্বর মহাদেবের সুরম্য মন্দির নির্মাণ করেন। প্রবেশ-দ্বারের বামদিকে একটি বেদী মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ লৌহদণ্ড প্রোথিত আছে। এর উত্তরে নীমগাছের উপর খিলান নির্মিত, তারমধ্যে বটুক ভৈরব মূর্ত্তি বিরাজিত। বেদীর উপর দক্ষিণ পাশে প্রায় আট ফুট সুন্দর অগ্রভাগ ভগ্ন অবস্থায় এক মকরের মস্তক দেখা যায়। তার পাশেই দুই ধারে একপদ ভৈরবমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। ভৈরবনাথের উত্তরে আরও একটা বেদীর উপর খিলান, তার মধ্যে হরগৌরী মূর্ত্তি। এই স্থানে আর একটি মূর্ত্তির পাদদেশ থেকে কোটিদেশ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। এবং আরও দুইটি ভঙ্গ প্রস্তর রক্ষিত আছে। তারমধ্যে একটি শিবের গৌরীপট্টের কিয়দংশ মহানাদের এক চূড়াবিশিষ্ট লালজীউর মন্দির উল্লেখযোগ্য। এরূপ মনুমেন্টের মত উচ্চ মন্দির হুগলী জেলাতে আর নেই।

একদিন মহানাদের উপর দিয়ে আর্য্য, অনার্য্য, শক, হুণ, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতি তাদের বিজয় ধ্বজা উড়িয়ে গেছে। এরই উপর অনাদি-কাল থেকে কত লক্ষ লক্ষ বৈদেশিক তাদের অতৃপ্ত রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এর প্রতি ইষ্টক খণ্ডে অতীত যুগের হাজার হাজার মানুষের বুকের রক্তরেখা আছে। মহানাদ ন'চূড়া-বিশিষ্ট ব্রহ্মময়ী দেবীর বিরাট মন্দির (আলোক চিত্র—৪৪) ১৮৩৪ সালে নির্মিত হয়। মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মময়ী কালীকা দেবী ও চার-কোণে চারটি শিবলিঙ্গ ও তিনতলা সুবৃহৎ হংসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। বহু শিখরযুক্ত রত্নমন্দির প্রধানতঃ পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন এই দুইভাবে বিভক্ত। বর্গাকার নক্সার ভিত্তিতে নির্মিত এই ধরণের মন্দিরের কার্ণিস বর্গাকৃতি হয়। নবরত্ন মন্দির দ্বিতল হয়। একতলার চারটি কোণের শিখর ও দোতলার মূল শিখরকে ঘিরে ধরে

আছে ছোট ছোট শিখর। মন্দিরটি সুউচ্চ হওয়ার জন্য বহুদূর থেকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এহেন কারুকার্য্যখচিত মন্দির এদেশে বিরল। কিন্তু ১৩০৩ সনের ভূমিকম্পে মন্দিরটির তিনটি চূড়া ভেঙ্গে পড়ে। মুসলমানদের মধ্যে কাজিমল ফকিরের সমাধিস্তম্ভ উল্লেখ-যোগ্য।

খানাকুলে কানাদারকেশ্বর নদীর তীরে শ্মশানে নির্মিত প্রসিদ্ধ ঘণ্টেশ্বর শিবের মন্দির উল্লেখযোগ্য। শ্মশানে এরূপ সুদৃশ্য মন্দির হুগলীর আর কোথাও দেখা যায় না। তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত বালিগড়ি, জয়নগর ও শ্যামপুর গ্রামের অবহেলিত প্রাচীন মন্দির-গুলিও ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। বালিগড়ি গ্রামের আটচালা শীতলামন্দিরের উপরিভাগের ইতিহাস লুপ্ত হতে চলেছে। এই মন্দিরের খিলানের উপর যুদ্ধের চিত্রাবলী আঁকা আছে। এই মন্দিরগুলির প্রকাশভঙ্গিমা বৈচিত্র্য। জয়নগর গ্রামের দু'টি আটচালা শিবমন্দিরও পোড়ামাটির অলংকরণের জন্য উল্লেখযোগ্য। জয়নগরের এক মাইল দূরে শ্যামপুরে এখনও অনেকগুলি মন্দির আছে। এদের মধ্যে দু'টি শিবমন্দির অলংকরণের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের দু'টি খিলানের উপর প্যানেলগুলিতে যে সব চিত্র আঁকা ছিল, সেগুলি চুরি হয়ে গেছে। এতে লৌকিক জীবনেরও একটা চিত্র পাওয়া যেত। এই মন্দিরগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

কাঁকুড়াকুলীর সীতারাম ও লক্ষ্মীজনার্দ্দনের নবরত্ন মন্দির ও বোহাগড়ি, সোমড়ার পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দিরদ্বয় স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থানের দাবী রাখে। মন্দিরের গৃহ চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্রবিশিষ্ট। এই গৃহের চাল ক্রমহ্রস্বমান আকৃতিতে ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠেছে। দিকসুই, বাকসা, খামারপাড়া, ক্ষীরকুণ্ড ও গোপীনগর গ্রামে নবরত্ন মন্দির এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সোমড়া ও ইলছোবা-মণ্ডলাই গ্রামের আটকোণাকৃতি আটচালা ও

ষোলচালা মন্দির হুগলীতে আর কোথাও দেখা যায় না। দেওয়ান রামশংকর রায় সোমড়ার শতাধিক মন্দির স্থাপন করেছিলেন। তারমধ্যে নবরত্ন ও পঞ্চরত্ন মন্দিরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। নবরত্ন মন্দিরে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি আছে এবং ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের ছাদ পিরামিডের ন্যায় দেখা যায়। এরূপ মন্দির স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এখানকার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দির আটচালার মন্দির। মন্দিরের বাইরে থেকে সমগ্র মন্দিরের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না।

সুখড়িয়া গ্রামে আনন্দময়ীর মন্দির (আলোক চিত্র-৪৫) বাংলা দেশের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ মন্দির। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। মন্দিরটি উচ্চতায় সত্তর ফুট আট ইঞ্চি এবং পঁচিশটি চূড়াবিশিষ্ট। মন্দিরের গায়ে টালির উপর নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের মধ্যে বেদীর উপর শায়িত শিবের বক্ষোপরি উপবিষ্টা আনন্দময়ী কালী—উচ্চতা প্রায় তিনফুট। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দিরের সর্বোচ্চ পাঁচটি চূড়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীপুরের গোবিন্দজীউর একচূড়া বিশিষ্ট মন্দির ও তার সামনে দুর্গা দালানের মত প্রশস্ত চাতাল একটি দর্শনীয় বস্তু।

বৈঁচিগ্রামে ছোট বড় ১৬টি প্রাচীন মন্দির আছে। সমস্ত মন্দির-গুলিতে পোড়ামাটির কারুকার্য্য উল্লেখযোগ্য। এখানে (বাংলাদেশে) সাধারণতঃ রেখ-দেউল অর্থাৎ উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ মন্দির গুলিতে প্রতিষ্ঠা ফলক না থাকার জন্য ঠিক কোন সময়ে এগুলির নির্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়েছিল তা বলা শক্ত। তবে দু'টি মন্দিরের অনুকরণে সপ্তরথ ও সপ্তাঙ্গের পরিকল্পনায় বাঙ্গালী শিল্পীদের দ্বারা রচিত মন্দিরটির সম্মুখ ভাগ নজরে পড়ে। কয়েকটি মন্দিরের ইটে কারুকার্য্য অল্প। কিন্তু অধিকাংশ মন্দিরের অলংকরণ হচ্ছে বর্গাকার প্যানেলের মধ্যে ফুলের চিত্র। দু'জন গোপীদের

মধ্যে কৃষ্ণের চিত্র অপূর্ব বলা যায়। বৈদ্যপুরের পোড়ামাটির (আলোক চিত্র—৪৬) শিল্পচাতুর্য্যের অভূতপূর্ব নিদর্শনগুলি আজ বিলুপ্তপ্রায়।

চণ্ডীতলা থানার ভগবতীপুর গ্রামে অবস্থিত পাঁচটি শিবমন্দির একসময় পোড়ামাটি অলংকরণের জন্য খ্যাত থাকলেও মধ্যের মালাই-চাঁদ মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই মন্দিরের প্রবেশপথের দুই ধারে দুইজন ভক্তের দুই হাত উচ্চ চিত্র একটি দর্শনীয় বস্তু। এরূপ মৃৎফলক একমাত্র চাঁদবাটি ছাড়া আর কোন মন্দিরে দেখা যায় না। মূর্ত্তিগুলির প্রকাশভঙ্গিতে যে সজীবতা, সাবলীল গতি, দেহ, হাত, পায়ের গড়ন ও ডোল প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। তাছাড়া, একটি নারীর জন্য দু'জন সৈনিকের মধ্যে যুদ্ধ, মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের নারী, গ্রাম্যপথে নরনারী প্রভৃতির দৃশ্যাবলী আর বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর চিত্ররূপ মন্দিরগুলিতে অঙ্কিত। দু'টি মন্দির ভগ্নাবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেকটি মন্দির আটচালা, সাদাসিধা স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী নির্মিত হলেও প্রত্যেকটি মন্দিরের দেওয়ালের ভাস্কর্য্যশিল্প দর্শনযোগ্য।

শিয়াখালা বা শিবাক্ষেত্রে উত্তরবাহিনী দেবীর মন্দির এই জেলায় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলের বহু শতাব্দীর প্রাচীন লৌকিক দেবী। পাষাণ মূর্ত্তি প্রায় সাতফুট লম্বা, সুশ্রী। দ্বিভুজা—ডানে খড়্গ ও বামে রুধির পাত্র (পূর্বে মড়ার মাথার খুলি)। গায়ের রং হলদে। জোড়হাতে উপবিষ্ট বটুক ভৈরবের মাথায় দেবীর বাম পা এবং ডান পা শায়িত মহাকালরূপী শিবের বক্ষে স্থাপিত। শিবের নাভিদেশে অসুরের মুণ্ড। প্রাচীন মন্দিরগুলি মাটির এবং মূর্ত্তি স্বর্ণ-মণ্ডিত। প্রাচীন মন্দির ভেঙে বর্তমান মন্দিরটি তৈরী হয় ১৩৪০ সালে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বলেছেন,

"বর্দ্ধমানে বন্দি গাবো সর্ব্বমঙ্গলা।
উত্তরবাহিনী বন্দো গ্রাম শিয়াখালা।"

দেবীর মন্দিরটি চূড়াহীন। মেঝে শ্বেত পাথরের। চত্বরের মধ্যে নাটমন্দির আছে।

হরিপাল থানার দ্বারহাটা গ্রামের দ্বারিকাচণ্ডী ও রাজেশ্বরের আটচালা মন্দির দুটি পোড়ামাটির অলংকরণের জন্য বিখ্যাত। দ্বারিকা-চণ্ডীর মন্দির ১৬৮৬ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বারিকাচণ্ডী দ্বিভূজা দুর্গামূর্ত্তি। কিংবদন্তী, স্থানীয় একটি পুকুর থেকে সিংহরায় বংশের একব্যক্তি স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে দেবীকে উত্তোলন করেন। মন্দিরের গায়ে ইটের অপূর্ব কারুকার্য্য একটি দর্শনীয় বস্তু। রাধাকৃষ্ণের অসংখ্য চিত্র দ্বারা এই মন্দির সুশোভিত ছিল। এই চিত্র থেকে সেকালের বাঙালী শিল্পীরা কিরূপ দক্ষ ছিল তা অনুমান করা যায়।

রাজরাজেশ্বরের মন্দিরে টেরাকোটা চিত্র মন্দিরের থামে খিলানে ও প্রবেশ পথে আঁকা আছে। চিত্রগুলির মধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং নৌকাবিলাস প্রভৃতি সূক্ষ্ম অলংকরণের জন্য প্রশংসার দাবী রাখে। মন্দিরের সামনের দু'টি থামের একটি দুর্গা, মহাবীর, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ও অন্যটিতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও পর্তুগীজ সৈন্যদের চিত্র স্বাভাবিক গতি ময়তার জন্য শিল্প রসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হুগলী জেলার লোকায়ত সমাজ-জীবনের আলেখ্য এইসব পোড়ামাটির ফলকগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। দ্বারহাটার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে চাঁদবাটীতে অবস্থিত বিলুপ্ত প্রায় শিবমন্দির শিল্পচাতুর্য্যের জন্য বিখ্যাত। ভগবতীপুরে মালাইচাঁদের মন্দিরের মত এখানেও মন্দিরের প্রবেশপথের দুইদিকে দুজন ভক্ত দাঁড়িয়ে আছে। মূর্ত্তিগুলির উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট। একজন ভক্ত করজোড়ে আর একজন কি যেন শুনছেন এরূপভাবে দণ্ডায়মান। মন্দিরটি আকারে ছোট হলেও কারুকার্য্য ও অন্যান্য গঠন সৌন্দর্য্যের দিক থেকে মোটেই ন্যূন নয়। মন্দিরের খিলানের উপর দেবদেবীর চিত্র ও দুইপাশে ফুল, লতাপাতা ও অসংখ্য নক্সা আছে। দীর্ঘ-দিনের উপেক্ষা আর অযত্নের ফলে মন্দিরের অবস্থা প্রায় শেষ হয়ে আসলেও এর শিল্পকলা ও শিল্পচাতুর্য্য যে এখনও দর্শকগণকে মুগ্ধ করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গুড়াপের নন্দদুলাল জীউর মন্দির (আটচালা) বর্ধমান মহারাজার অধীক্ষক রামদেব নাগ কর্তৃক

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের উপর বর্গাকার প্যানেলে ফুলের চিত্র এবং থামের উপর দেবদেবীর ও জীবজন্তুর অসংখ্য চিত্র অলংকরণ করা হয়েছিল। একটি স্তম্ভের প্যানেলে দেবী দুর্গা ও তার দুপাশে অন্যান্য প্যানেলে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণেশ দণ্ডায়মান। শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে এই সমস্ত দৃশ্যগুলি বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

খানাকুল-কৃষ্ণনগরের রাধাবল্লভ জীউর আটচালা মন্দির স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। বাঁশবেড়িয়া অনন্তদেবের মন্দিরের চেয়ে লম্বায় দেড়গুণ এবং এরূপ সুবৃহৎ ও মনোরম আটচালা মন্দির হুগলীতে আর নেই। এই মন্দিরের চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্রবিশিষ্ট এক গর্ভগৃহের উপর আর একটি চারচালা ছোট মন্দির ক্রমহ্রাসমান আকৃতিতে উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে উঠেছে। মন্দিরের সামনে অংগসজ্জা হিসাবে বর্গাকার প্যানেলে ছয় সারিতে পোড়ামাটির শিল্পকার্য্য আছে। উপরের প্রথম সারিতে বাইশটি; তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারিতে দুই ধারে ছয়টি করে বারোটি এবং চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ সারিতে দুই ধারে পাঁচটি করে দশটি প্যানেল। অধিকাংশ প্যানেলে ফুলের চিত্র আঁকা আছে। মধ্যস্থলে প্রবেশ-পথের উপর তিনটি খিলানে এবং মধ্যের স্তম্ভগুলিতে বহু কারুকার্য্য সুষম শিল্প বোধের পরিচয় দান করে। উপরের চারচালার মন্দিরের গায়ে চতুর্দিকে পোড়ামাটির অলংকরণ আছে।

দিকসুই গ্রামে নবরত্ন মন্দির ১১৯৯ সালে নির্মিত হয়। এর সামনের দুটি ছাদ পড়ে গেছে। নয়টি চূড়াবিশিষ্ট এরূপ বিরাট মন্দির বক্সা ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় না। যে দুটি স্থান পড়ে গেছে তার মধ্যে ইটের কারুকার্য্যখচিত দু'টি স্তম্ভ। মন্দিরের একখানি পাথরে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত আছে—

শ্রীকৃষ্ণ শকাব্দ ১৭১৪

বৈদিক সপ্তেক কামতে শকাব্দে

শ্রীরাধায়ায়দ বরাময়কস্থ
রাসায় রম্য নবরত্ন কুঞ্জ
শ্রীরাধা কাপ্তে কৃত বিভাতি
সন ১১৯৯ সাল।

এই পাথরের আর এক স্থানে "নারায়ণ মিস্ত্রী" এই নামটি খোদিত আছে। তার দ্বারা মনে হয় এই মিস্ত্রী দ্বারা মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। নিত্যানন্দপুরে কুন্তীনদীর তীরে ঈশানেশ্বর ও ত্রম্বকেশ্বর নামে জোড়া শিবমন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। মন্দিরের গায়ে প্রস্তর থেকে এর নির্মাণের তারিখ ১৭০৫ শকাব্দ বলে জানা যায়। মন্দিরের পোড়ামাটির সুন্দর কারুকার্য্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের কারুকার্য্যের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোগল এই তিন রকমের শিল্পবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পদ্ম, চক্র প্রভৃতি হিন্দুযুগের, মোগল আমলের আর্কার ও কল্কা আর বৌদ্ধ যুগের বুদ্ধমূর্ত্তির অনুকরণে ধ্যানস্থ পদ্মনাভ মূর্ত্তি এর গায়ে খোদিত আছে। কালের নির্মমতা বাদে এই সমস্ত পোড়ামাটির শিল্প সমন্বিত ইটগুলি এতটুকু ম্লান হয়নি।

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলির মত হুগলী জেলাও মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। তারা এই জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি করেছিল আর সেখানকার হিন্দু ঐতিহ্য আর ঐশ্বর্য্যের বিলুপ্তি ঘটেছিল। তারা অনেক স্থানে হিন্দু মন্দিরের উপর মসজিদ স্থাপন করেছিল। খুবই কম শাসনকর্তা হিন্দুদের এবং হিন্দু ধর্মকে সহ্য বা মেনে নিতে পেরেছিল। ত্রিবেণীতে অবস্থিত সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা সফর খাঁ কর্ত্তৃক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত প্রাচীন মসজিদগুলির মধ্যে একটি যদিও দর্শনীয় এবং পাঁচটি গম্বুজবিশিষ্ট তবুও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন।

চুঁচুড়ায় প্রাচীন অট্টালিকার মধ্যে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত আর-মেনিয়ন গীর্জা। পশ্চিম বাংলার এটি দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ গীর্জা।

"Chinsurah Church—Dutch now English Church. This Church was errected in A.D. 1763 by G. Vernet, then attached Governor entirely out of his own means. The steeple had been previously constructed by Mr. Schitterman in 1744 who was Governor at that time. Hung around the inside of the Church are the portraits of some of the Dutch Governors and their wives". (List of ancient monuments of Bengal)

১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ তাদের উপাসনার জন্য ব্যাণ্ডেলে যে গীর্জাটি নির্মাণ করেন তা আজ Bandel Church নামে জনপ্রসিদ্ধ। এটি বাংলার আদি উপাসনা মন্দির (Imperial Gazetteer of India—Hunter)। এর পাঁচিলের গায়ে অসংখ্য চিত্র আঁকা আছে। একাধিকবার যুদ্ধ-বিগ্রহে এই চার্চটি বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য অনেক ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়েছে। ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল আক্রমণে ব্যাণ্ডেল দুর্গ ও চার্চ ভষ্মীভূত হলেও সম্রাট জাহাঙ্গীর এর পুনর্নির্মাণের আদেশ দেন। 'This church was founded in 1588 A.D. and the oldest Christian church in Bengal. The church was burnt during the seize of Hooghly but the keystone with the year 1588 inscribed on it remained intact. This keystone was used when the church was rebuilt in A.D. 1661 by a Portugese gentleman named Gomes De Soto, who lies buried within the pricincts of the church along with other relations. When Hooghly was taken, the Mahamadans destroyed the images and books of the church. The Emperor of Delhi subsequently made

a grant of 771 bighas of land, rent free, to the church. In November of each year there is a celebation at this church on the occasion of Novena to which the Roman Catholics largely resort from Calcutta". (List of ancient monuments in Bengal)

হাজি মহম্মদ মহসীন যে জমি দান করেছেন তার উপর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনলক্ষ টাকা ব্যয়ে যে বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ হয় তা আজ ইমামবাড়া—ভারতের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। ইমামবাড়ার সামনে যে ঘড়ি দেখা যায় তা বিদেশ থেকে আনীত হয়েছিল। অট্টালিকার দ্বিতলে এবং দেওয়ালের গায়ে কোরাণের বাণী লাল ও সবুজ পাটে লিপিবদ্ধ আছে।

মোগলরা যখন বাংলাদেশে এসে পাঠানদের আক্রমণ ক'রে দেশ থেকে বিতাড়িত করে তখন দায়ূদ খাঁ বেলমুড়ির অন্তর্গত রুদ্রানীতে আশ্রয় নেন এবং তাঁর অর্থে এখানে মদনমোহন জীউর মন্দির স্থাপিত হয় এবং বৃন্দাবন থেকে এই মদনমোহনের মূর্ত্তি আনীত হয়।

বহু প্রাচীনকাল থেকে হুগলী জেলায় যে শিল্পচর্চার অস্তিত্ব ছিল তার অনেক রকম প্রমাণ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বাংলাদেশের বহু মন্দির, চৈত্য ও সঙ্ঘারামের উল্লেখ করেছেন। হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে প্রাচীন মূর্ত্তিকলার যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকেই এই অঞ্চল যে সুদূর অতীতে শিল্পগৌরবে সুসমৃদ্ধ ছিল তা প্রমাণ হয়। হুগলী জেলার সর্বত্র প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় কতশত মূর্ত্তি আত্মগোপন করে আছে তার প্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু অসুবিধা হ'ল এই যে মূর্ত্তিগুলিতে সন বা তারিখ উৎকীর্ণ না থাকার জন্য কাল নির্ণয় করা সম্ভব :হয় নি, তবে তার গঠন ভঙ্গিমার রীতি বিচারে মোটামুটি তাদের সময়কাল নিরূপণ করা যায়। আর একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পালপূর্ব যুগের মূর্ত্তির কোন অস্তিত্ব নেই।

সপ্তম শতাব্দীতে মহানাদে প্রাপ্ত একপাদ ভৈরব, দ্বারবাসিনীতে বিষ্ণুমূর্ত্তি, নবম শতাব্দীতে নরীগ্রামে সূর্য্য মূর্ত্তি, ভাণ্ডারহাটিতে দশম শতাব্দীর বুদ্ধমূর্ত্তি শিল্পজগতে স্বকীয় প্রতিভায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ভাণ্ডারহাটির বোধিসত্ব লোকেশ্বর মূর্ত্তির মাথায় জটা, দেহ অলংকারপূর্ণ। বাম হাতে পদ্ম ও ডান হাতে বরদান মুদ্রায় মুদ্রিত। বাঁকাভাবে দাঁড়ানো এই মূর্ত্তিটি অত্যন্ত লালিত্যপূর্ণ। পিছনে বৃক্ষের দৃশ্য, এক বামন মূলদেশ বেষ্টন করে আছে। উপরে হাতী, ঘোড়ার চিত্র অঙ্কিত। আর দুটি অপ্রাচীন মূর্ত্তির চিত্রও লক্ষ্য করা যায়। একাদশ শতাব্দীতে সোমড়া গ্রাম থেকে প্রাপ্ত দুটি বিষ্ণু-মূর্ত্তি গঠন সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। মূর্ত্তি দুটি ভগ্ন হলেও তাদের কমনীয়তা উপেক্ষনীয় নয়। এই শতাব্দীতে ভদ্রকালী থেকে প্রাপ্ত সূর্য্য ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে হুগলীতে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি, ষোড়শ শতাব্দীতে কামারপুকুরে গজসিংহ মূর্ত্তি, ভদ্র-কালীতে ধর্মঠাকুর, সপ্তদশ শতাব্দীতে জগৎবল্লভপুরে মহিষমর্দ্দিনী, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ত্রিবেণীতে রাম-সীতার মূর্ত্তি গঠনভঙ্গিমায় অতুলনীয়। কিছুদিন পূর্বে ব্যাণ্ডেলে প্রাপ্ত সূর্য্য মূর্ত্তিটি অপূর্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত। চারফুট উচ্চতাবিশিষ্ট মূর্ত্তিটি কষ্টিপাথরের। সপ্ত অশ্বচালিত রথে অরুণ সারথি, পায়ের নীচে ঊষা। মাথায় মুকুট, হাতে কবচকুণ্ডল ও অলংকার, গায়ে উপবীত। মূর্ত্তির দু'পাশে ছায়া ও সঙ্গা—তাঁর দুই স্ত্রী, এক অজ্ঞাত পরিচয় দেবমূর্ত্তি এবং ধনুকধারী কিরাত মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটির উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা বুট জুতা; তাতে মনে হয় মূর্ত্তিশিল্পে কুষাণ বা শক পদ্ধতির প্রভাব প্রবল। সেন আমলে কয়েকটি বিষ্ণুমূর্ত্তি পাণ্ডুয়া থেকে উদ্ধার করা হয়। পাণ্ডুয়াতে প্রাপ্ত একটি ভগ্ন বিষ্ণুমুর্ত্তি পালযুগের অপূর্ব নিদর্শন।

কলিকাতা

কলিকাতার ইতিহাস সুপ্রাচীন নয়। আনুমাণিক ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাকে একটা স্বতন্ত্র জেলার মর্য্যাদা দেওয়া হয় যদিও ভৌগলিক হিসাবে এই শহরের অনেকাংশ চব্বিশপরগনার মধ্যে। চাঁদসওদাগরের সময় ভাগরথী তীরবর্ত্তী অঞ্চলে কলিকাতার নাম শোনা যায়। তখন কলিকাতা সুন্দরবন এলাকার অন্তর্গত, কিন্তু কালক্রমে কলিকাতা একদিন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর ও বন্দর হয়ে গড়ে উঠল। সে ইতিহাস সত্যসত্যই বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ। লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতা শহরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য অষ্টাদশ শতকের শেষে প্রতিষ্ঠা করলেন "ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট কমিটি"। এই কমিটি উন্নতি সাধনে অকৃতকার্য্য হলে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হোল লটারি কমিটি। প্রথমে এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল সেণ্ট জর্জ গীর্জা নির্মাণের জন্য টাকা সংগ্রহ করা। কালক্রমে এই লটারির টাকায় শুরু হোল কলিকাতা উন্নয়নের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা। শহরবাসীর জলকষ্ট মোচনের জন্য ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কাটানো হোল গোলদীঘি এবং অন্যান্য অঞ্চলে বড় বড় পুকুর কাটানো হোল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে যানবাহনের চলাচলের জন্য নির্মিত হোল নূতন নূতন রাস্তা—কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন, ওয়েলেসলি, উড, লাউডন, ময়রা, আমহর্াস্ট প্রভৃতি ষ্ট্রীট ও বিখ্যাত ষ্ট্র্যাণ্ড রোড। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দূর করার জন্য গঠিত হোল 'ফিভার হসপিটাল কমিটি।' এঁদের প্রচেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত তৈরী হোল আজকের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে আজ যে ক্যালকাটা কর্পোরেশন দাঁড়িয়েছে তার সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৪৭ ও ১৮৫৬ সালে গৃহীত পৌরশাসন সংক্রান্ত দুটি বিল।

কলিকাতা নগরীর নামকরণ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ বলেন কালীঘাট থেকে কলিকাতা নামের উৎপত্তি। মা কালীর পাকা

কোঠা বা মন্দির রয়েছে কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তে আদিগঙ্গার তীরে। তাই কালীকোঠা থেকে কলিকাতা হয়েছে। কিন্তু কালীঘাট গ্রাম কলিকাতা গ্রামের পাশাপাশি অনেকদিন থেকেই রয়েছে। আমার মনে হয়, কলিকাতার নামকরণ নিয়ে আচার্য্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য যথার্থ। তিনি বলেছেন, কলিকাতা অঞ্চল যখন শহর হয় নি, তখন সেখানে কলি বা চূণের জন্য শামুকের আড়ত ছিল। চূনারীরা এই শামুক পুড়িয়ে কলিচূণ তৈরি করত। সুতানুটী গ্রামে যেমন সূতার কারবার ছিল, তেমনি কলিকাতায় কলিচূনের কারবার হোত। আর সেই থেকেই কলিকাতার নামকরণ ঐরূপ হয়। কলিকাতায় উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়ের আগমনের পূর্বে ডোম, জেলে, কসাই, চূনারী প্রভৃতি বর্ণের লোকের বসবাস ছিল। বিগত দুশো বছরে বন্দর কলিকাতা এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, কেশব সেনের প্রভাব পড়েছে সারা ভারতবর্ষে। রাজনৈতিক সংগ্রামে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, অরবিন্দ, দেশবন্ধু, নেতাজী প্রমুখকে আসমুদ্র হিমাচল নেতা বলে স্বীকার করেছে। বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ শত শত যুবক ফাঁসি বরণ করেছে। সাহিত্যে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ নবযুগের সূচনা করেছেন। সকলের কর্মসাধনার ক্ষেত্র এই কলিকাতা। কলিকাতার গবেষণাগারে সাধনা করে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশ বসু ভারতবর্ষকে মর্য্যাদা দান করেছেন। তাই মহামতি গোখলে বলেছেন "What Bengal thinks to-day India will think tomorrow." রাজনৈতিক রাজধানী দিল্লীতে চলে গেলেও ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী এই কলিকাতাতেই রয়ে গেল।

কলিকাতা শহর হিসাবে গড়ে ওঠবার আগে বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল হুগলী। হুগলীতে তখন পর্তুগীজদের প্রাধান্য এবং তাদের অকথিত অত্যাচারে ও লুণ্ঠনে বাংলার মানুষ পর্য্যুদস্ত। সম্রাট

শাহজাহানের আদেশে বাংলার শাসনকর্তা কাসিম খাঁ হুগলীতে পর্তুগীজ শক্তি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন কিন্তু এরই কিছুদিন পরে বাংলার শাসনকর্তা সুজাউদ্দিনের কাছ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর হুগলী কুঠির প্রতিনিধি জব চার্ণক হুগলী বন্দর লুঠ করলেন। তাঁর ঔদ্ধত্যে ক্ষুণ্ণ হয়ে মোগলশক্তি মারমুখী হলো এবং জব চার্ণক হুগলী ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন এবং সুতানুটীতে কুঠি স্থাপন করলেন। এখানে কুঠি স্থাপন করার উদ্দেশ্য হোল যে এই জায়গা থেকে বাণিজ্য জাহাজে নদীপথে একদিকে যেমন বঙ্গোপসাগরে অপরদিকে তেমনি উত্তর ভারতের সঙ্গে যাতায়াত খুব সহজে করা যায়। সুতরাং বাণিজ্যের পক্ষে এই অঞ্চলই সর্বোৎকৃষ্ট। বর্তমান বাগবাজারের খাল থেকে নিমতলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সুতানুটী এবং সংলগ্ন কলিকাতা গ্রামের বিস্তৃতি ছিল চাঁদপাল ঘাট পর্য্যন্ত। আবার চাঁদপাল ঘাট থেকে আদিগঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের নাম ছিল গোবিন্দপুর। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের নাম বিলুপ্ত হয় এবং সমগ্র অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় কলিকাতা। দেশগতভাবে বিভিন্ন জাতি কলিকাতাকে বিভিন্ন নামে ডাকেন, যেমন—কলকাতা, কলকেতা, কলকত্তা, ক্যালকাটা কলিকোট্টা, কালকুত্তা, কইলকাত্তা ইত্যাদি।

বর্তমানে কলিকাতা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হলেও, হাজার বছর আগে কলিকাতা ছিল জলাভূমি। প্রাকৃতিক কারণে ধীরে ধীরে ডাঙ্গার সৃষ্টি হয় এবং মানুষের বাসোপযোগী হয়ে ওঠে। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরামের চণ্ডী-মঙ্গল এবং আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতেও কলিকাতার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তবে কলিকাতা ছিল সপ্তগ্রামের অধীনস্থ একটা মহল। ১৮৫০ সালে সিমৃস সাহেব কলিকাতা শহরের ভৌগলিক

সীমানার উল্লেখ করেন যা 'ডিহি কলিকাতা বলে পরিচিত।' এই ডিহি কলিকাতা উত্তরে বর্তমান কলুটোলা ষ্ট্রীট, দক্ষিণে বহুবাজার ষ্ট্রীট, পূর্বে সার্কুলার রোড ও পশ্চিমে লালবাজার সন্নিহিত অঞ্চল। এই অঞ্চলে চূনারীদের বসবাস ছিল একশো বছর আগেও। বর্তমান ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর দিয়ে গঙ্গার ধারা বইত এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য চূনারীরা ডিহি কলিকাতাতে বসবাস করত।

জব চার্ণকের জামাতা চার্লস আয়ারের সময় থেকেই কলিকাতার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথম থেকেই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইচ্ছা ছিল কলিকাতায় কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করা কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে সম্মতি না পাওয়ার জন্য তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভাসিংহের বিদ্রোহে কোম্পানী ভীত হয়ে পড়ার জন্য সরকার তাদের দুর্গ নির্মাণ করার সম্মতিদান করলেন। বর্তমানে যেখানে জেনারেল পোষ্টঅফিস, কাষ্টমস হাউস ও রেল অফিস (ফেয়ারলীপ্লেস) সেখানে নির্মিত হয়েছিল তাদের প্রথম দুর্গ। ইংলণ্ডের তৎকালিন রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নামে এই দুর্গের নাম রাখা হোল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ।

এই সময় সম্রাট ঔরঙ্গজীবের পৌত্র আজিম-উসমান বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁর কাছ থেকে মাত্র ১৬,০০০ টাকার বিনিময়ে গোবিন্দপুর সুতানুটি ও কলিকাতার জমিদারী ক্রয় করে। শুধু তাই নয়, এর কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ ফারুকশায়ারের কাছ থেকে কোম্পানী শুধু বিনাশুল্কে ব্যবসা বাণিজ্য করবার অধিকার আদায় করে নি, আদায় করে নিল হুগলী নদীর দু'তীরে আটত্রিশটি গ্রাম কেনার অধিকার। এর ফলে কোম্পানীর পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্য চালাবার পথ সহজতর হয়ে উঠল।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বর্গির আক্রমণ দেখা দিল। এই বর্গিদের অকথ্য অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্য এক পরিখা খনন করা হোল যা আজও মারাঠা ডিচ্ বলে খ্যাত। কিন্তু বাংলার নবাব আলিবর্দ্দির সঙ্গে বর্গিদের এক সন্ধি হওয়ার ফলে একদিকে

যেমন তাদের অত্যাচার বন্ধ হোল অপরদিকে এই খালেরও আর প্রয়োজন রইল না। তাই ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পরিখা ভরাট করে গড়ে উঠল এক সড়ক যা আজ সার্কুলার রোড নামে পরিচিত।

মীরজাফর যখন দিল্লীর সিংহাসনে তখন কোম্পানী তাঁর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করে নেয়। অবশ্য তার কারণও ছিল। পলাশী যুদ্ধের পর তাঁকে সিংহাসনে বসানোর ব্যাপারে কোম্পানীর যথেষ্ট হাত ছিল। এই আহৃত অর্থের কিছুটা ব্যয় হোল গোবিন্দপুরের জঙ্গল পরিষ্কার করে বর্তমানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করতে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গের নির্মাণকার্য্য শেষ হয়।

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা শাসন ব্যাপারে ছিল মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জের অধীন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন পৃথক বঙ্গপ্রদেশ গঠিত হোল তখন তার প্রেসিডেণ্ট পদে আসীন হলেন চার্লস আয়ার। এর কিছুদিনের মধ্যে অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতাকে বাণিজ্য প্রসারের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নেওয়ার পর থেকেই এখানে গীর্জা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতাকে এক পৃথক প্রেসিডেন্সী বলে ঘোষণা করেন। ততদিনে পুরানো কেল্লা (বর্তমান জি. পি. ও) ও তার আশেপাশের অঞ্চল উপনিবেশিকদের কল্যাণে বেশ জমজমাট। তাই ইংরাজের প্রথম গির্জ্জা তৈরি হয় বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংস-এর পাশে। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জুন এই গীর্জ্জাটি সেণ্ট অ্যানের নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। এই গীর্জ্জাটিকে কিন্তু বিবিধ দুর্বিপাকের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। ১৭৩৭ সালে প্রচণ্ড ঝড়ে গীর্জ্জার চূড়া ভেঙে যায়। দ্বিতীয়তঃ, ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদৌল্লার কলিকাতা আক্রমণের সময় গীর্জ্জাটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কেননা মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ইংরাজরা এইস্থানে কামান বসিয়েছিল এবং সিরাজের আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুত ছিল এই দুর্গ আক্রমণ করা। কলিকাতা পতনের সঙ্গে সঙ্গে গীর্জ্জা গৃহেরও পতন ঘটে। জব চার্ণকের নাম কলিকাতা মহানগরীর

প্রতিষ্ঠাতারূপে চিরদিন ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। অপর দুটি চার্চ্চ আর্মেনীয়ান চার্চ্চ অব সেণ্ট নেজারেথ এবং মুর্গীহাটায় পর্ত্তুগীজদের চার্চ্চের কোন ক্ষতি হয় নি সিরাজের কলিকাতা আক্রমণের সময়। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যে চার্চ্চটি নির্মিত হয়েছিল তার নাম পাথর গির্জা বা সেণ্ট জনস্ চার্চ্চ। এই চার্চ্চ নির্মাণে ওয়ারেণ হেষ্টিংস-এর যথেষ্ট অবদান ছিল এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই চার্চ্চ প্রধান প্রেসিডেন্সী চার্চ্চের গৌরব লাভ করে। চার্চ্চ নির্মাণে আনুমানিক ব্যয় হয়েছিল দু'লক্ষ টাকা এবং এর মেঝে তৈরি হয়েছিল গৌড়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে আনীত পাথর ও চূণার পাথর দিয়ে। এই গীর্জ্জার প্রাঙ্গণে জব চার্ণকের সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান। প্রকৃতির স্নিগ্ধ ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে যে সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল—তার কারুকার্য্য সুন্দর এবং গঠনশৈলী অপূর্ব। এমন সুন্দর ইন্দোগথিক শিল্পসুষমা-মণ্ডিত চার্চ্চ খুব কমই দেখা যায়। পূর্বে এই অঞ্চল ছিল শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্য এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস এখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগার শিকার করতে আসতেন বলে শোনা যায়। বর্তমান বিনয় বাদল দীনেশ বাগের উত্তর প্রান্তে ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে সুরম্য গীর্জ্জাটি বিভিন্ন নামে সুপরিচিত—দি স্কচ কার্ক, দি কার্ক সেণ্ট এনড্রুজ চার্চ্চ ইত্যাদি। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা। এই চার্চ্চের লক্ষ্যনীয় বস্তু হোল এর উঁচু ডোরিক স্তম্ভগুলি এবং আকাশচুম্বী চূড়া। কালীঘাটের গ্রীক চার্চ্চও ডোরিক স্থাপত্য রীতির নিদর্শন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ এর নির্মাণকাল। এছাড়াও কলিকাতায় আরও অনেক চার্চ্চ পরবর্তীকালে স্থাপিত হয়েছে। ডালহৌসি পাড়ায় দু'টি গীর্জ্জা—রাজভবনের পাশে সেণ্ট জনস্ চার্চ্চ আর আরেকটু দূরে সেণ্ট এগনেশ চার্চ্চের উচ্চতা নিয়ে ইংরাজদের দু'দলে এক সময় গোলযোগ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হয় সেণ্ট জন্‌সের চেয়ে এগনেশের উচ্চতা বেশী করা চাই। গীর্জ্জা তৈরির কাজ আরম্ভ হোল। নির্মাণ শেষে দেখা গেল সেণ্ট জনস্ চার্চ্চ উচ্চতায় বেশী। হৈহৈ কাণ্ড; কিন্তু উঁচু

করার আর কোন সম্ভবনা নেই। তাই সকলে মিলে ঠিক করলেন ওয়েদার কক্ বসানোর। ফলে সমস্যার সমাধান হোল। আজও যে ওয়েদার কক্ আমরা দেখতে পাই এ তারই ফল।

কালীঘাট ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের তীর্থস্থান। কালীঘাটের কালী পূর্ব্বে ভবানীপুরে ছিলেন পরে সাবর্ণ চৌধুরী আদিগঙ্গার তীরে বর্তমান কালীমন্দির স্থাপন করে ভবানীপুর থেকে কালীমূর্ত্তি কালীঘাটে নিয়ে আসেন। বর্তমানে যে অঞ্চলে ট্রেজারী বিল্ডিং রয়েছে সেই খানেই ছিল রাধামাধবের মন্দির। সে মন্দির স্থাপিত হয়েছিল সাবর্ণ চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায়। দোল উৎসবের সময় মন্দির চত্বরে আবির খেলা হোত। সেই আবিরের রঙে লাল হয়ে উঠত পার্শ্ববর্তী দীঘির জল। আর সেই থেকেই এই দীঘির নামকরণ লালদীঘি হয়ে আসছে। টালিগঞ্জে নবরত্ন মন্দির (আলোকচিত্র-৪৭) কলিকাতার আর এক দর্শনীয় বস্তু।

লর্ড কার্জনের সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি সৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয় এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে ১৯০৪ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে যে সৌধটির নির্মাণ হয় তা আজ 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল' বলে প্রসিদ্ধ (আলোকচিত্র—৪৮)। তদানীন্তন অনেক রাজন্যই মুক্তহস্তে এই ব্যাপারে অর্থদান করেছিলেন। বিখ্যাত স্থপতি উইলিয়াম এর্মাসনের নেতৃত্বে মার্টিন কোম্পানী নির্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন। এর রয়্যাল গ্যালারীতে মহারাণীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী ছবিতে আঁকা আছে। গম্বুজের নীচে হল ঘরে মহারাণীর একটি প্রতিমূর্ত্তি—সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। এছাড়া মহারাণীর ব্যবহৃত অনেক জিনিষ যত্নসহকারে রক্ষিত আছে।

ময়দানের পশ্চিমপ্রান্তে অক্টোরলোনী মনুমেণ্ট। নেপাল যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতির (১৮১৩-১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ) স্মৃতির রক্ষার্থে এই স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল। এর উচ্চতা প্রায় ১৫৮ ফুট। এত উঁচু যে মনুমেণ্টের চূড়া থেকে সমগ্র কলিকাতাকে মোটামুটি দেখতে পাওয়া যায়।

কলিকাতার ইতিহাসই কলিকাতার গর্ব। কলিকাতার ইট-পাথরে লুকানো রয়েছে বিচিত্র সব ইতিহাস! আজ আর কাউন্সিল হাউস বা মন্ত্রণাসভা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ কোম্পানীর আমলে একসময় ঐ পথেই ছিল কাউন্সিল হাউস। ১৮০০ সালের গোড়ার দিকে তা ভেঙে ফেলা হয়।

কলিকাতার অন্যতম পুরানো সড়ক আজকের পার্ক ষ্ট্রীট। এক সময় এর নাম ছিল বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড। এই পথ ধরে সাহেবরা তাদের মৃত আত্মীয়দের কবর দিতে কবরখানায় নিয়ে যেত। ১৭৯৪ সালে এর নাম পরিবর্তন করে নূতন নাম দেওয়া হয়।

কলিকাতার ধর্মতলা ও চৌরঙ্গী নিয়ে অনেক মতবাদ আছে। অনেকে বলেন মুসলমানদের মসজিদ ছিল বলে নাম হয় ধর্মতলা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আর কোন স্থানের নাম মসজিদ থাকার জন্য ধর্মতলা হয়েছে বলে জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় থেকে ধর্মঠাকুরের পূজা ভাগীরথীর পূর্বতীরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কলিকাতা পর্য্যন্ত যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ধর্মঠাকুরের অস্তিত্বের জন্য ধর্মতলা হয়েছে এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য। এক সময় সারা কলিকাতায় ধর্মঠাকুরের বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল কিন্তু কালক্রমে তা শিবঠাকুরে পরিণত হয় এবং ধর্মঠাকুরের বিলুপ্তি ঘটে। হাড়ি ও ডোমের বসবাস ছিল ধর্মতলায়; এরা ধর্মঠাকুরের উপাসক। বর্তমান হাজরা রোড ও শরৎ বসু রোডের মোড়ে একটি প্রাচীন ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে, এখন শিবই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। কসবা, বেহালা অঞ্চলেও ধর্মঠাকুর আছেন। তান্ত্রিক শৈবধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের মিশ্রণে নাথধর্মের বিকাশ হয়েছে। ঠিক কোন সময়ে হয়েছে তা বলা মুশকিল তবে নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই এই মিশ্রণ সংগঠিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ রাঢ়ে নাথধর্মের এক বিরাট সাধনকেন্দ্র ছিল। আর তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, কলিকাতা ও চব্বিশ

পরগনায়। কলিকাতায় নাথযোগী ও নাথপণ্ডিতদের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। উত্তর কলিকাতায় নাথের বাগান, যোগীপাড়া প্রভৃতি নাম আজও বর্তমান। চৌরঙ্গীনাথ নাথযোগীদের প্রধান উপাস্যদের মধ্যে অন্যতম। গোরক্ষনাথ, মীননাথও তাদের উপাস্য। চৌরঙ্গী অঞ্চলে এই রকম কোন মঠ বা মন্দির ছিল চৌরঙ্গীনাথের। দমদমে গোরক্ষ-নাথের মঠ আছে। উত্তর কলিকাতায় জৈন সম্প্রদায়ের তৈরী পরেশনাথের মন্দির (আলোক চিত্র ৪৯) আর এক দ্রষ্টব্যবস্তু।

গ্রন্থপঞ্জী

১। অমিয় কুমার বন্দোপাধ্যায় —দেখা হয় নাই
—নদীয়ার পুরাকীর্তি
—বাঁকুড়ার মন্দির

২। অনিলচন্দ্র দাশগুপ্ত —ক্যালকাটা হিস্ট্রী

৩। অনুকূল চন্দ্র সেন —বর্দ্ধমান পরিচিতি

৪। অশোক মিত্র —পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্ব্বণ ও মেলা
—ডিষ্ট্রীক্ট হ্যাণ্ড বুক

৫। আর, এল, বড়ুয়া —আর্লি হিস্ট্রি অব কামরূপ

৬। আমানুল্লা আমেদ চৌধূরী —কোচবিহার ইতিহাস

৭। অসীম মুখোপাধ্যায় —চব্বিশ পরগণার পুরাকীর্তি

৮। এস, এন, সেন —ক্যালকাটা

৯। কুমুদ মল্লিক —নদীয়া কাহিনী

১০। কালিকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য —শান্তিপুর পরিচয়

১১। কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় —বাংলার ভাস্কর্য্য

১২। কালিপদ লাহিড়ী —গৌড় ও পাণ্ডুয়া

১৩। ক্ষিতিমোহন সেন —বাংলার সাধনা (বিশ্বভারতী)

১৪। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু —বাংলার লৌকিক দেবতা

১৫। গোপাল হালদার —বাঙালীর সংস্কৃতির রূপ

১৬। গৌরহরি মিত্র —বীরভূমের ইতিহাস

১৭। জে, ই, গাসট্রেল —মুর্শিদাবাদ

১৮। চারুচন্দ্র সান্যাল —রাজবংশীস অব্ নর্থ-বেঙ্গল

১৯। জে, ব্যানার্জী —হাওড়া: ডেসক্রিপসান এ্যাণ্ড ট্রাভেল

২০। তারাপদ সাঁতরা —বাংলার মন্দির

২১। ত্রৈলোক্য নাথ পাল —মেদিনীপুরের ইতিহাস

২২। দেবকুমার চক্রবর্তী —বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি
২৩। দানী, এ. এইচ. —মুসলীম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল
২৪। দীনেশচন্দ্র সেন —বিশাল বঙ্গ
—বৃহৎ বঙ্গ
২৫। ধনঞ্জয় দাসমজুমদার —বাংলা ও বাংলার গৌরব
২৬। নারায়ণ চৌধুরী —বর্দ্ধমান পরিচিতি
২৭। নিরঞ্জন চক্রবর্তী —বীরভূম বিবরণ
২৮। নির্মলকুমার বসু —মানভূম জেলার মন্দির
২৯। নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য —কোচবিহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৩০। নগেন্দ্রনাথ বসু —বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস
৩১। নীহাররঞ্জন রায় —বাঙালীর ইতিহাস
৩২। নিখিলনাথ রায় —মুর্শিদাবাদ কাহিনী
৩৩। প্রতাপাদিত্য পাল —আর্ট এণ্ড আর্কিটেকচার অব বিষ্ণুপুর
৩৪। প্রসিত রায়চৌধুরী —বঙ্গ সংস্কৃতি কথা
৩৫। পূর্ণচন্দ্র মজুমদার —মুর্শিদাবাদ
৩৬। প্রভাস চন্দ্র সেন —বাংলার ইতিইাস
৩৭। বিনয় ঘোষ —পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
—সুতানটী সমাচার
—টাউন কলকাতার কড়চা
৩৮। বাসটিড্, এইচ. ই. —ক্যালকাটা হিস্ট্রি
৩৯। বি, রায় —ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক
৪০। ভগবতীচরণ বন্দোপাধ্যায় —কোচবিহারের ইতিহাস
৪১। মুকুল দে —বীরভূম টেরাকোটাস
৪২। ডেভিড ম্যাক্কাচান —লেট মিডিয়াভ্যাল টেম্পলস অব বেঙ্গল

৪৩। যাদব চণ্ড চক্রবর্তী —কোচবিহাররাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৪৪। যোগেশ বসু —মেদিনীপুরের ইতিহাস
৪৫। জে, চট্টোপাধ্যায় —বাংলার কথা
৪৬। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় —বাংলার ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)
৪৭। রজনীকান্ত চক্রবর্তী —বাংলাদেশের ইতিহাস
৪৮। রাধাকমল মুখার্জী —বাংলা ও বাঙালী
৪৯। সরসী কুমার সরস্বতী —আর্কি টেরাকোটাস অব বেঙ্গল
৫০। সুকুমার সেন —প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী
৫১। সুধীরকুমার মিত্র —হুগলী জেলার ইতিহাস
৫২। সুনীল চক্রবর্তী —লোকালয় বাংলা
৫৩। এস সি, ঘোষাল —হিস্ট্রি অব কোচবিহার
৫৪। সৃজন নাথ মিত্রমুস্তাফী —বীরনগর
৫৫। শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় — কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি
৫৬। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় —বীরভূম বিবরণ
৫৭। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী —প্রাচীন বাংলার গৌরব
৫৮। হিতেশরঞ্জন সান্যাল —বাংলার মন্দির (সমকালীন)
৫৯। সি. এন. ব্যানার্জী —হাওড়া
৬০। চোমং লামা —উত্তরবঙ্গ

—এবং—

ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স।

নির্দেশিকা

আলোকচিত্র ঃ ১
বড়সোনামসজিদ, মালদহ (পৃঃ ১৭)

আলোকচিত্র ঃ ২

ফিরোজ মিনার

মালদহ (পৃঃ ১৮)

আলোকচিত্র : ৩

কদমরসুল, মালদহ (পৃঃ ১৯)

আলোকচিত্র ঃ ৪
আদিনা পাণ্ডুয়া মসজিদের ধ্বংসাবশেষ
মালদহ (পৃঃ ২১)

আলোকচিত্র ঃ ৫
বাণরাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, পশ্চিমদিনাজপুর (পৃঃ ২৭

আলোকচিত্র ঃ ৬
জল্পেশ্বরের মন্দির, জলপাইগুড়ি (পৃঃ ৩৭)

আলোকচিত্র ঃ ৭
কামতেশ্বরী মন্দিরের একাংশ, কোচবিহার (পৃঃ ৪৯)

আলোকচিত্র ঃ ৮

বাণেশ্বর শিবমন্দির

কোচবিহার (পৃঃ ৫০)

আলোকচিত্র : ৯
অনাথনাথ শিবমন্দির
কোচবিহার (পৃঃ ৫২)

আলোকচিত্র : ১০

সিদ্ধনাথ শিবমন্দির

কোচবিহার (পৃঃ ৫২)
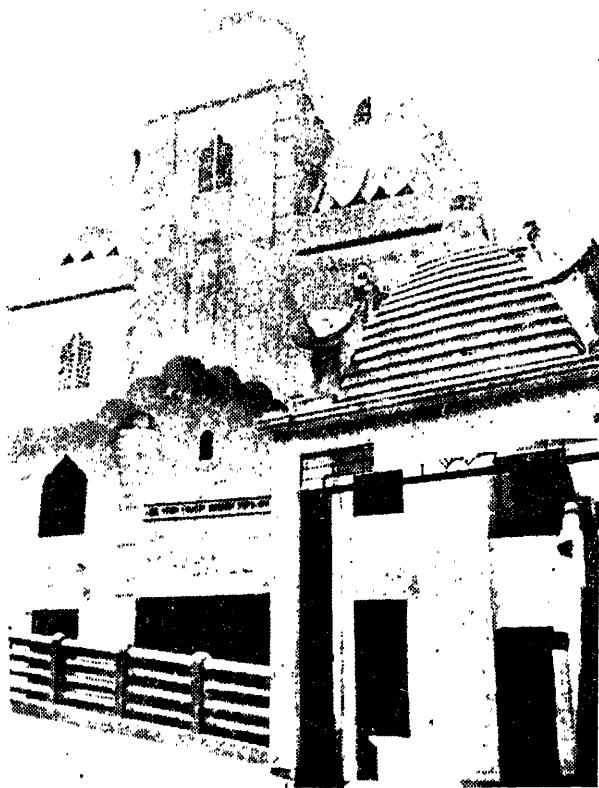
আলেকচিত্র : ১১

শ্রীমন্দির

দার্জিলিং (পৃঃ ৫৯)
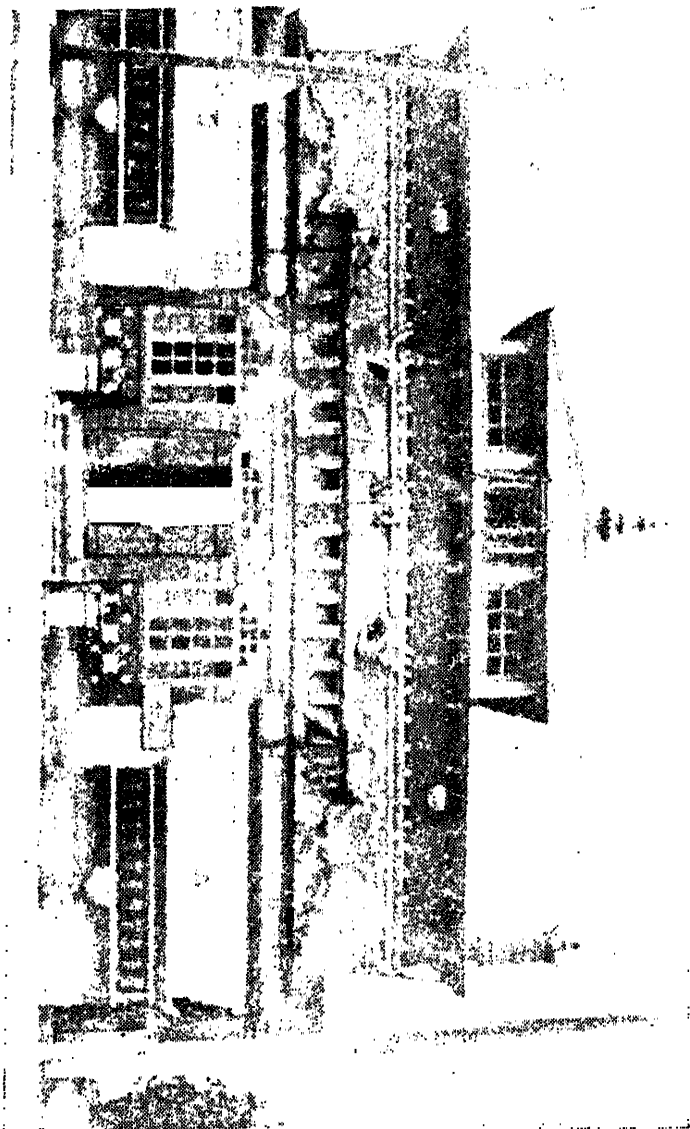
আলোকচিত্র ঃ ১২

ভুটিয়াবস্তী বিহার, দার্জিলিং (পৃঃ ৬০)

আলোকচিত্র : ১৩
তামাং বৌদ্ধবিহার
দার্জিলিং (পৃঃ ৬০)
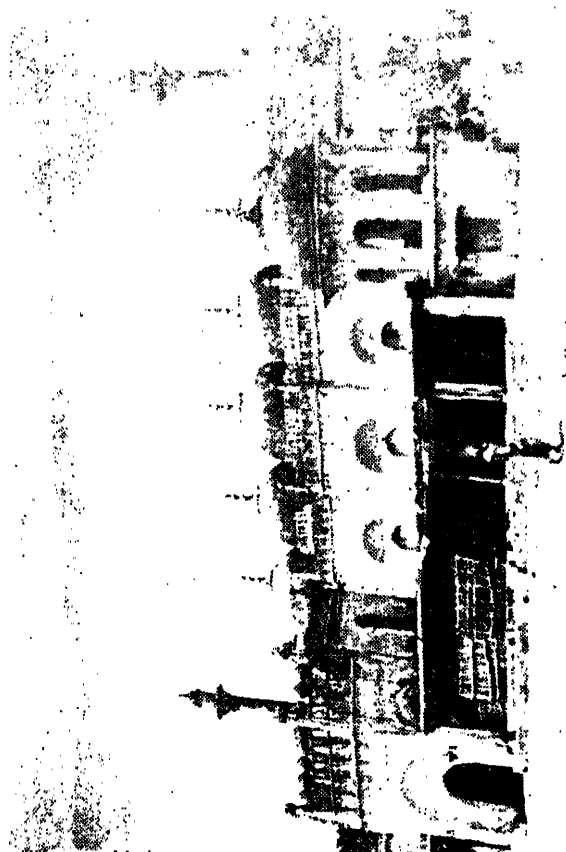
আলোকচিত্র ঃ ১৪
চাঁদনীর মসজিদ
মুর্শিদাবাদ (পৃঃ ৬৫)

আলোকচিত্র : ১৫

রত্নেশ্বর শিবমন্দির

মুর্শিদাবাদ (পৃঃ ৬৫)
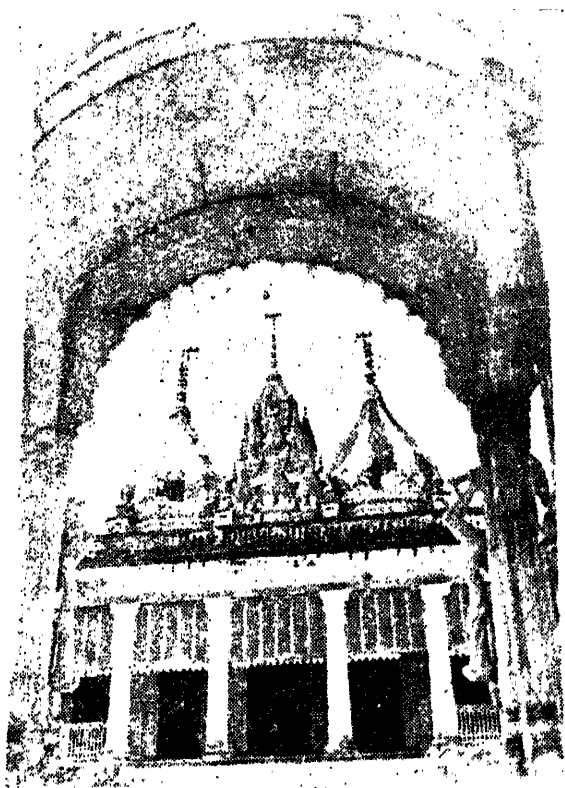
আলোকচিত্র ঃ ১৬

আদিনাথ মন্দির

মুর্শিদাবাদ (পৃঃ ৬৫)

আলোকচিত্র ঃ ১৭

ভবানীশ্বরের মন্দির
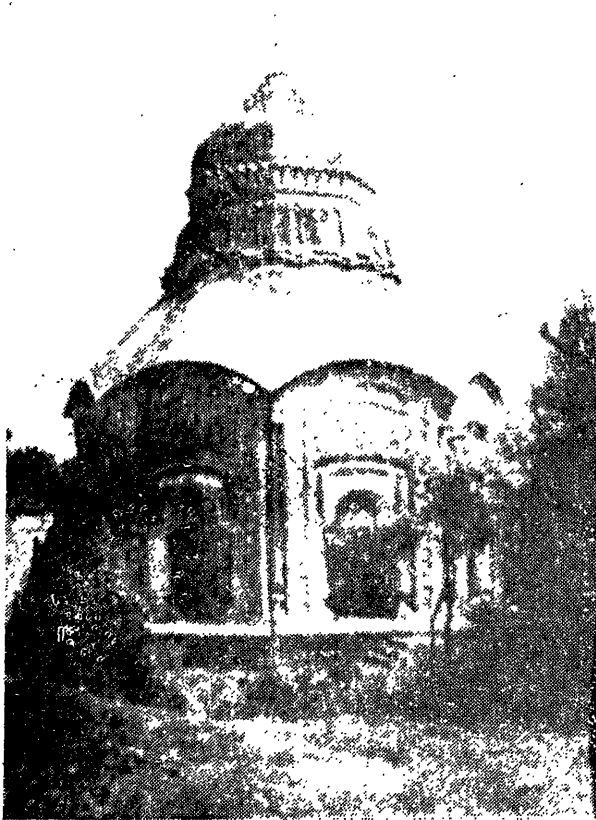
বড়নগর, মুর্শিদাবাদ (পৃঃ ৬৬)

আলোকচিত্র ঃ ১৮

যোগপীঠ মন্দির

নদীয়া (পৃঃ ৭৯)
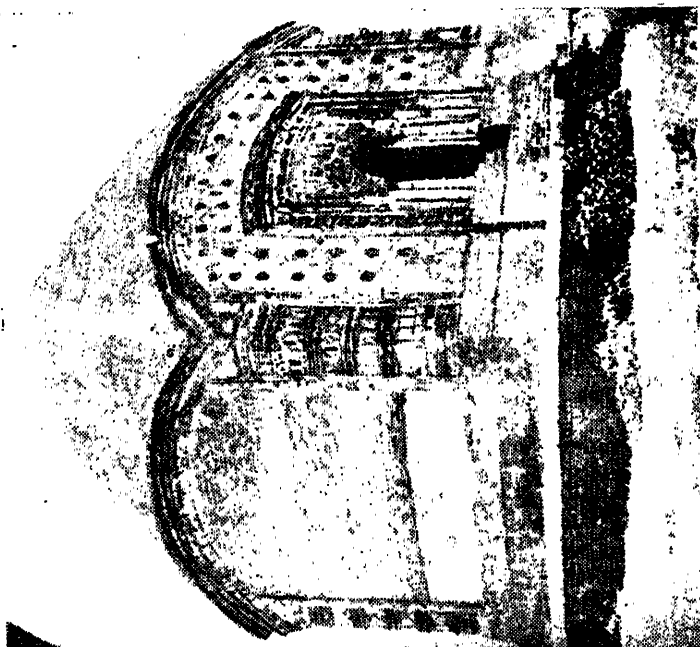
আলোকচিত্র ঃ ১৯
শ্যামচাঁদের মন্দির
শান্তিপুর, নদীয়া (পৃঃ ৮২)
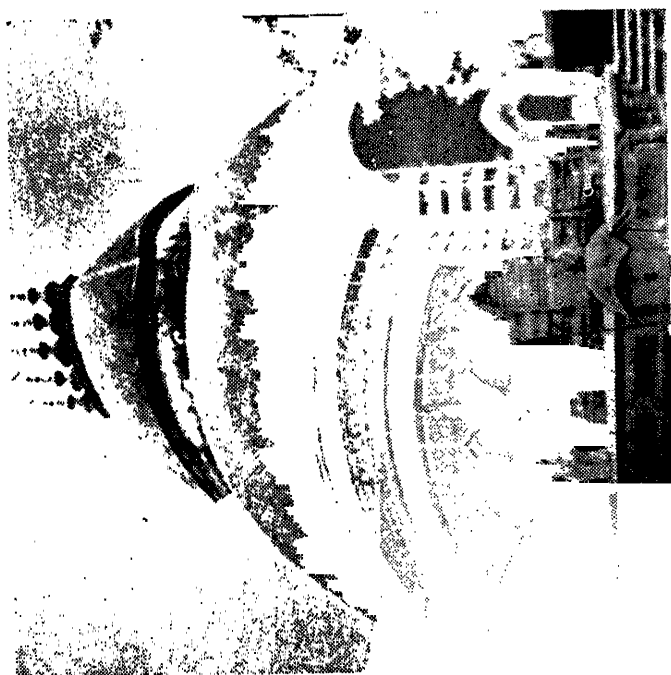
আলোকচিত্র ঃ ২০
পালপাড়ার মন্দির, নদীয়া (পৃঃ ৮৪)
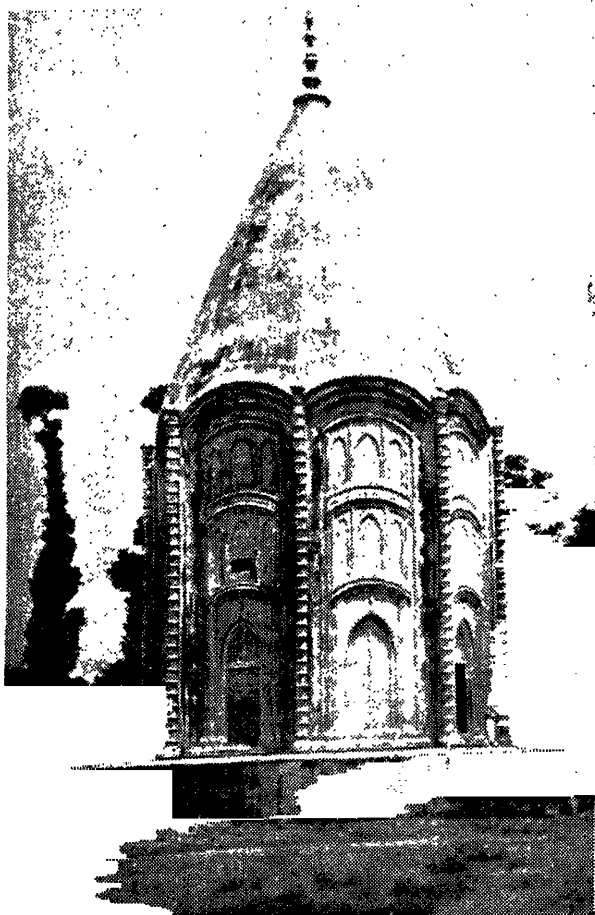
আলোকচিত্র : ২১
রাজরাজেশ্বর শিবমন্দির
শিবনিবাস, নদীয়া (পৃঃ ৮৫)
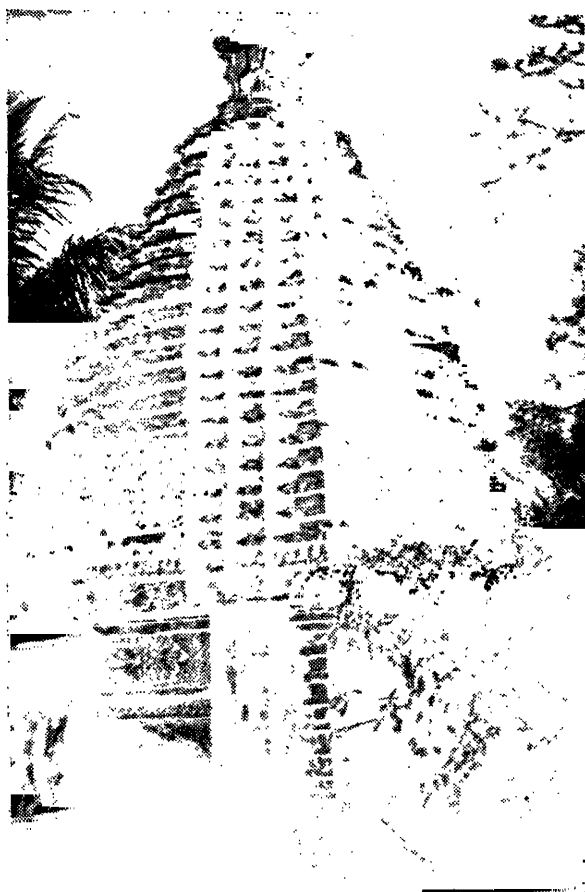
আলোকচিত্র ঃ ২২
রঘুনাথজীউর মন্দির
চাঁদুল, হাওড়া (পৃঃ ৯৪)
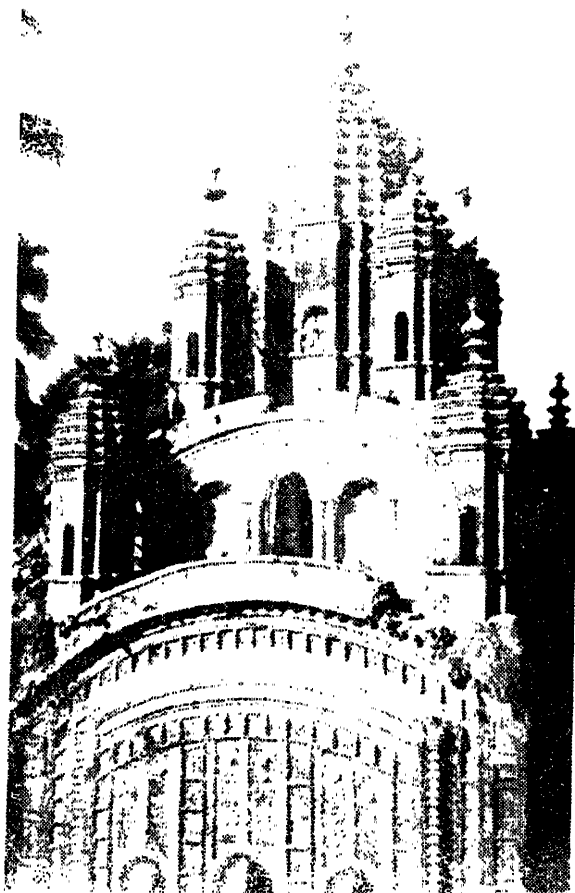
আলোকচিত্র : ২৩
শ্রীধরনাথজীউর মন্দির
আমতা, হাওড়া (পৃঃ ৯৬)
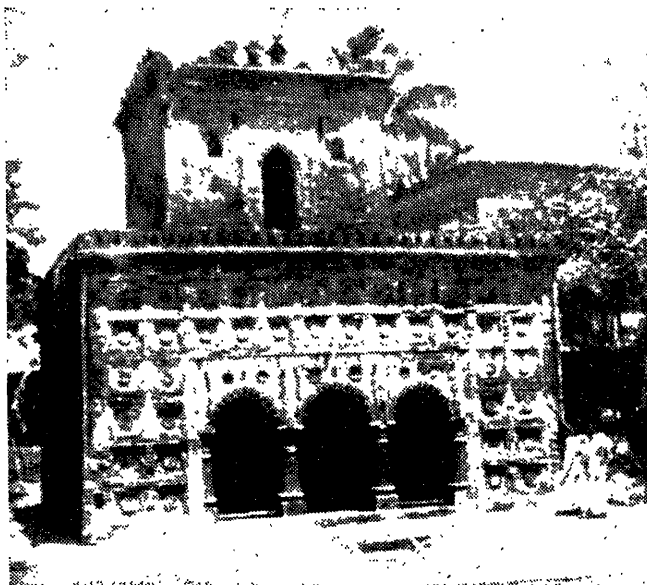
আলোকচিত্র ঃ ২৪
গোবিন্দরায়জীউর মন্দির
গাজীপুর, হাওড়া (পৃঃ ৯৬)
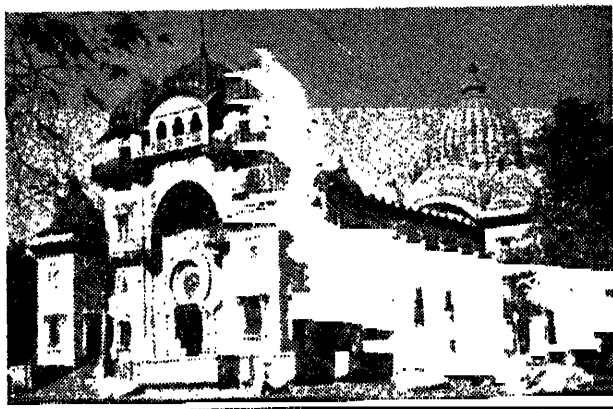
আলোকচিত্র ঃ ২৪ (ক)
বেলুড় মঠ, হাওড়া (পৃঃ ১০০)

আলোকচিত্র ঃ ২৫

জটারদেউল, চব্বিশ পরগণা (পৃঃ ১০৪)
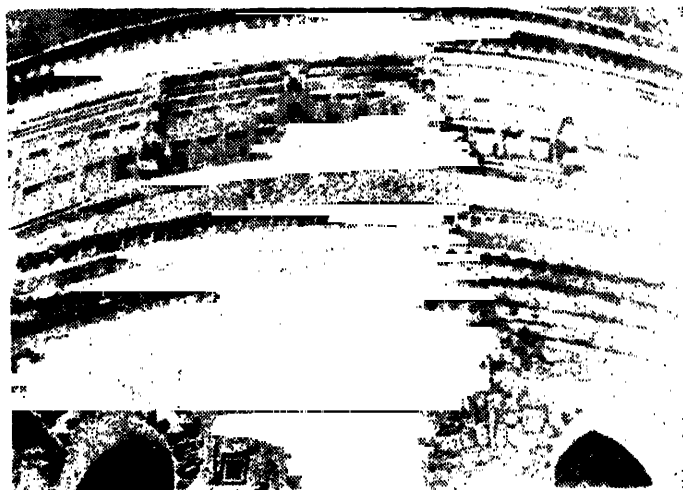
আলোকচিত্র ঃ ২৬

কেশবেশ্বর মন্দিরের পোড়ামাটির অলঙ্করণ, চব্বিশ পরগণা (পৃঃ ১০৮)

আলোকচিত্র : ২৭
রাসমঞ্চ, ধান্যকুড়িয়া
চব্বিশ পরগণা (পৃঃ ১১০)

আলোকচিত্র : ২৮
শ্যামসুন্দরের মন্দির
খড়দহ, চব্বিশ পরগনা (পৃঃ ১১১)
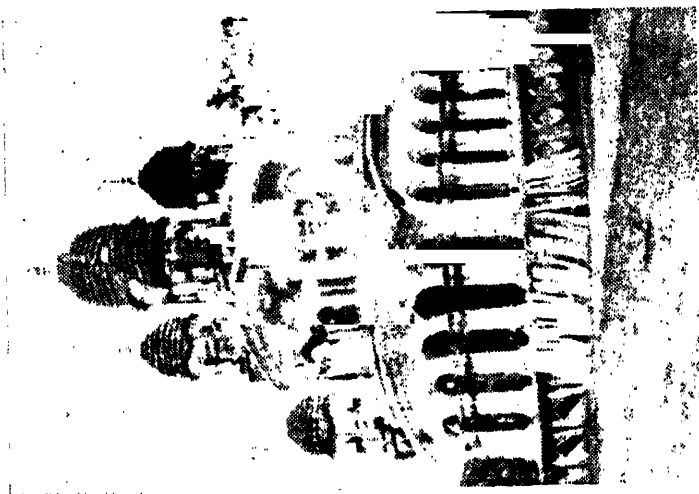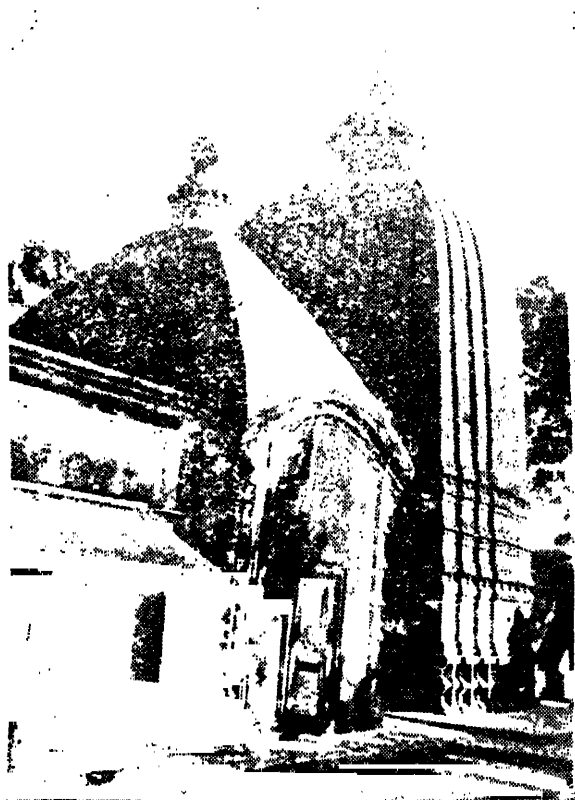
আলোকচিত্র ঃ ২৯
বর্গাভীমার মন্দির
মেদিনীপুর (পৃঃ ১২৪)
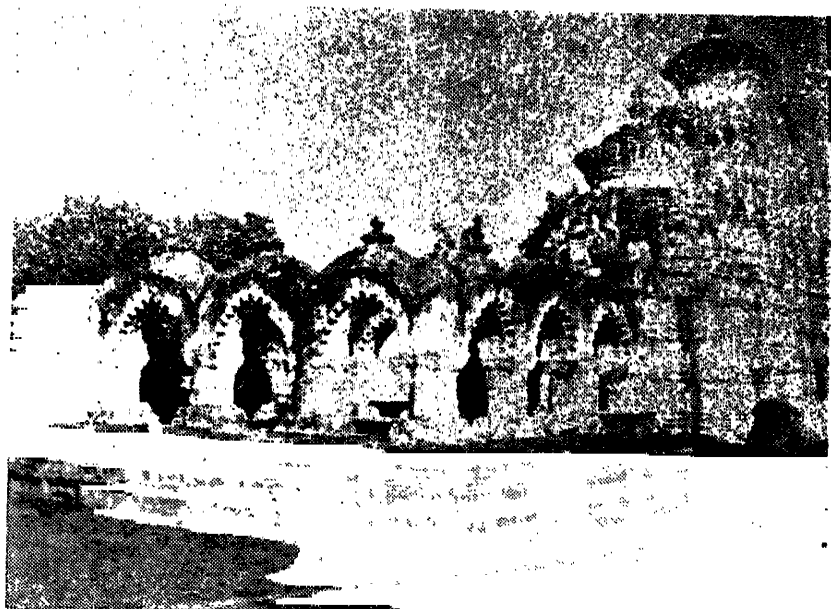
আলোকচিত্র ঃ ৩০
হট্টেশ্বর শিবমন্দির
মেদিনীপুর (পৃঃ ১২৯)

আলোকচিত্র : ৩১
এক্তেশ্বরের শিবমন্দির
বাঁকুড়া (পৃঃ ১৩৮)
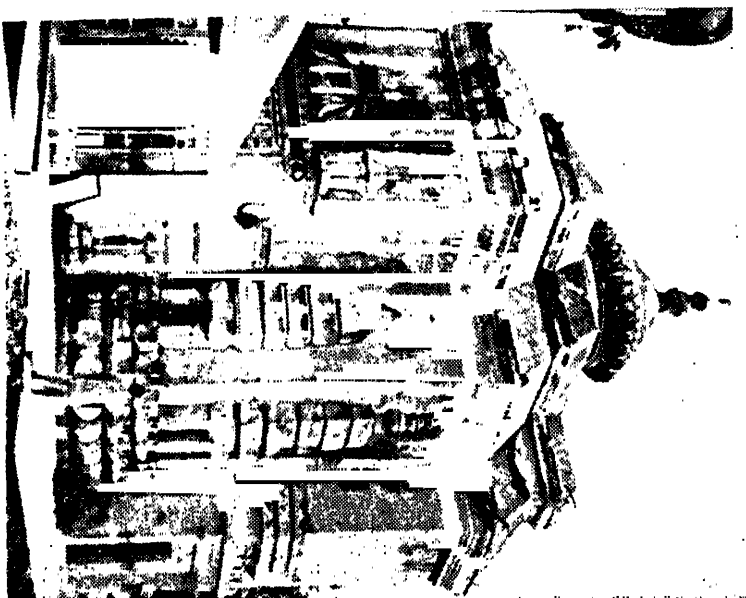
আলোকচিত্র : ৩২
গোকুলচাঁদের মন্দির
বাঁকুড়া (পৃঃ ১৪০)
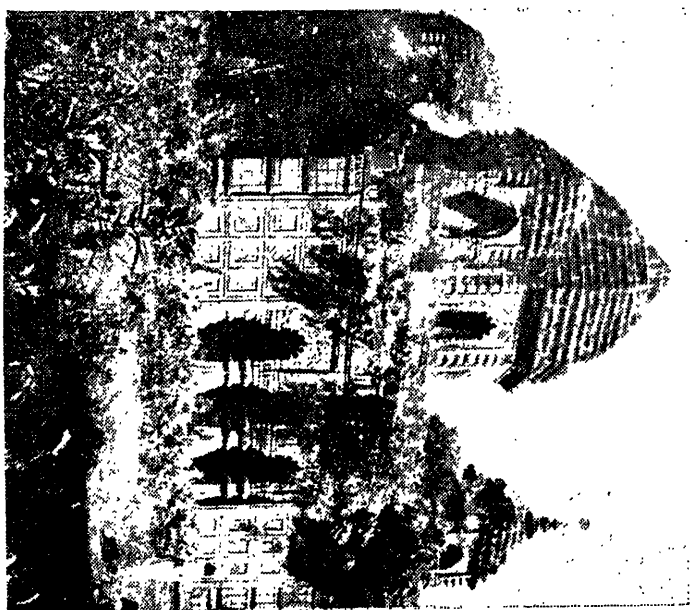
আলোকচিত্র : ৩৩
বাহুলাড়া শিবমন্দির
বাঁকুড়া (পৃঃ ১৪৪)

আলোকচিত্র : ৩৩ (ক)
মল্লেশ্বর শিবমন্দির
বাঁকুড়া (পৃঃ ১৪৮)
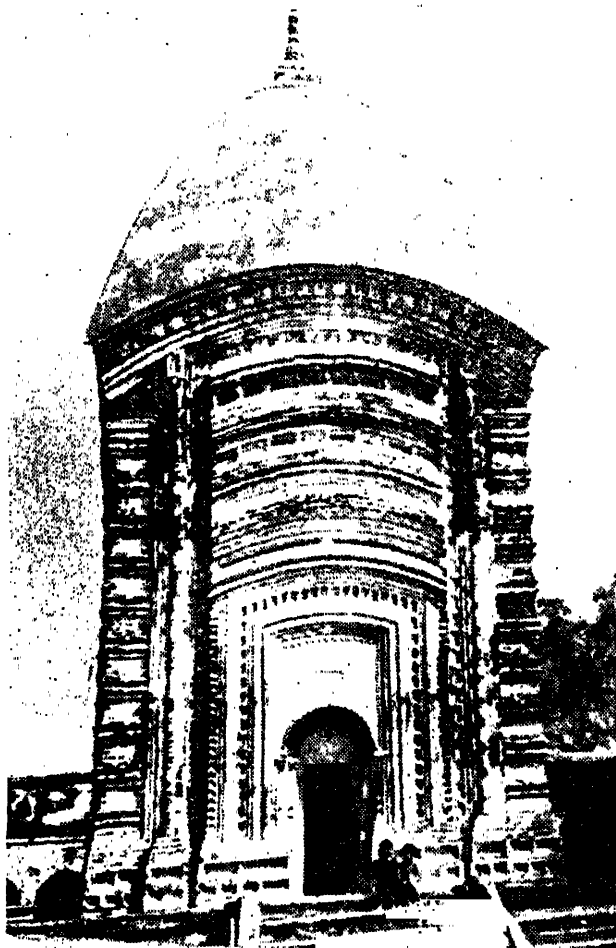
আলোকচিত্র : ৩৪
ডাবুকেশ্বর শিবমন্দির
বীরভূম (পৃঃ ১৫৮)
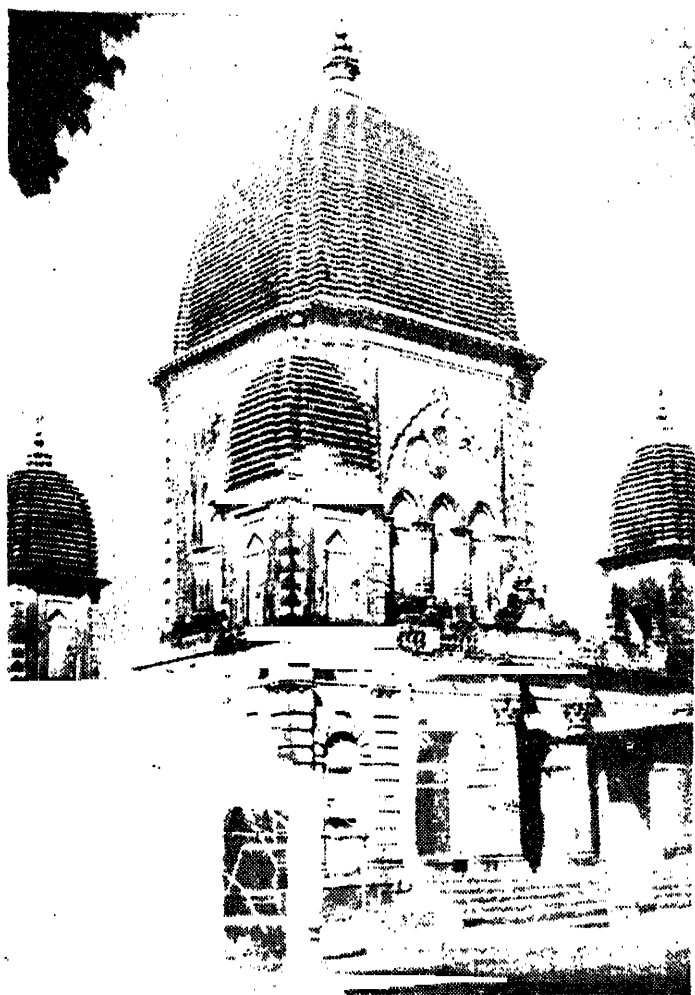
আলোকচিত্র ঃ ৩৫
কলেশনাথ শিবমন্দির
বীরভূম (পৃঃ ১৫৮)
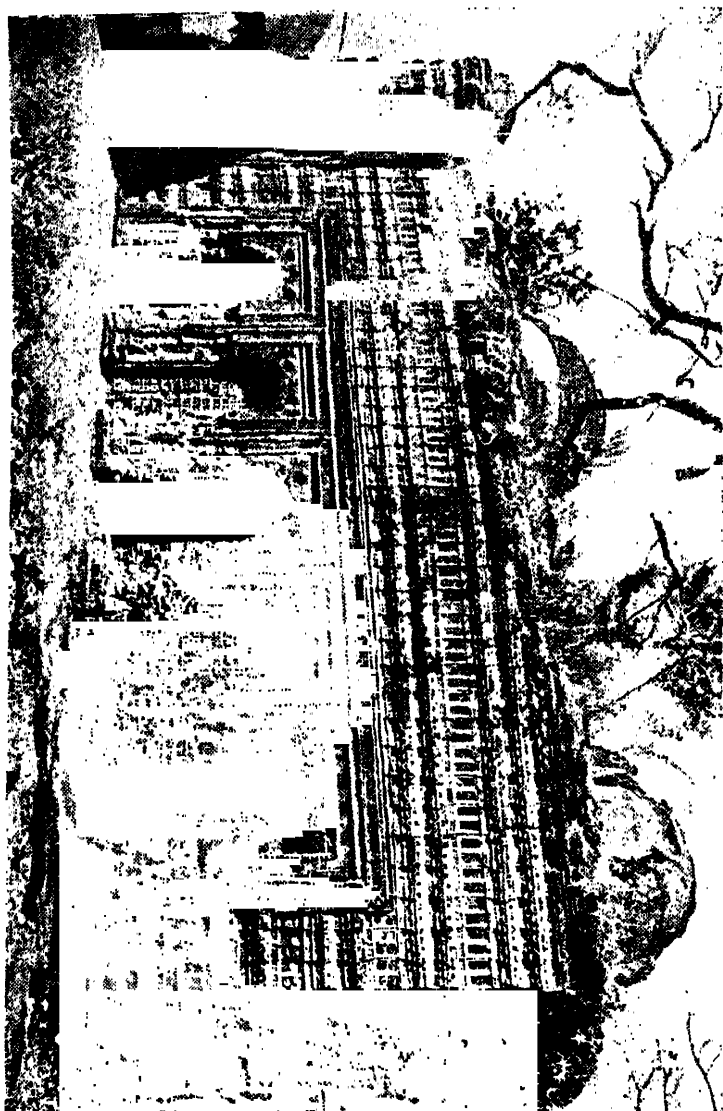
আলোকচিত্র : ৩৬

মতিচুড়া মসজিদ, বীরভূম (পৃ: ১৭০)

আলোকচিত্র ঃ ৩৭
রাধাবিনোদ মন্দির
কঁদুলী, বীরভূম (পৃঃ ১৬১)
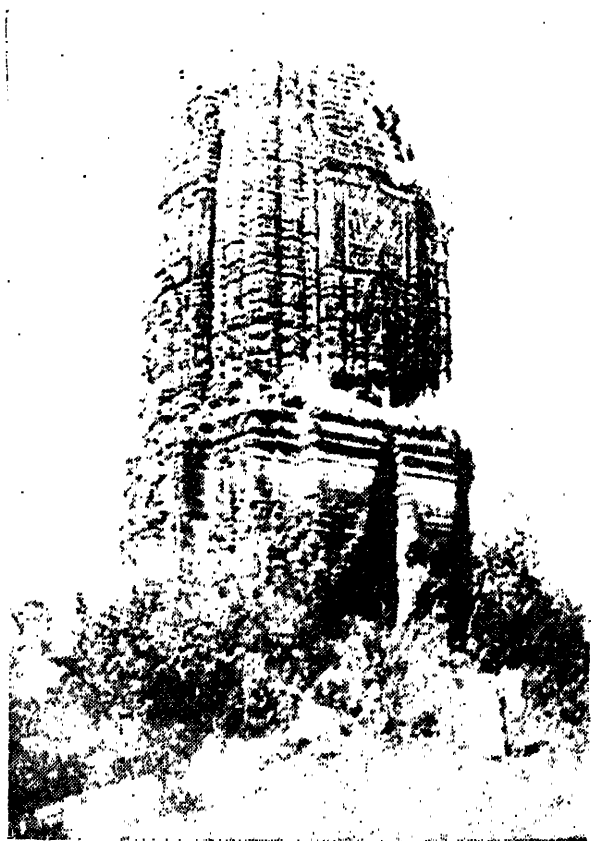
আলোকচিত্র ঃ ৩৮
বড়ম, পুরুলিয়া
(পৃঃ ১৭৬)
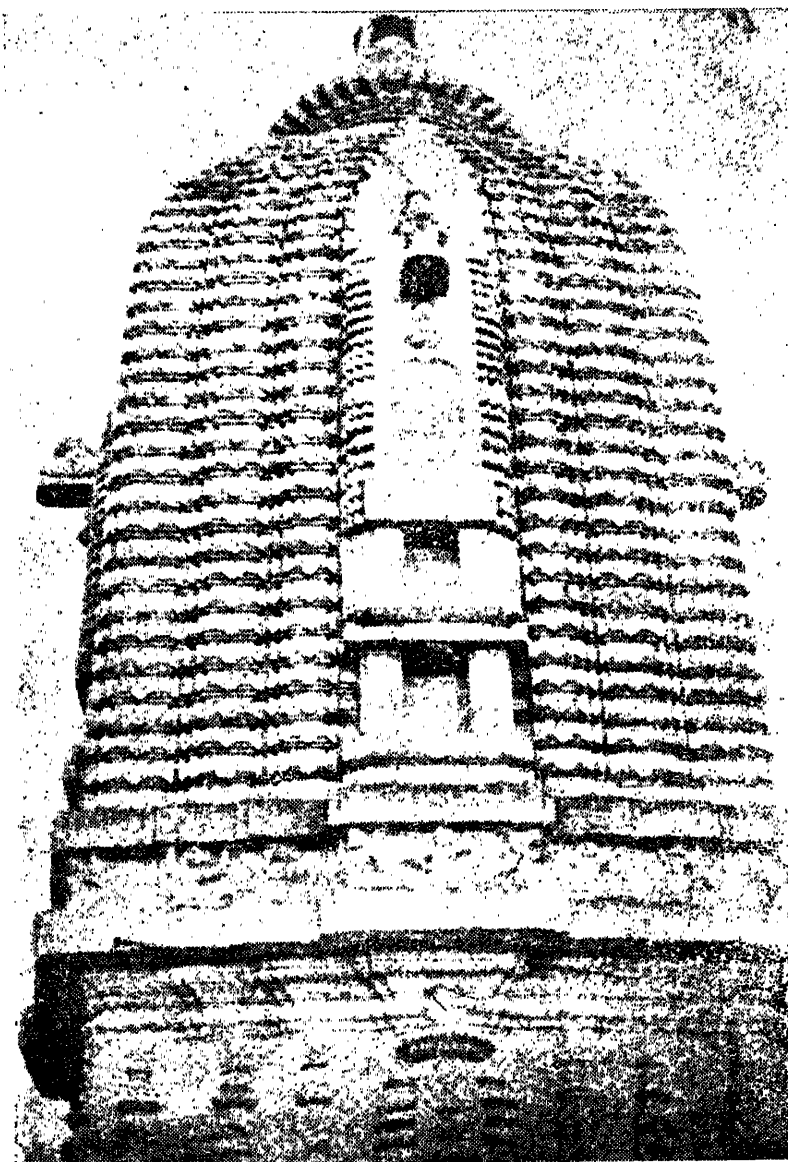
আলোকচিত্র ঃ ৩৯
বরাকরের কল্যাণেশ্বর মন্দির
বর্ধমান (পৃঃ ১৮৩)
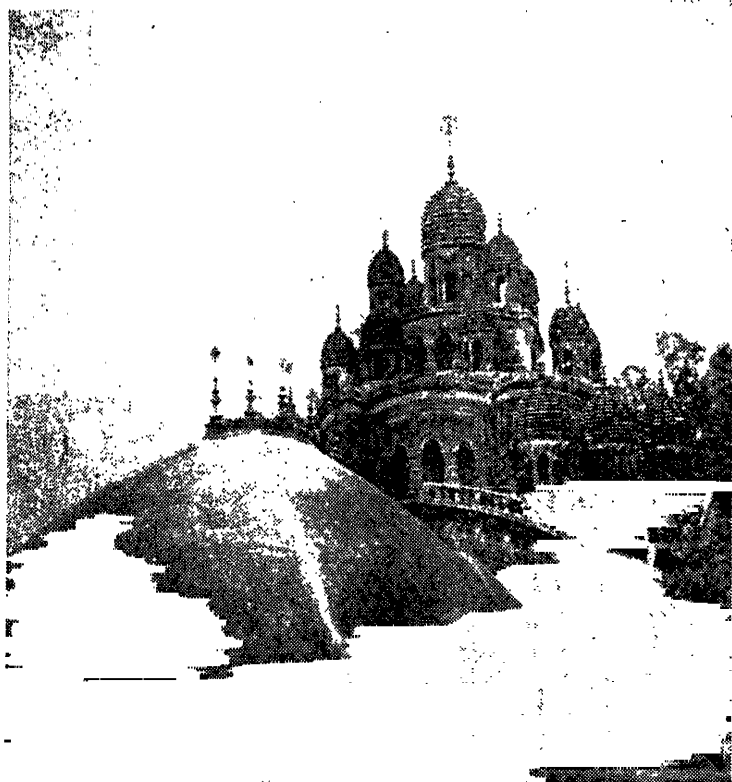
আলোকচিত্র ঃ ৪০
লালজীর মন্দির
কালনা, বর্ধমান (পৃঃ ১৮৭)
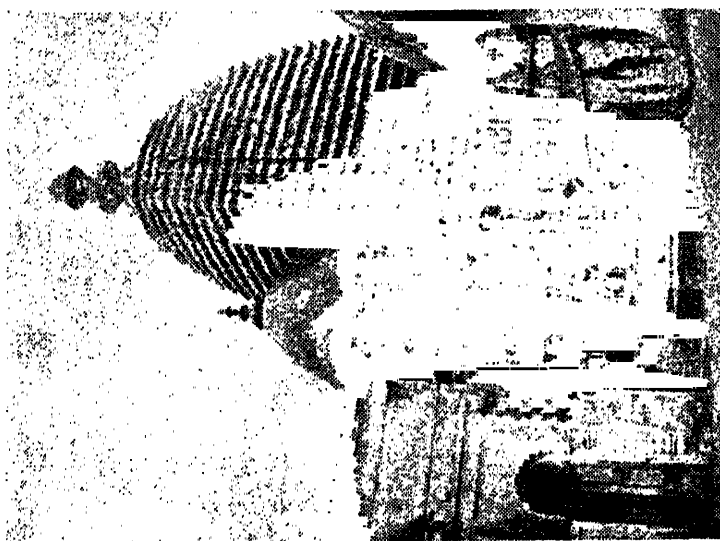
আলোকচিত্র ঃ ৪২
গোপালজীর মন্দির
কুলীনগ্রাম, বর্ধমান (পৃঃ ১৮৬)

আলোকচিত্র ঃ ৪১
জৌগ্রামের মন্দির
বর্ধমান (পৃঃ ১৮৯)

আলোকচিত্র : ৪৩

হংসেশ্বরী মন্দির, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী (পৃঃ ১৯১)

আলোকচিত্র : ৪৪

ব্রহ্মময়ীর মন্দির, মহানাদ, হুগলী (পৃঃ ২০২)
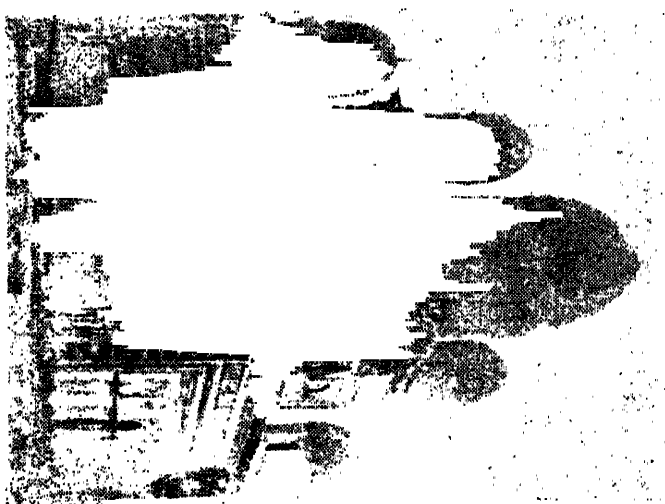
আলোকচিত্র : ৪৫
আনন্দময়ীর মন্দির
সুখড়িয়া, হুগলী (পৃঃ ২০৪)
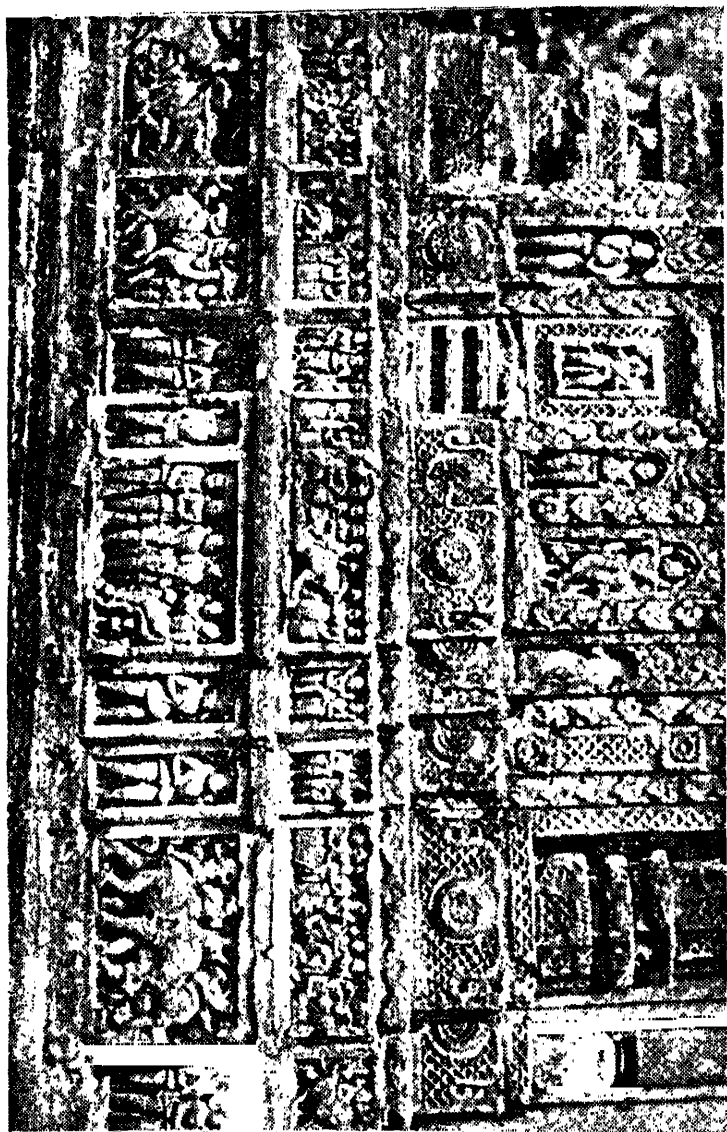
আলোকচিত্র ঃ ৪৬
বৈদ্যপুর মন্দিরে পোড়ামাটির অলঙ্করণ
হুগলী (পৃঃ ২০৫)
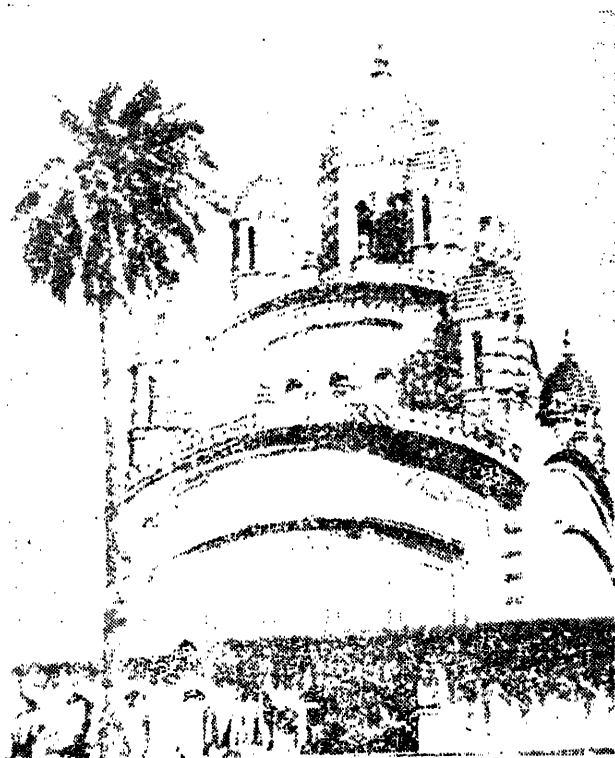
আলোকচিত্র ঃ ৪৭
টালিগঞ্জের নবরত্ন মন্দির
কলিকাতা (পৃঃ ২১৮)
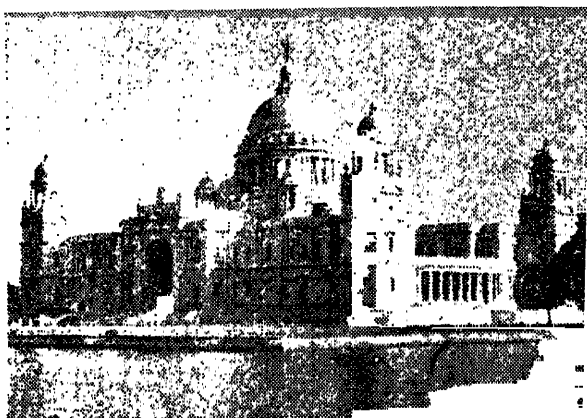
আলোকচিত্র : ৪৮
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল
কলিকাতা (পৃঃ ২১৮)
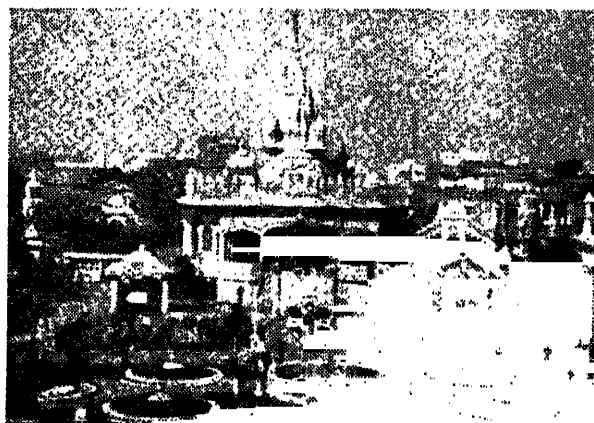
আলোকচিত্র : ৪৯
পরেশনাথের মন্দির
কলিকাতা (পৃঃ ২২০)
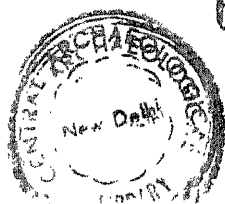
Civilization — West Bengal
West Bengal — Civilization